বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন ও গণমাধ্যমঃ একটি সমীক্ষা

উমামা আজমীন (UMAMA AZMIN)

Dhaka University Library
448899
448899
GIFT

তত্ত্বাবধায়ক ঃ

অধ্যাপক বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

এমফিল অভিসন্দর্ভ

মার্চ, ২০০৯

M.

৫৫৪৪৭৬

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন ও গণমাধ্যমঃ একটি সমীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে
এম. ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত
মার্চ, ২০০৯

গবেষক ঃ
উমামা আজমীন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫৫৪৪৭৭
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক ঃ
অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি উমামা আজমীন, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন ও গণমাধ্যমঃ একটি সমীক্ষা"-শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে এই বিষয়ে কেউ গবেষণা করেনি। এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভটি এবং এর কোন অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

তারিখঃ ০১.০১.২০০৭

(উমামা আজমীন)
এমফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫৫৪৪৭৭

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উমামা আজমীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উপস্থাপিত "বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন ও গণমাধ্যমঃ একটি সমীক্ষা"-শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। এই অভিসন্দর্ভটি তাঁর নিজস্ব ও একক গবেষণার ফল।

আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ বিশেষ, অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপিত হয়নি। তার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে অভিসন্দর্ভটি এমফিল ডিগ্রী প্রাপ্তির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পেশ করার অনুমতি দিচ্ছি।

তত্ত্বাবধায়ক

তারিখঃ ২.৬.১২

অধ্যাপক বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার আম্মা (প্রয়াত) বেগম হালিমা হককে
যাঁর আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণায় মুক্তচিন্তার আলোক প্রকীর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রলম্বিত আয়েস সাধ্য পথে এদেশের নারীরা জীবন অতিবাহিত করে। সমাজের স্তর ভিত্তিক বিন্যাসে এর গতি বা রূপ ভিন্ন হলেও সমাজের সর্বস্তরে 'নারী' বৈষম্যের স্বীকার। এই অসমতার বোধও এক ধরণের কর্তব্যবোধ থেকে এ গবেষণা কর্মটিতে হাত দিয়েছিলাম। (কিন্তু মায়ের মৃত্যু, পারিবারিক প্রতিকূলতা, অসুস্থতা, সন্তানের দায়িত্ব কর্মজীবনের ব্যস্ততা ইত্যাদি বিভিন্ন দৈনন্দিনতার আবর্তে কখন দশটি বছর পার হয়ে গেছে)।

শত ব্যস্ততার মাঝেও এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে উৎসাহিত করে আমার মত একজন অনভিজ্ঞ গবেষকের দ্বারা এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়ে নিতে যিনি হাসিমুখে সমস্ত বিড়ম্বনা সহ্য করেছেন-সেই পিতৃসম-দেবতুল্য শিক্ষা গুরু এদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও পণ্ডিত অধ্যাপক জনাব বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে, তাই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে ঋণের বোঝাভারী করলাম।

এ কাজে যাঁদের আদ্যন্ত সহযোগিতা পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে আমার পরম পূজনীয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মন এর কথা বলতে যেয়ে আমার মাথা শ্রদ্ধাবনত হয়ে আসে। যে কোন সমস্যায় যখনই তাঁর সহযোগিতা চেয়েছি-হাসিমুখে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার কাজে অনুপ্রেরণাদান করেছেন। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। তাঁর প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ।

গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে যাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত আমার কর্মপন্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সেই পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ নূরুল আমীন ব্যাপারীর প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে আমার প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ শওকত আরা হোসেন কাজটি শেষ করার পরামর্শ দিয়ে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। যাঁদের কর্ম উদ্দীপনা আমাকে সব সময় অনুপ্রাণীত করে-তাঁরা হলেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ নাজমা চৌধুরী, ডঃ তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী। তাঁদের প্রতি রইল আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।

এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় যখন কোন অবস্থাতেই গবেষণা কর্মের অনুমতি পাচ্ছিলাম না তখন অধ্যাপক ডঃ ইউ. এ. বি রাজিয়া আক্তার বানু স্বীয় স্কন্ধে এ দায়িত্ব

তুলে নিতে রাজি হয়ে আমাকে যে কর্ম প্রেরণা যুগিয়েছেন সে জন্য তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

আমি ঋণী হয়ে রইলাম আমার সহকর্মীদের প্রতি এবং শহীদ বাবুল একাডেমীর প্রিন্সিপাল মীরা রায়ের প্রতি, যিনি গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যে কোন প্রয়োজনে ছুটি মঞ্জুর করে আমার কর্ম প্রেরণা অব্যাহত রেখেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন লাইব্রেরীর কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের যে সহযোগিতা সব সময় পেয়েছি সে জন্য তাঁদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমি বিশেষভাবে ঋণী আমার ছোট আপা (মেঝবোন) অধ্যাপক আপিপা নাসরীনের প্রতি যিনি মায়ের পরেই আমার জীবনের উন্নতির লক্ষে সার্বিক সহযোগিতা দান করেছেন, আমার ও আমার সন্তানের অসুস্থতায় স্বীয় কর্মক্ষেত্র থেকে ছুটি নিয়ে বিভিন্ন সময় পাশে থেকেছেন এবং গবেষণাকালীন এক পর্যায়ে অনেকদিন আমার সন্তানকে মাতৃস্নেহে নিজের কাছে রেখে আমার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্রিয় সহযোগিতাদান করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞ আমার জীবনসঙ্গী জনাব লতিফুল আলম খান এর প্রতি যার সহযোগিতা ছাড়া এ কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। আর আমার একমাত্র সন্তান (শ্রেষ্ঠ) এত ছোট শিশু হওয়া সত্ত্বেও আমাকে সার্বক্ষনিক যে সুবোধ-সহযোগিতা দান করে স্বীয় দায়িত্বে পড়া-লেখা করে ক্লাসে প্রথম হয়ে আমার সবটুকু স্নেহ ও ভালবাসা কেড়ে নিয়েছে-আমার উজার করা আশীর্বাদ একদিন তাকে আলোকিত মানুষ করবেই।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই পাপ্পা (বাবা), যার আশীর্বাদে আমি ধন্য ও আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি যাদের অনুপ্রেরণা আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহদান করেছে।

১ মার্চ, ২০০৯। উমামা আজমীন

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
	প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা	১-২৪
১.১	গবেষণার বিষয়বস্তু	২-৮
১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি	৮-১০
১.৩	গবেষণার প্রতিপাদ্য	১০-১১
১.৪	গবেষণা পদ্ধতি	১১-১৪
১.৫	প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা	১৪-২৪
	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন ও প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ	২৫-৬৬
২.১	উন্নয়নঃ উন্নয়ন দর্শন ও ধারার ব্যাখ্যা, প্রবণতা, বিকাশ ও নারীর সম্পৃক্ততা	২৫-২৯
২.২	আধুনিক ও উন্নয়ন কৌশল ও মূলধারা উন্নয়নের সমস্যা	২৯-৩৪
২.৩	বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের প্রবণতা বা ধারা এবং তার প্রয়োগ	৩৫-৩৭
	২.৩.১ নারী উন্নয়ন ঃ সরকারী পদক্ষেপ	৩৫-৩৭
	২.৩.২ নারী উন্নয়নের বেসরকারী পদক্ষেপ বা উদ্যোগ	৩৭-৩৯
২.৪	নারী উন্নয়ন গবেষণার ধারা	৩৯-৪১
২.৫	উন্নয়ন ভাবনায় নারী ও জেন্ডার ফ্রেম ওয়ার্ক	৪২-৪৩
	২.৫.১ নারী উন্নয়ন মতবাদ	৪৪-৪৮
	২.৫.২ জেন্ডার ফ্রেম ওয়ার্ক	৪৮-৫১
২.৬	মানব উন্নয়ন সূচক (এইচ ডি আই)	৫১-৫৩
	২.৬.১ লিঙ্গভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচক	৫৪-৫৮
২.৭	নারীর ক্ষমতায়ন	৫৮-৬৬
	তৃতীয় অধ্যায় ঃ	৬৭-৯৭
৩.১	উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা	৬৭-৭৩
৩.২	বিশ্বব্যাপী শ্রম শক্তিতে নারীর অবস্থান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী	৭৩-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

	৩.২.১ শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা ও তার মূল্যায়ন	৭৪-৮৫
	৩.২.২ রাষ্ট্রীয় সুযোগ ও অধিকারের বৈষম্য	৮৫-৮৮
৩.৩	উন্নয়নে নারী ঃ জাতিসংঘের অবস্থান	৮৮-৮৯
	৩.৩.১ জাতিসংঘ চার্টারে নারী	৮৮-৮৯
	৩.৩.২ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও নারী দশক	৮৯-৯৫
	৩.৩.৩ জাতিসংঘ কাঠামোয় নারী	৯৫-৯৭
	চতুর্থ অধ্যায়ঃ	৯৮-১৪৫
৪.১	উন্নয়নে নারী ঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা	৯৮-১০০
৪.২	নারীর অধঃস্তন আর্থ-সামাজিক অবস্থান	১০০-১০৩
	৪.২.১ নারীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, নির্মাণ প্রক্রিয়া	১০৪-১১৭
	৪.২.২ বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি নারী উন্নয়ন ও বাংলাদেশ	১১৭-১২১
	৪.২.৩ স্কুল কারিকুলাম এ লিঙ্গ সংবেদনশীলতা	১২১-১৩৩
৪.৩	সামাজিক অবস্থান	১৩৩-১৩৩
	৪.৩.১ আইনগত অধিকার	১৩৩-১৩৩
	৪.৩.২ বাংলাদেশের সংবিধানে নারী	১৩৩-১৪০
৪.৪	নারী উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি	১৪০-১৪৫
	পঞ্চম অধ্যায় ঃ	১৪৬-২০৫
৫.১	উন্নয়ন যোগাযোগ ও গণমাধ্যম	১৪৬-১৪৭
	৫.১.১ মানব উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা	১৪৭-১৫৫
	৫.১.২ নারী উন্নয়নে গণমাধ্যম	১৫৫-১৫৯
	৫.১.৩ নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমঃ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ	১৫৯-১৬৪
	৫.১.৪ জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নির্মাণ প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যম	১৮১-১৮৬
৫.২	সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অবস্থান উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা	১৮৭-১৯৮
৫.৩	রাজনীতিতে নারী ও গণমাধ্যম	১৯৮-২০৫
	ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সংবাদ মাধ্যমে নারী	২০৬-২৩৪
৬.১	নারী উন্নয়ন ও সংবাদপত্র	২১৪-২১৭
৬.২	সাধারণভাবে সংবাদপত্রে নারীকে যেরূপে দেখা যায়	২১৭-২১৯

Dhaka University Institutional Repository

	৬.২.১ বাংলাদেশের সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ ও নারীর রূপায়নঃ গবেষণার আলোকে	২১৯-২২৪
৬.৩	সংবাদ মাধ্যমে নারীর ইমেজ ও নারী অধিকার	২২৪-২৩৪
	সপ্তম অধ্যায় ঃ	২৩৫-২৯৫
৭.১	বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিরীক্ষণঃ জেন্ডার বিশ্লেষণ	২৩৫
	৭.১.১ মতাদর্শ ও ইমেজ নির্মাণে নারী	২৩৬-২৪৫
৭.২	চলচ্চিত্র মাধ্যমে নারী	২৪৬-২৫০
৭.৩	বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারী	২৫০-২৫১
	৭.৩.১ চলচ্চিত্রে নারী বিরোধী ভাবনাঃ অতীত ও বর্তমান	২৫১২৫৮
৭.৪	চলচ্চিত্রে পুঁজি বিনিয়োগকারী ও পরিচালকদের মানসিকতা	২৫৮-২৬৫
৭.৫	টেলিভিশন ও নারী	২৬৬-২৭১
৭.৬	আকাশ মাধ্যমে প্রাপ্ত নারী ইমেজ ঃ দেশীয় সংস্কৃতির সংকরায়ন	২৭২-২৭৪
৭.৭	বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ণ	২৭৪-২৮৫
	৭.৭.১ বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ণঃ গবেষণার আলোকে	২৮৫-২৮৮
৭.৮	বাংলাদেশের চিত্রকলায় নারী	২৮৮-২৯৫
	অষ্টম অধ্যায় ঃ	২৯৬-৩২৫
৮.১	গবেষণালব্ধ ফলাফল	২৯৬-২৯৮
৮.২	সুপারিশমালা	২৯৮-৩০৩
	উপসংহার	৩০৩-৩০৪
	পরিশিষ্ট	৩০৫-৩১৫
	তথ্যপঞ্জী	৩১৬-৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণি তালিকা

সারণি ২.১ ঃ লিঙ্গভিত্তিক মানব উন্নয়নসূচক ঃ আড়াই দশকের অগ্রগতি।

সারণি ২.২ ঃ মানব উন্নয়ন এবং নারী সমতাঃ নির্বাচিত দেশ

সারণি ৩.১ ঃ তিনটি দক্ষিণ এশিয় রাষ্ট্রের সময়ের ব্যবহার, ১৯৮৯-৯২ 'অর্থনৈতিক কাজের সম্পাহব্যাপী শ্রমঘন্টা'।

সারণি ৪.১ ঃ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপাত।

সারণি ৪.২ ঃ মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার।

সারণি ৫.১ ঃ গণমাধ্যমের ধরণ।

সারণি ৫.২ ঃ পাঁচটি যোগাযোগ বিপ্লব।

সারণি ৬.১ ঃ সংবাদের উপস্থাপক, প্রতিবেদক ও সংবাদ বিষয়ের লিঙ্গভেদ।

সারণি ৬.২ ঃ সংবাদক্ষেত্রে নারী পুরুষের উপস্থিতি।

সারণি ৭.১ ঃ ২০০২ সালের পাঁচটি ছবিতে নারীর পেশার বিন্যাস।

সারণি ৭.২ ঃ বিজ্ঞাপনের সনাক্তকৃত মূলভাব।

সারণি ৭.৩ ঃ পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনে পাত্রীর বিশিষ্টক।

Dhaka University Institutional Repository

ABBREVIATION

BIDS	- Bangladesh Institute for Development Studies.
BPFA	- Beijing Plantform for Action.
CEDAW	- Convention on the Elimination of all kinds of Discrimination Against Women.
DAWN	- Development Alternatives with Women for a New Era.
EPZ	- Export Processing Zone.
FLS	- Forward Looking Strategies.
FYP	- Five Year Plan.
GAD	- Gender and Development.
GDI	- Gender Development Index.
GEM	- Gender in Empowerment.
HDI	- Human Development Index.
HDR	- Human Development Report.
NAP	- National Action Plan.
NFLS	- Nairobi Forward Looking Strategies.
PFA	- Platform for Action.
UN	- United Nations.
UNDP	- United Nations Development Programme.
WID	- Women in Development.
WAD	- Women Affairs Division.
WPA	- World Plan of Action.

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা

১.১ গবেষণার বিষয়বস্তু

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

১.৩ গবেষণার প্রতিপাদ্য

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

১.৫ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

"বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন ও গণমাধ্যমঃ একটি সমীক্ষা"

ভূমিকা ঃ

পৃথিবী গ্রহটি তার আয়ুস্কালীন পরিপক্কতায় অনেকগুলি যুগ পেরিয়ে এসে আধুনিকতায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর তার এই কাল বা যুগ পরিক্রমায় সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে যে প্রত্যয়টি আলোচনার কেন্দ্রে অবস্থান করেছে, সেটি হল উন্নয়ন। 'উন্নয়ন' প্রচেষ্টাই মানুষকে এতগুলি যুগ অতিক্রম করে আধুনিকতার ছোঁয়া দিতে পেরেছে। উন্নয়ন হল এমন একটি পরিবর্তন প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া বিরাজমান বা বর্তমান অবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও ইতিবাচক পরিবর্তিত দিক বা অবস্থাকে নির্দেশ করে। আর এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন ধারণাটি ও সমান গুরুত্বের দাবীদার। কারণ নারী সমাজের অর্ধেক অংশ। আধুনিক যুগ যখন মানব সমাজকে উত্তরাধুনিকতার ডাক দিয়েছে তখন উন্নয়ন প্রত্যয়টি মানুষকে সর্বজনীনতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আর তারই গুরুত্ব বিবেচনায় 'নারী উন্নয়ন' কথাটি আজ সারা বিশ্বে এত আলোচিত, এর কারণ জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিকলাঙ্গ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে যা অবশ্যম্ভাবী-ভাবে কোন সচেতন সমাজের কাম্য নয়। উন্নয়ন প্রত্যয়টি আমাদের সামগ্রিকতার ধারণা দেয়। আর যেহেতু এটি একটি সামগ্রিক প্রত্যয় তাই উন্নয়ন বলতে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থার অগ্রসরতা বোঝায়, তেমনি, উন্নয়ন পরিমাপের আরেকটি মাপকাঠি হলো সার্বিক মানব উন্নয়ন। আর নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত চিন্তা ও পরিকল্পনা নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে আমরা কেমন করে দেখি তার দ্বারা প্রধানত নির্ধারিত হয়। নারী ও পুরুষের সম্পর্ককে আমরা কেমন করে দেখি তার মধ্য দিয়ে আমাদের যে দর্শন ও দার্শনিক অবস্থান প্রতিফলিত হয় তা যে সবসময় স্পষ্ট থাকে তা নয়। এর উপস্থিতি হতে পারে প্রচ্ছন্ন কিংবা আপাতঃ দৃষ্টিতে গুপ্ত। যাঁরা নারী উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন, কিংবা যাঁরা পরিকল্পনাবিদ, কিংবা যাঁরা প্রয়োগকারী তাঁরা নারী পুরুষ সম্পর্কের এই দার্শনিক দিককে প্রায়শই পর্যালোচনার বাইরে রেখে দেন, যা কাম্য হতে পারে না। এই সম্পর্ক সংক্রান্ত চিন্তার সমালোচনা এবং সমালোচনাজনিত সুরাহা ছাড়া নারী উন্নয়নের

Dhaka University Institutional Repository

একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। তাই আমরা যখনই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হই তখনই নারীকে এর মূলস্রোতের সাথে এক করে চিন্তা করি। উন্নয়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একটি মতাদর্শিক ভিত্তি তৈরী করা। এই মতাদর্শ তৈরী করতে যে সব উপাদান কাজ করে তার মধ্যে গণমাধ্যম অন্যতম। কারণ গণমাধ্যম মানুষের মনের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে অত্যন্ত নীরবে। তাই আমি উন্নয়নের সর্বজনীনতার ভিত্তিতে এর অংশ হিসাবে 'নারী উন্নয়ন' গবেষণার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে বেছে নিয়েছি।

১.১ গবেষণার বিষয়বস্তু ঃ

গবেষণা ও আলোচনার জন্য 'নারী উন্নয়ন' কোন নতুন বিষয় নয়। নারী উন্নয়নের জন্য সরকার এবং সমাজের সচেতন অংশের চিন্তা ভাবনার এমনকি অঙ্গিকারের ও কোন অভাব নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন রয়েই যায় আর তা হল নারী উন্নয়ন বলতে কি বোঝাতে চাইছেন সে সম্পর্কে তাদের পরিস্কার ধারণা কি? বোঝার ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে এবং স্বভাবতঃই কর্মের ক্ষেত্রে ফাঁকি অথবা ব্যবধান আছে বলেই হয়তো নারী উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ-অনেক অর্থ ব্যয় করে ও কাজের কাজ খুব একটা সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। গোড়ায় গলদ থেকেই যাচ্ছে। নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্ক ও বিরাজমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে প্রচলিত উন্নয়ন দর্শন আদৌ বদলাবার প্রয়োজন বোধ করে না। এ অপ্রয়োজনবোধ থেকেই সমাজকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি। অর্থাৎ যা চলছে তাকে ঠিক রেখে ওপর থেকে প্রলেপ দেয়ার প্রয়াসই সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য। নারী উন্নয়নের প্রচলিত দর্শনের মূলে এই উদ্দেশ্যই ক্রিয়াশীল।

- নারী উন্নয়ন দর্শনের যে কর্তব্য এখনও পালিত হয়নি সে কর্তব্য হচ্ছে নারীর সার্বিক উন্নয়নের প্রকৃত সংজ্ঞা আবিস্কার করা। নিঃসন্দেহে এ যুগের দার্শনিক চিন্তার এক প্রধান শক্তিশালী ধারা হচ্ছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে পুরুষের সমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা। কিন্তু উন্নয়নের দিক থেকে এর মূর্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যটি কি, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে নারী ও পুরুষের অসম হওয়ার প্রধান কারণগুলো সনাক্ত করতে পারলে নারী ও পুরুষ কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্বিক অবস্থায় পরস্পরের সমান হতে পারে তার একটা ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

- নারী শিক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে পিছিয়ে রয়েছে এ ধারণা দেয়া যতো সহজ এর পিছিয়ে থাকার কারণ সমূহকে নির্দিষ্ট করে বলা এবং সে কারণগুলো উচ্ছেদ করা ততো সহজ নয়। তবে ইতোমধ্যে এটা স্পষ্ট যে, প্রচলিত উন্নয়ন দর্শনও কারণগুলো সনাক্ত করতে অনেকটা অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, অতএব তা দূর করতেও অপারগ। এটুকু যদি আমরা বুঝি তাহলে নারী ও উন্নয়ন দর্শনের নতুন রূপরেখা প্রণয়ণের দিকে আমরা অন্তত একধাপ অগ্রসর হতে পারবো, গণমাধ্যম গুলো ও সেক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নতুন ভাবে বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও নির্মাণ করতে পারবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।
- নারী উন্নয়নের কথা চিন্তা করতে গেলে এদেশের গণমাধ্যমকে বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা গণমাধ্যমে বিশেষ নারী পুরুষ ইমেজ গঠনে, সেগুলোর স্থায়ী করণে, পুনরায় প্রয়োগে এবং রূপান্তরে ব্যক্তির মনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারী উন্নয়ন ও নারী মুক্তি আন্দোলন কথা দুটি সমার্থক না হলেও ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত। গবেষণায় নারী উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করব। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী উন্নয়নের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকটি ও তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। আমাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া কিভাবে নারীকে অধঃস্তন, গৃহবন্দী, অস্থিমজ্জাসম্পন্ন জড় মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মানবরূপে গড়ে তুলেছে, কিভাবে নারী পরনির্ভরশীল ভোগ্যপণ্য ও সম্পত্তি বিশেষে পরিনত হল, এর জন্য পুরুষ এবং নারী কে কতটা দায়ী ইত্যাদি আলোচনা করার ইচ্ছা রয়েছে।
- "নারী হয়ে কেউ জন্ম নেয়না, কেউ কেউ নারী হয়ে উঠে" বলেছিলেন সিমোন দ্য বোভোয়া। অর্থাৎ জৈবিকভাবে এক একজন শিশু স্ত্রী বা পুরুষ অঙ্গ নিয়ে জন্মায় এটুকুই প্রাকৃতিক সত্য। জন্মলগ্নে সে জানেনা সে নারী না পুরুষ। তারপর প্রতি পদে পদে তাকে মেহেদীতে হাত রাঙ্গিয়ে, টিপ পরিয়ে, ঝুঁটি বেঁধে, পুতুল খেলিয়ে, রান্নাবাটি ধরিয়ে দিয়ে, বাইরে ঘোরা বন্ধ করে, ধর্মীয়-সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে তাকে মেয়েলি করে তোলা হয়। তার সামনে ঝুলিয়ে দেয়া হয় "কোড অব কন্ডাকটের" বিধিনিষেধ। লিঙ্গের কৃত্রিম ধারণা ও বিভাজন আরোপ করে সমাজ যার অপর নাম পুরুষতন্ত্র। আচার-আচরণে সাহিত্য-দর্শনে, গানে-কবিতায় এবং

Dhaka University Institutional Repository

পেশা নির্বাচনে এই লিঙ্গ নির্মাণ চলতে থাকে অনিঃশেষ প্রক্রিয়ার মতো এই নির্মাণের মূল কৌশল হলো যা কিছু পৌরুষের প্রতীক বলে সমাজ মনে করে তার বিপরীত লক্ষনগুলো দিয়ে হয় নারীত্ব নির্মাণ। "মেয়েরা এরকম হবে, আর ছেলে ওরকম" এর বাইরে গেলেই সে বিচ্যুত, সৃষ্টিছাড়া। ব্যক্তি পরিবার এবং সমাজে এই ধারণা ঢোকানো হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই লিঙ্গবিভাজন নারীর জন্য বয়ে এনেছে পদে পদে অসাম্য ও বঞ্চনার ইতিহাস।

- পুরুষতন্ত্র বিভিন্নরূপে নারীকে করেছে অধঃস্তন, গৃহপালিত এবং অনেকটা হাতের পুতুল। পুরুষ নারীকে গন্ডীবদ্ধ করে মুক্ত জগতে চলফেরা করেছে, বা সমাজগঠন করেছে, নীতি নির্ধারণ করেছে, শাসন করেছে, করেছে শোষনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর মেধামননের চর্চা। ফলে গোটা ব্যবস্থাই এখন পুরুষের পক্ষে চলে গেছে এবং তা নারীর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নারীকে অনবরত শোষন করেছে, ফলে নারী রয়ে গেছে মানবজাতির একটি অনুন্নত সত্ত্বা ও অংশ হিসাবে। নারী নিজের অজান্তেই এই পুরুষতান্ত্রিকতার জালে আটকে পড়েছে, আরেক দিক থেকে দেখতে গেলে সমাজের পুরুষরা ও পুরুষতান্ত্রিকতার আবর্তণে আবর্তিত হচ্ছে, যা কিনা সমাজের, অবউন্নয়নকে তরান্বিত করেছে। এই আবর্ত থেকে বোদ্ধা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে চায়। আর এ ক্ষেত্রে সমাজকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করতে পারে গণমাধ্যম।
- নারীর অনুন্নয়নের জন্য নারী নিজে কতটা দায়ী? নারীর মানবিক মূল্যবোধ, আত্মোপলব্ধি, শিক্ষা , দীক্ষা, দায়িত্ব জ্ঞান, সর্বোপরি মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যয় গড়ে উঠেছে কিনা-না হলে কীভাবে তা করা সম্ভব? এক্ষেত্রে গণমাধ্যম এ পর্যন্ত কতটা ভূমিকা রেখেছে? কি কি ভূমিকা রাখতে পারে? কী কী পদক্ষেপ নিলে নারী উন্নয়ন তরান্বিত হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার প্রত্যাশা রয়েছে।
- নারী এখন সারাবিশ্বের আলোচ্য বিষয়। নিজেকে আলোচ্য বিষয় করে তুলবার জন্য তাকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। নিউইয়র্কে ১৮৫৭ সালে সেলাই (সুঁচ) কারখানার নারী শ্রমিকরা ৮ই মার্চ তারিখে কাজের পরিবেশ উন্নত করবার জন্য এবং শোষনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে রাস্তায় নেমে আসে। সেলাই কারখানার এই লড়াকু মেয়েদের কাজের স্বীকৃতি হিসাবে সারা দুনিয়ায় এখন ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী

Dhaka University Institutional Repository

দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ১২৩৬ সালে রাজা রামমোহন রায়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও আহ্বানে বৃটিশ সরকার আইন করে সতীদাহ বা সহমরনের নিষ্ঠুর ঘৃন্য প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন। বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে ১২৬৩ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়। সেই সঙ্গে তারা সর্বস্তরে নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৩০০ সালের প্রথম দশকে বেগম রোকেয়ার বলিষ্ঠ লেখনী ও নিরলস প্রচেষ্ঠা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় নব জাগরণ (যাকে রেনেসাঁ বললেও অতুক্তি হবে না) এনে দেয়। তার ক্ষুরধার লেখনী, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নভেল, নাটক, ব্যাঙ্গ রচনা নারীর সুপ্ত মানব স্বত্তাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে যা একমাত্র গনমাধ্যমের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছিল।

১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব নারী দশকে সর্বত্র নারী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা, কর্মকান্ড পরিচালিত হয়-যেখানে গণমাধ্যমই প্রধান ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭৫ সালে ম্যাক্সিকো শহরে হয় প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বনারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোপেনহোগেনে ১৯৮০ সালে এবং নাইরোবিতে ১৯৮৫ সালে। এই চারটি সম্মেলনই বিশ্বনারী আন্দোলনের ইতিহাসে এক একটি পর্ব। নতুন শতাব্দীতে পৃথিবী হোক বৈষম্যহীন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক, এই ছিল তখনকার প্রত্যাশা। নারীর উন্নয়ন মানে সমাজেরই উন্নয়ন, নারীর সমতা ছাড়া সমাজের উন্নয়ন হবে না; এই সহজ সত্যটি আজ দেশ সমাজ ও সরকার উপলব্ধি করেছে বলেই সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বেইজিং নারী সম্মেলনে সকলের সম্মতিতে গৃহীত হয়েছে কর্ম-পরিকল্পনা (Platform for Action)। গণমাধ্যমগুলি বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়া এক্ষেত্রে যথেষ্ঠ কাজ করলেও এর বাস্তবায়ন প্রকৃতই হয়েছে কিনা তা সহজেই অনুমেয়।

বেগম রোকেয়ার দেখান স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশের মেয়েরা মেধা-মননশীলতায় বাস্তবায়িত করেছে। আর একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মেয়েদের পদচারণা এখন সর্বত্র। সর্বক্ষেত্রে নারী তার উপযুক্ততা প্রমাণ করেছে, সাফল্য বয়ে এনেছে। সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে সহস্রাধিক নারী উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। বিদেশী দাতাদেশে নারী উন্নয়নখাতে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে; কিন্তু তাও সুষ্ঠু নীতিমালা ও সরকারী নীতিমালার কারণে ব্যর্থ হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জাতীয়, অর্থনৈতিক উৎপাদনে স্থবিরতা, সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবোধের অবক্ষয়ে সাফল্য লাভ করছে না। অপসংস্কৃতির অপচ্ছায়া ও আজ বাঙ্গালী নারীর শাশ্বত মানবিক প্রতিকৃতিকে ধুয়ে মুছে দিতে চায়। কিন্তু নারীত্বের এ অবমাননা ও অবমূল্যায়ন কোন উন্নয়নমুখী জাতি হতে দিতে পারে না। গণমাধ্যমের কল্যাণে আকাশ পথে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে আমাদের সমাজের উন্নয়নকে ধনতন্ত্রের 'বাজারে' পরিনত করা হচ্ছে- গবেষণায় সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।

এই সংকটময় অবস্থা থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে নারী শিক্ষার প্রসার। যে শিক্ষা তাকে 'নারী' নয় মানুষ হয়ে বেচে থাকার চেতনায় উদ্ভাসিত করবে। এর জন্য প্রয়োজন সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারনা চালান এবং মতাদর্শ গঠন। আর এর জন্য গণমাধ্যম গুলিই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তখনকার দিনে গণমাধ্যম বলতে মুদ্রিত মাধ্যম ও রেডিওকেই শুধু বুঝাত। কিন্তু বর্তমানে গণমাধ্যমের ধরণ বহুপ্রকার। এগুলো হচ্ছে শ্রবণ সম্বন্ধীয়ঃ রেডিও, ক্যাসেটস, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন। শ্রবণ ও দর্শন সম্বন্ধীয় যেমন- টেলিভিশন, ছায়াছবি, কম্পিউটার, ভিডিও, মঞ্চ। দর্শন সম্বন্ধীয় ঃ যেমন- সংবাদপত্র, বই,পিরিয়ডিক্যাল, প্রচারপত্র, দেওয়াল লিখন, পোষ্টার, ব্যানার ইত্যাদি।

এই গণমাধ্যমগুলি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক মতাদর্শিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সর্বপ্রকার ভাবধারার পরিবর্তন এবং মনোভাব গঠনে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। গণমাধ্যমে 'পুরুষতান্ত্রিক' সমাজে নারীবাদী কর্মীদের একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে, নারীবাদী নন্দনতত্ত্ব বজায় রাখা এবং দর্শক বৃন্দের বড় অংশের কাছে একে উপভোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করা-এই দুইয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করা।

"ডরোথি হবসনের 'হাউজওয়াইভস এ্যান্ড দ্যা ম্যাস মিডিয়া ইন বৃটেন' এর পুঁজিবাদী প্রেক্ষিতে গৃহবধুরা কিভাবে সমষ্টিগতভাবে বিচ্ছিন্ন তা নিরীক্ষণ করে এবং রেডিও, টিভি প্রোগ্রাম কিভাবে লিঙ্গীয় বিভাজনকে শক্তিশালী করে তা আলোচনা করে। এখানে দুটো জিনিষ কাজ করে; এক গৃহবধূরা ঘরের মধ্যে অন্তরিত ও দুইঃ মতাদর্শের ক্ষেত্রে রমণীয়

Dhaka University Institutional Repository

(Feminine) মূল্যবোধকে কর্ম ও রাজনীতির পৌরুষ (Masculine) জগতের তুলনায় গঠন করা হয়।"[১]

মার্ক্সবাদ গণমাধ্যমের কল্যাণে গোটা বিশ্বকে দু'টি পরস্পর বিরোধী মতাদর্শিক ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিল। লেনিন শুধুমাত্র লেখনীর জোরে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা একটি জাতিকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। এতে বুঝা যায় গণমাধ্যম পরিবর্তন তথা উন্নয়নক্ষেত্রে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যম কর্তৃক প্রচারিত তথ্যের প্রকৃতি এই অর্থে মতাদর্শগত যে এটা দর্শকদের (Audience) মধ্যে কিছু ধারণা/ আদর্শ তুলে ধরেছে ও পৌছে দিচ্ছে, গণমাধ্যমের কোন বিষয় Representation 'অবজেকটিভ' অথবা 'প্রকৃত' বা স্বাভাবিক নয়, বরং তা হচ্ছে বাস্তব অবস্থার পূনর্নির্মাণ গঠন যা সেই সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা নির্মিত। নাটক,উপন্যাস, ছোটগল্প, মুদ্রিতাকারে, বেতার বা দৃশ্যমান (Visual) মাধ্যমে যে কোন প্রকারেই হোক এমন সব বার্তায় পূর্ণ যা সামাজিক সম্পর্কের একটি বিশেষ ধরণকে 'নির্দেশ' পুণরুৎপাদন করে।

সামাজিক সম্পর্কের একটি বিশেষ ধরণ হচ্ছে লিঙ্গীয় সম্পর্ক। যেহেতু পুরুষতন্ত্র গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে সেহেতু তা পুরুষের পক্ষেই মতাদর্শ তৈরী করে। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রোজার দিনে ঘোষিকা কিংবা সংবাদ পাঠিকাকে মাথায় ঘোমটা দিয়ে (রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনাধীণ) গণমাধ্যমে উপস্থিত হতে দেখা যায়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব নারীর হাতে থাকলে ও তারা পুরুষতন্ত্রের মধ্যে অবস্থান করছে বলে এই নারীরা ও পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পুরুষতন্ত্রের আবর্তে আবর্তিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের টেলিভিশন নাটক, চলচ্চিত্র, রেডিও প্রভৃতি গণমাধ্যম সরকারের নিয়ন্ত্রনে নারীর উন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যেমন- "মীনা' দক্ষিণ এশিয়ার কন্যা শিশু 'নারী বিষয়ক' ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নাটক-নাটিকা ইত্যাদি।

---

[১] 'পাশ্চাত্য ও তৃতীয় বিশ্বের গণমাধ্যম নিরীক্ষণের পর্যালোচনা'- রেহনুমা আহমেদ, গণমাধ্যম ও নারী, মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগমও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রকাশক নারী-সংহতি, পৃষ্ঠাঃ৪]

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী টিভি চ্যানেল ও রেডিও চ্যানেল গুলিও নানা রকমের গণসচেতনতামূলক নারীহিতকর অনুষ্ঠান প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নারী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজের পদটি দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সৈনিক, পুলিশ ইত্যাদি সব ধরনের পদে নারী স্বীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ও নারীর অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হলেও অনেকটা উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে আত্মতৃপ্তির কোন সুযোগ নেই। আজও নারী পুরুষতন্ত্রের অধীনে প্রান্তেই রয়ে গেছে। আর কেন্দ্রে অবস্থান করছে পুরুষ। এই প্রান্তিকতাকে কাটিয়ে উঠে পাশাপাশি অবস্থানের জন্য আমার এ নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা। পুরুষতান্ত্রিকতার প্রান্তে না থেকে 'উভতান্ত্রিক' এক উন্নত সমাজের অধিবাসী হওয়ার স্বপ্নই হওয়া উচিত নারী উন্নয়নের লক্ষ্য। আমি 'উভ-তান্ত্রিক' কথাটা এই কারণে ব্যবহার করলাম যেখানে নারী পুরুষ উভয়ে মিলে একটি উন্নয়নমুখী ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন করা যায়। যেখানে পরিবার মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক না হয়ে মা-বাবা উভয়ের পরিচয়ে সন্তান বড় হবে, সমাজ ফিরে পাবে এক পারস্পারিক সৌহার্দপূর্ণ উন্নত পরিবেশ। যেখানে নারী পুরুষ কেউ কারোর প্রভু বা শত্রু বা উপরে বা নীচে নয় পরস্পর সৌহার্দপূণ বন্ধু সুলভ আচরনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তাহলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন পরিবেশ নির্মাণ যার পদক্ষেপ এখনই নিতে হবে। সব পরিবর্তনই একসময় প্রচলিতনিয়মের বিরোধীতা দিয়ে শুরু হয়, আর সে বিরোধীতা যদি হয় শান্তির জন্য তবুও তাকে বেগ পেতেই হয়। এ পর্যন্ত এক্ষেত্রে গবেষণা হয়েছে তা মৌলিক প্রশ্নে অপ্রতুল এবং পর্যাপ্ত নয় বলে আমি মনে করি। তাইতো আমি নারী উন্নয়নের বাহক হিসাব গণমাধ্যমকে বেছে নিয়েছি। এ প্রচেষ্টা উন্নয়ন, নারী মুক্তি তথা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামান্য হলেও সহায়ক দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে বলে আমার প্রত্যাশা।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ গবেষণায় উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন ও গনমাধ্যম এই তিনটি বিষয়ের সম্পৃক্ততাকে কেন্দ্র করে আলোচনা আবর্তিত হয়েছে। ইতোপূর্বে গবেষণার বিষয়বস্তু আলোচনায় উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকার উপর জোর দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। যেহেতু উন্নয়ন বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যাপক এবং নারী উন্নয়ন যেহেতু উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এই উভয় প্রক্রিয়ায়ই গণমাধ্যম যেহেতু অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে তাই এই গবেষণায় এদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিকে বিবেচনা করে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, দীর্ঘ মেয়াদী অর্জনের সম্ভাবনার আলোকে দুই ভাগে পর্যায় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উভয় পর্যায়ের যথাযথ ধারাবাহিকতার মাধ্যমেই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল উন্নয়ন তথা নারী উন্নয়নের উভয় পরিসরে/ পরিমন্ডলে নারীর বর্তমান অবস্থা তুলে ধরার প্রেক্ষিতে আগামী দিনের সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করা। উন্নয়নের প্রতিটি পর্যায়ে নারীর সীমাবদ্ধ অবস্থান কীভাবে নারীকে প্রান্তিক অবস্থানে গন্ডীবদ্ধ করে রেখেছে এই গবেষণার মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া, সংবাদপত্র, শিক্ষা ব্যবস্থা, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া, শ্রবণ দর্শন ইত্যাদি মাধ্যম নারীকে কতটা অগ্রগতির পথে পরিচালিত করেছে, কতটা উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে কাজ করতে পারে, আর কতটাই বা পারবে ইত্যাদি সুযোগ সমস্যা সম্ভাবনার বিষয়টি পর্যালোচনা করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

পরিধি ঃ গবেষণার উদ্দেশ্য আলোচনায় উন্নয়ন ও গণমাধ্যমের সাথে এর সম্পৃক্ততা উভয় বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণার পরিধি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এই উভয় বিষয়ের সংযোগের ব্যাপারে ফোকাস করা হয়েছে। উন্নয়ন একটি পূর্নাঙ্গ প্রত্যয় বলে এর পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। গণমাধ্যমের ক্ষেত্র ও অনেক ব্যাপক। কারণ প্রাচীন মিশরীয় লিপি, গুহা চিত্র থেকে শুরু করে আধুনিক কম্পিউটার, স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট পর্যন্ত এর বিস্তার। তাই এই গবেষণার পরিধি নির্দিষ্ট রাখবার জন্য উন্নয়ন এবং গবেষণার বৃহত্তর পরিমন্ডলে নারীকে কেন্দ্রবিন্দু বিবেচনা করে ভূমিকা এবং উভয় পরিমন্ডলের যে যোগসূত্র অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয়তা এবং গণমাধ্যমের চিরাচরিত ও আধুনিকরূপ এবং ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নারীর অতীত অবস্থান থেকে বর্তমান অবস্থায় উত্তরণ বর্তমান অবস্থা থেকে ক্ষমতায়নের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অনিবার্য ভূমিকার কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উন্নয়নের মূলধারায় নারীর সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র, বিভিন্ন বই পত্র, নাটক,উপন্যাস, গল্প, কবিতা, সংগীত

চিত্রকর্ম, রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি যুগে যুগে যে মনোজাগতিক প্রভাব বিস্তার করে বস্তু জাগতিক কর্মকান্ডে মানুষকে যুক্ত করতে প্রেরণা যুগিয়েছে সে সম্পর্কে ও আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য গণমাধ্যমের পাশাপাশি আমি মূলত; টেলিভিশন ও সিনেমার উপর বিশেষ জোড় দিয়েছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের প্রতিটি ভাগ নিয়ে নারী উন্নয়নের সাথে এর সম্পৃক্ততা নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আরো গবেষণার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমি এ গবেষণার প্রয়োজনে গণমাধ্যমের প্রায় সবকটি শাখার কথা উল্লেখ ও স্বল্প পরিসরে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি যা অতি ক্ষুদ্র একটি প্রয়াস।

১.৩ গবেষণা-প্রতিপাদ্যঃ

গবেষণার শিরোনাম-বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন ও গণমাধ্যম একটি সমীক্ষা এর মাধ্যমে একটি বৃহৎ পরিসরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন ও গণমাধ্যমের পারস্পরিক সম্পৃক্ততার বিষয় সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। উন্নয়নে নারীর অবস্থানের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত উন্নয়ন ধারায় নারীর অবস্থানের বিষয়টি দেখান হয়েছে এভাবে,

একঃ উন্নয়নের সবটুকু সুফল তখনই মানবজীবনকে পূর্ণ করবে যখন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে উন্নয়ন তৎপরতার সাথে নারীকে সম্পৃক্ত করা হবে। অর্থাৎ নারী সম্পূর্ণভাবে উন্নয়নের বাইরে নয় বা নারীকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী কৃষি উৎপাদন বা অর্থ উপার্জনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় বলে অথবা সামাজিক অবস্থানের কারণে নারী তার প্রদেয় শ্রমের সরাসরি মূল্য পাচ্ছে না বলে কিংবা প্রচলিত সামাজিক মূল্য বোধের কারণে উপার্জনকারী অধিকাংশ নারী তার শ্রমলব্ধ উপার্জনের টাকা সরসরি স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিতে পারছেনা বলে তার অর্থনৈতিক কর্মের স্বীকৃতি পাচ্ছে না।

দুইঃ নারী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরুষের তুলনায় সমহারে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং উন্নয়ন ধারায় প্রান্তিক অবস্থানে টিকে আছে।[২]

[২] Rownaq Jahan & Hanna Papnek, women in Development-Perspective from South and South East Asia, Bangladesh institute of Law and Affairs.

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন নীতিমালার লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্যই এইদুটো বিষয়ের কেন্দ্রে রয়েছে। অথবা এও বলা যায় প্রচলিত উন্নয়ন নীতিমালা নারীর জন্য অনুকূলে নয় বলে নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এই দ্বি-মুখী বঞ্চনার শিকার। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর সঠিক অনুপাতে উপস্থিতির অভাব এবং পুরুষতান্ত্রিকতার একাধিপত্যের কারণে নারী একদিকে তার বিপুল উৎপাদনশীল শ্রমের স্বীকৃতি অর্জন করতে পারছে না, অপরপক্ষে আধুনিক ও গতিশীল উন্নয়ন ধারায় পুরুষের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রাচীন ও সনাতন ধারার বা পদ্ধতির কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে থাকছে। ফলে সার্বিকভাবে নারীর অবস্থান পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর থেকে যাচ্ছে। এভাবেই নারী অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ইত্যাদি সার্বিক ক্ষেত্রেই নারী পিছিয়ে পড়েছে। তবে তাকে পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্তি দিতে পারে শিক্ষা। গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রচার প্রচারণা, নারী শিক্ষার সুফল সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। সেই উনিশ শতকের পর থেকে একবিংশ শতক পর্যন্ত নারী যতটুকু অগ্রসর হয়েছে তার সবটুকুই সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন মুদ্রণ মাধ্যমের তথা গনমাধ্যমের কল্যাণে। নারীকে আজ শিক্ষকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা, গবেষণা, ব্যাংকিং, সমাজসেবক, ব্যবসা পরিচালক, কৃষি ক্ষেত্র, সৈনিক, পুলিশ, বৈমানিক, পর্বতারোহী, মহাশূন্য অভিযাত্রী, মনোবিজ্ঞানী ইত্যাদি সমাজজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে দক্ষতার সাথে পদচারণা করতে দেখা যাচ্ছে, সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে স্বীয় অবস্থান তৈরী করতে নারীকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। জীবনযুদ্ধে তার এই অগ্রসরমানতা প্রতিনিয়তই লিঙ্গ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। আধুনিক গণমাধ্যম গুলি এ ক্ষেত্রে তাকে সার্বিক সহায়তা দানে ব্যর্থ হলেও এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ঃ

আমরা জানি,যে কোন বিষয়ে গবেষণা, সংযুক্তি কিংবা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পিত ও নিয়মানুগ পথে অগ্রসর হতে হয়। ভিত্তিহীন বক্তব্য কিংবা আলোচনা নয়, বরং সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব ও পদ্ধতি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন ও গণমাধ্যম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ মূলক পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নমালা (Questionare) তৈরি করা হয়েছিল। এ প্রশ্নমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, পরিচালক, কর্মকর্তা, সাধারণ মানুষ, চাকুরীজীবী, গৃহিনী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী প্রমুখ ব্যক্তি বর্গের সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাছাই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নগুলো উন্মুক্ত ছিল (পরিশিষ্ট দেখুন)।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময় বহণযোগ্য ভয়েস রেকর্ডার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের নারী পুরুষ তথা গণমাধ্যমের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় ও মতামত পাওয়া গিয়েছে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গণমাধ্যমের বিভিন্ন কর্মকান্ডে, সমাজে এর কার্যকারিতা ও নারী উন্নয়নে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া, নারী সংগঠন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ, গণমাধ্যম সংক্রান্ত বিভিন্ন বই-পত্র প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নারী বিষয়ক বিভিন্ন সভাসমিতি ও বিভিন্ন সেমিনার পত্র, রিপোর্ট ও কার্যবিবরণী, জাতিসংঘ প্রকাশিত বিভিন্ন বার্ষিক প্রতিবেদন, সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন রিপোর্ট ও পরিসংখ্যানাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। ব্যক্তি পর্যায়ে রেডিও,টিভি, সিনেমা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট ঘেটে তথ্য সংগ্রহ ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। সমস্ত সংগৃহীত তথ্যের সাথে স্বীয় পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এ গবেষণা কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

বলা বাহুল্য বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন কর্মজীবী নারী সদস্য হওয়ার কারণে মাঠপর্যায়ে কাজ করার ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা মোকাবেলা করে তবেই এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়ে যেতে পারে।

উন্নয়ন তথা 'নারী উন্নয়ন', 'গণমাধ্যম', এর অতীত প্রেক্ষাপট সহ কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সময়ের এই সংক্রান্ত কাজের ধারাবাহিকতার সাথে নতুন কিছু সংযোজন

এবং পূর্ণাঙ্গতা প্রদানের ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে এ গবেষণা প্রকল্পের যথার্থতা প্রমাণিত হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য অনুসন্ধান ঃ

বর্তমান গবেষণায় প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী উভয় ধরণের তথ্যই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাইমারী তথ্য সংগ্রহের প্রধান উৎস ছিল বই, পত্র-পত্রিকা বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ, শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমে উন্নয়ন মতাদর্শ, বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং নারী উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন গণমাধ্যমের বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানের এর অনুষ্ঠানমালা পর্যবেক্ষণ, সিনেমা, নাটক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে গবেষণা কার্য পরিচালনার চেষ্টা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ, জার্ণাল, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রতিবেদন বিভিন্ন সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, গবেষণা পত্র এবং অন্যান্য উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য সাহায্য নিতে হয়েছে। বিশেষভাবে বিভিন্ন লাইব্রেরী/পাঠাগার ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।
- কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী
- উইমেন ফর উইমেন
- বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি.আই.ডি.এস)
- সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র
- নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা
- ষ্টেপটুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
- প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
- সি.ডি.এল
- বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ
- বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা ঢাকা
- একুশে টেলিভিশন
- চ্যানেল আই

Dhaka University Institutional Repository

- এটিএন বাংলা
- এনটিভি
- বাংলা ভিশন
- চ্যানেল ওয়ান
- বৈশাখী টিভি
- বাংলাদেশ বেতার
- বিবিসি
- রেডিও টুডে (৮৯.৬ এফ.এম)
- রেডিও ফুর্তি ইত্যাদি।

এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র, পত্রিকা ও সাময়িকীর সাহায্য নেয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন ডাটা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ওয়েবসাইটের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

১.৫ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা ঃ

সুষ্ঠুভাবে গবেষণার কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে গবেষণা সংশ্লিষ্ট মৌলিক তথ্যসূত্র, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা পাঠের মাধ্যমে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন ও নারী সংক্রান্ত ধারনা বিশ্লেষণ ঃ 'উন্নয়ন' 'নারী উন্নয়ন' ও 'গণমাধ্যম' পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং অত্যন্ত ব্যাপক ধারণা। ইতোমধ্যে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত অনেক কাজ হয়েছে। এই গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে ধারনা নেওয়া হয়েছে। নারী উন্নয়ন ও উন্নয়ন ধারণা সংক্রান্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেগুলোর অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম সম্পাদিত, 'নারী ঃ রাষ্ট্র উন্নয়ন ও মতাদর্শ' গ্রন্থখানিতে নারী বিষয়ক প্রবন্ধগুলি ত্রৈমাসিক 'সমাজ নিরীক্ষণ' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'উন্নয়ন' নীতি, রাষ্ট্রযন্ত্র (সরকারী কিংবা বেসরকারী) ও মতাদর্শের মাধ্যমে নারী কিভাবে অধস্তন এবং প্রান্তস্থ হয়ে আছে, কীভাবে নারী অহরহ

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, পুরুষতান্ত্রিকতা কিভাবে নারীর নির্মাণ প্রক্রিয়াকে চালিত করছে, নারী তার অবউন্নয়ন বা অধস্তনতার বাঁধন থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে বা কীভাবে প্রতিবাদ করছে এসব সূত্র ধরে নারী উন্নয়নকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগত বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে-এ গ্রন্থখানির বিভিন্ন প্রবন্ধ গুলির মাধ্যমে। নারীর অধস্তনতা উন্নয়ন বা অবউন্নয়ন, প্রতিবাদের প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝবার জন্য কেউ কেউ ব্যবহার করেছেন অভিজ্ঞতাশ্রয়ী (Empirial) গবেষণা, আবার অনেকে তাত্ত্বিক কাঠামো ও দাঁড় করাতে চেয়েছেন। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয় নির্ধারিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, তবে আন্তর্জাতিক তথা তৃতীয় বিশ্বেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও নারীর অবস্থানের স্বরূপ আঁকা হয়েছে তাত্ত্বিক ও তথ্যগত উভয় রূপরেখায়। এ গ্রন্থখানিতে সংকলিত এ সকল প্রবন্ধের মাধ্যমে যেমন বাংলাদেশের পটভূমিতে নারী বিষয়ক গবেষণার ধারাকে চিহ্নিত করে, তেমনি তৈরী করে সেই পটভূমিতে তাত্ত্বিক আলোচনা করার ক্ষেত্র ও তাগিদ।

এ গ্রন্থখানি ছাড়াও ত্রৈমাসিক সমাজ নিরীক্ষণ প্রত্রিকাগুলোর নিয়মিত অধ্যয়ণ এ গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে দারুণভাবে। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথমেই 'উন্নয়ন' ধারণার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ এবং অবদান সম্পর্কে Ester Boserup এর Women's Role in Economic Development গ্রন্থটি মৌলিক এবং অগ্রগণ্য। আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ এবং অবদানের পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীদের ভূমিকার পরিবর্তন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যখনই নারীকে উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্ত করণের প্রশ্ন আসে তখনই বুঝতে হবে যে নারী কখনো উন্নয়নে বিচ্ছিন্ন নয়। সৃষ্টির শুরু থেকে উন্নয়নের ব্যাপক কর্মপরিধিতে নারীর বিপুল অবদান রয়েছে যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কর্মের স্বীকৃতি পাচ্ছে না। নারীর কাজের আর্থিক মূল্যায়ন নেই কিন্তু কর্মে সম্পৃক্তি রয়েছে। উন্নয়ন নীতিমালায় কেন্দ্রে নারীর অবস্থান নেই বলে তার অবস্থান অনগ্রসর ও প্রান্তিক। প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর পাশ্চাৎপদ অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন। Rownak Jahan ও Hanna Papanek সম্পাদিত Women in Development perspective from

Dhaka University Institutional Repository

South and South East Asia গ্রন্থে এ বিষয়ে ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থান বিশেষ করে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নারীদের অবস্থান নিয়ে আলাচনা রয়েছে এ গ্রন্থে। পাশাপাশি আলোচনা রয়েছে রাষ্ট্রভেদে অবস্থার বৈপরীত্য নিয়েও।

নারী উন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রনজিৎ বন্দোপাধ্যায় রচিত উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৯৫০-১৯০০) গ্রন্থ খানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস জানতে হলে নারীকেন্দ্রিক আন্দোলন ও তার গতিপ্রকৃতি লক্ষণ জানা একান্ত প্রয়োজন। এ সময় ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালির মনে জেগেছিল আত্মমর্যাদা ও তীব্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উগ্র মূল্যবোধ। মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিই এ যুগে মানব ধর্মের সাধনা বলে একান্তভাবে গণ্য করা হয়েছিল। তাই নারীত্বের প্রতি নবজাগ্রত শ্রদ্ধাবোধ, সমাজের সামগ্রিক উন্নতির কথা চিন্তা করে, বা ব্যক্তিগত জীবনেও অনেকে নারীর ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহনশীলতা স্নেহবাৎসল্য, সেবাপরায়নতা ইত্যাদি সদ্গুণের সান্নিধ্যে এসে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিবশত সম্ভবত এ কাজে হাত দিয়েছিলেন, যা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। আলোচ্য পর্বের কয়েকজন খ্যাতনামা মনীষী যথা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সংস্কারক অথবা দেশনেতা এভাবে হয় বাইরের প্রভাব অথবা অন্তরের তাগিদ, অথবা উভয় কারণে নারী মুক্তি ও নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কাজেই এরা দাবি তুলেছিলেন নারীকে শিক্ষার অধিকার দিতে হবে, পিতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার মেনে নিতে হবে। বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ আন্দোলন, বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও তৎসহ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাস নানা সংস্কারত্মক আন্দোলনের আশ্রয়ভূমি হয়ে উঠেছিল। আর সামাজিক আন্দোলনের এ ধারাটি তীব্রতর হতে পেরেছিল তৎকালীন গণমাধ্যমের কল্যাণে, সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে। এ গ্রন্থে নারী কেন্দ্রিক উন্নয়ন বা আন্দোলনের সাহিত্য প্রতিফলনের ব্যাপারটি ও অভিনবত্বের দাবি রাখে। বর্তমান নারী সমাজের উন্নয়নের ধারা যে পথে এগিয়ে চলেছে এর ইতিহাস জানতে হলে বিগত শতকের নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস ও সমকালীন সমাজ মনের পরিচয় সমগ্রভাবে জানার প্রয়োজন, যা লেখক এ গ্রন্থখানিতে তুলে ধরেছেন। লেখক

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর গবেষণাগ্রন্থ খানির প্রারম্ভিক আলোচনার এক পর্যায়ে বলেছেন-'বিগত শতকে পুরুষশাসিত সমাজে নারী নির্যাতনের চিত্র দেখে বর্তমান সভ্যসমাজ ঘৃণায় তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে। পুরুষ সমাজের চোখ ফুটবে। হয়তো নিজেদের কুকর্ম দেখে লজ্জা পেয়ে গণপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। বধূহত্যার উপশম হবে। এক কথায় গ্রন্থটি সম্পূর্ণ যুগোপযোগী।'[৩] এ গ্রন্থখানিতে বিদ্ধৃত লুপ্ত প্রায় পত্র পত্রিকা থেকে উদ্ধারকৃত মূল্যবান তথ্যসমূহ গবেষণার কাজে দারুণ ভাবে সাহায্য করেছে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নয়নে নারীর অবমূল্যায়নকৃত অবস্থার ধারণা পাওয়ার পর বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে নারীর অবস্থানের চিত্র তুলে ধরা যায়। বিশ্ববাজারে নারীর শ্রম, সিদ্ধান্তপ্রণয়নে তার প্রান্তিক অবস্থানের কারণে কর্মের স্বীকৃতি পাচ্ছে না। সমাজে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মুখী অবস্থানে নারী উন্নয়নে রয়েছে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা। নারী জীবনের সর্বত্র বিচিত্র ও বহুমুখী এ প্রতিবন্ধকতা সমাজ সৃষ্ট। এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরী। নারী পুরুষ বৈষম্যমূলক অবস্থা সর্বকালে সর্বত্র লক্ষ্যনীয়। এ বিষয়গুলোতে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত হয়েছে জাতিসংঘ প্রকাশানা Women: Looking Beyond 2000 এর Women and Economic Decision Making নিবন্ধে। বৈশ্বিক পরিসরে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যেমন কৃষি, শিল্প, চাকুরী প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন নারীদের তুলনামূলক অবস্থান নিয়ে পরিসংখ্যান গত উপাত্ত থেকে নারীর সীমাবদ্ধ অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশণা হল জাতিসংঘ প্রকাশিত বিশ্ব প্রতিবেদন The world's Women 1995-Trands and statistics.

নারীর ঐতিহাসিক অধস্তন অবস্থান, আইনগত, সামাজিক ধর্মীয়, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে Women For Women : Bangladesh 1975 গ্রন্থে। সংকলিত এ গ্রন্থে বিজ্ঞ নারী লেখকগণ সমাজে নারীর অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি এর মূলসূত্র খুঁজে বের করেছেন এবং তা থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দিয়েছে। গবেষণাধর্মী এ গ্রন্থখানি The Women For Women

[৩] রনজিত বন্দোপাধ্যায়, উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৯৫৮-১৯০০) প্রকাশক অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায়, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৯।

Research and Study Group এর সৌজন্যে প্রকাশ করেছে University press Limited, Bangladesh.

নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান যে নিয়ামকটি আমাদের সামনে প্রতিফলিত হয় তা হল নারী শিক্ষা। একজন সুশিক্ষিত আত্মসচেতন নারীই পারে সমাজের অচলায়তনভেঙ্গে নিজের উন্নত অবস্থান তৈরী করতে। শিক্ষা নারীকে অর্থ উপার্জনের পথ তৈরী করে দেয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীকে প্রান্তিক অবস্থান থেকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। এ সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা' 'উন্নয়ন পদক্ষেপ' স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রকাশনা সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এছাড়া নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের কর্মকান্ড, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, উন্নয়নের জন্য বাজেট প্রণয়ন-বাজেটের কতটা অংশ প্রকৃতই নারী উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়, এতে তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা কতটা উপকৃত হয়, এ পর্যন্ত প্রণীত বাজেটের কত অংশ কিভাবে নারী উন্নয়ন খাতে ব্যবহৃত হয়েছে ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা মূলক পুস্তক সমূহের মধ্যে এ গবেষণায় বিশেষভাবে তথ্যগত দিক নির্দেশনা পাওয়া গেছে Dr. Pratima Paul-Majumder রচিত Bangladesh Nari Progati Sangha প্রকাশিত Reflection of women's Voice and National Gender Objectives in The National budget of Bangladesh, (Published in September 2003) গ্রন্থ খানিতে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সেমিনারে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনা, জাতীয় বাজেটে নারীর প্রতিনিধিত্ব, নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কলকারখানায় নিয়োজিত শ্রম ও শ্রম বন্টন ও মজুরী বন্টন সংক্রান্ত আলোচনা সমাজ কল্যাণ, সমবায়, যুব উন্নয়ন-নারী ও শিশুর জন্য প্রণীত বাজেট ইত্যাদি সংক্রান্ত বিশ্লেষণাত্মক, গবেষণাধর্মী, পরিসংখ্যান মূলক আলোচনা রয়েছে এ গ্রন্থখানিতে। বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব ব্যবস্থার ধরনের উপরও নারীর শ্রমধর্মীতা প্রভাবিত হয়। সংস্কার পরবর্তী অবস্থায় একদিকে যেমন ঃ নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তেমনি গার্হস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাধ্য হয়ে কাজে যেতে হচ্ছে এই দ্বি-মুখী সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের From Plan to Market World: Development Report 1996. ষ্টেপ টুওয়ার্ডস

ডেভেলপমেন্ট প্রকাশিত উন্নয়ন পদক্ষেপ জার্নালে কমলা ভাসিন রচিত ‘প্রচলিত উন্নয়ন বমাম টেকসই উন্নয়ন’ এ প্রচলিত উন্নয়ন ধারায় নারীর অবস্থান এবং টেকসই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় করণীয় সম্পর্কে সুচিন্তিত আলোচনা প্রতিফলিত হয়েছে।

বিশ্ব ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান উন্নয়নের উদ্দেশ্য জাতিসংঘ শুরু থেকেই বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে নারীর মর্যাদা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে, আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছে। আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে পদক্ষেপ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। রচিত হয়েছে CEDAW কনভেনশন। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন এ বিষয়ে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। জাতি সংঘের নারী ইস্যু সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা সমৃদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে HIkka Pietila ও Jeanne Vickers রচিত Making Women Matter-The Role of the United Nations.

জাতিসংঘ আয়োজিত সর্বশেষ অনুষ্ঠিতবিশ্ব নারী সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনায় গবেষণার সুবিধার্থে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সম্মেলনে গৃহীত বারোটি নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারী উন্নয়নের এ পর্যায়ে বেইজিং পরিকল্পনা একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। গণসাহায্য সংস্থার শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র প্রণীত ‘চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ঃ আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত”-নামক পুস্তিকায় সংক্ষেপে বিশ্ব নারী সম্মেলন সমূহের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে; একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলনগুলোর আপাত ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার পাশাপাশি নারী আন্দোলন ও উন্নয়নের গতি প্রকৃতি বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা দেয়া হয়েছে। গণসাহায্য সংস্থার উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ মালেকা বেগম পুস্তকটি রচনা করেছেন এবং ড. নাজমা চৌধুরী বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়েছেন। এরা দুজনই এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন স্বীয় প্রতিভাগুণে।

চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে। আয়েশা খানম অনূদিত বেইজিং কর্মপরিকল্পনা রচনায়। এছাড়া সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে ইউএনডিপি, ইউনিসেফ আয়োজিত ওয়ার্কশপ, সেমিনার বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে। এ ব্যাপারে প্রকাশিত বিভিন্ন বিশ্ব প্রতিবেদন সুস্পষ্ট ধারণা দান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গোটা বিশ্বের নারীর অবস্থান বোঝার জন্য জেন্ডার ফ্রেম ওয়ার্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে Candida March, Ines Smyth এবং Maitrayee Mukhopadhyay রচিত গ্রন্থ A Guide to Gender - Analysis Framworks বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। Kali for Women প্রকাশিত 'Understanding Gender' লিখেছেন Kamla Bhasin এ ক্ষেত্রে এ বইখানিও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আরও একটি বইয়ের কথা না বললেই নয়-সেটি হচ্ছে Caroline O.N. Moser এর গ্রন্থ " Gender Planning and Development : Theory, Practice and Training" অত্যন্ত কার্যকর।

উন্নয়ন ধারণার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, জেন্ডার ফ্রেম ওয়ার্ক, নারীর আর্থ সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি আলোচনায় আর ও সেসব গ্রন্থ সমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে হাসিনা আহমেদ অনূদিত "বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ", বেবী মওদুদ রচিত "বাংলাদেশের নারী", আখতার ইমাম এর "বাছাই রচনা ঃ প্রসঙ্গ নারী", শাকিনা হাসীন রচিত "নারী ও মৌলবাদ", ইনস্টিটিউট ফর'ল এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রণীত পুস্তিকা "নারী ও মানবাধিকার ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষিত", নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা কর্তৃক প্রকাশিত নারী উন্নয়ন ঃ নীতিনির্ধারণী পর্যালোচনা শীর্বক উবিনীগ এর প্রথম কর্মশালা 'নারী ও উন্নয়ন নীতি ঃ প্রবনতা, দর্শন ও প্রয়োগ' (সংক্রান্ত প্রকাশিত পুস্তিকা, বাংলাদেশের নারী প্রগতি সংঘ ও ইনষ্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত) ডঃ প্রতিমা পাল মজুমদার রচিত 'বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা বাজেট ও নারীর ক্ষমতায়ন, বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জাতীয় বাজেটের ভূমিকা' ইত্যাদি গ্রন্থরাজি উল্লেখ যোগ্য।

নারীর মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সুবিধা সমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে নারী কতটা বঞ্চিত ইত্যাদি আলোচনার ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান এর বিভিন্ন ধারা সমূহ উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত, 'নারী ঃ প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি' গ্রন্থের সুরাইয়া বেগমের প্রবন্ধ "রাষ্ট্রীয় মতদর্শ এবং অংশগ্রহণের সংকট ঃ পরিপ্রেক্ষিত নারী" এবং মেঘনা গুহ ঠাকুরতা রচিত প্রবন্ধ বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈদিশিক

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্য ও নারী সমাজ এই দুটো প্রবন্ধ বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মতাদর্শিক ভিন্নতা রাষ্ট্রীয় চরিত্রের ধরণ বিশ্লেষণ, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত উদ্যোগ, কর্মের সুযোগে নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমূহে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমূহ হতে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ফাহমিদা আখতারের বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও মহিলা ঃ মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। The Fifth Five Year Plan, 1997-2000, Planning Commission, Ministry of Planning, Govt. of Peoples Republic of Bangladesh উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন সময় যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয় সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থান এবং সে অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। University press Ltd. প্রকাশিত Hossain Zillur Rahman এবং Mahbub Hossain সম্পাদিত Rethinking Rural Poverty Bangladesh as a case study গ্রন্থটি উল্লেখ যোগ্য।

উন্নয়নের কোন স্তরে নারীর প্রকৃত অবস্থান কিরূপ তা জানতে হলে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা (পঞ্চদশ খন্ড) এ প্রকাশিত এম. এ মান্নান এর "মানব উন্নয়ন সূচক এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক রিভিউ প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেখানে তিনি ইউ এন. ডিপির (HDI) বা মানব উন্নয়ন রিপোর্ট গুলির ভিত্তিতে নারী উন্নয়নের হিসেব নিকেশ করেছেন, এর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারী বঞ্চনার সার্বিক দিক গুলি তুলে ধরেছেন। এছাড়া Bangladesh Bureau of Statistics প্রকাশিত বিভিন্ন বছরের Statistical Year Book এ গবেষণায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

সমাজ নিরীক্ষণে প্রকাশিত মালেকা বেগমের প্রবন্ধ 'নারীর সম অধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ' এবং বেইজিং প্লাস ফাইভ রিভিউ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, বেইজিং প্লাস

Dhaka University Institutional Repository

ফাইভ রিভিউ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, বেইজিং প্লাস পর্যালোচনা প্রতিবেদন জুন ২০০০, বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য। নারী আন্দোলনের সূচনা, অগ্রযাত্রা, জাতিসংঘের ঘোষণা, বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত দলিলের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা ও পূর্ণতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থান এবং দলিল সম্পর্কে বাংলাদেশের অবস্থান তথা স্বীকৃতি এবং কয়েকটি ধারার অস্বীকৃতি প্রদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এ দুটি রচনাতেই।

নারীর অগ্রযাত্রার শুরু থেকে একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণের মাধ্যমে নারীর বর্তমান অবস্থানের ভিত্তি রচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে গণমাধ্যম। এবং নারীর অগ্রযাত্রাকে আরও সুসংহত ও বেগবান করতেও পারে এই গণমাধ্যম। আর এ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই গণমাধ্যমের প্রকারভেদ, উন্নয়ন ও নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ জার্নাল ও পত্রপত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রসঙ্গে Wilbur Schramm তার Mass Media and National Development (Stanford University Press, Stanford, California, 1964) গ্রন্থ খানিতে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে উন্নয়নে গণমাধ্যমের সহায়ক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

সমাজ নিরীক্ষণ (৬০) এ প্রকাশিত মোঃ সফিকুল ইসলাম রচিত 'উন্নয়ন যোগাযোগ ও সাম্প্রতিক ভাবনা'-লেখাটিতে উন্নয়নে গণমাধ্যমের শক্তিশালী ভূমিকার কথা অত্যন্ত সুচারু রূপে বিশ্লেষণ করেন। আমার গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর এ তথ্য বহুল লেখনীর বিশেষ সাহায্য নেয়া হয়েছে।

গণমাধ্যমের প্রচারণা কতটা জেন্ডার সচেতন, তৃতীয় বিশ্বের গণমাধ্যম নিরীক্ষণের পর্যালোচনা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে নারী প্রতিমা কিরূপ, গণমাধ্যমের নারীর ইমেজ ইত্যাদি নারীর জীবনের সার্বিক দিকগুলো গণমাধ্যমে কিভাবে প্রতিফলিত হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম এবং অন্যান্য সম্পাদিত ও নারী সংহতি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ 'গণমাধ্যম ও নারী' গ্রন্থে। এ ছাড়া ফাহমিদুল হক রচিত স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট প্রকাশিত (২০০৬) 'মিডিয়া ও নারী' বইটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। বইটিতে তিনি দেখিয়েছেন মিডিয়ায় নারীর রূপায়ণ অংশগ্রহণের বিবরটি একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সরাসরি

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কযুক্ত। কারণ মিডিয়া গুলো সমাজেরই অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে দেখা হয় অধস্তন, দুর্বল, পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল, সৌন্দর্য ও যৌনপ্রতীক হিসেবে। গণমাধ্যমে ও সেভাবে নারীকে উপস্থাপন করা হয় কিনা তা পরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সংক্রান্ত গবেষণায় প্রিন্ট মিডিয়া কিভাবে নারীকে অন্ধকার অচলায়তন থেকে বের করে এনেছে সে সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া লিখিত স্ত্রী জাতির অবনতি, অবরোধ বাসিনী রসনা বিলাস ইত্যাদি প্রবন্ধ সমূহের উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এদেশের নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। বাংলা একাডেমী কতৃর্ক প্রকাশিত 'রোকেয়া রচনাবলী'-তাই যেকোন নারী উন্নয়ন গবেষণায় জন্য বিশেষ ভাবে জরুরী যেমন ছিল আমার এ গবেষণার ক্ষেত্রে। শরৎ চন্দ্রের নারীর মূল্য' বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষে (১৮৭৩-উপন্যাস) সমাজ সমর্থিত কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাদের সুচিন্তিত ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। একালের প্রতিমা পাল মজুমদারের শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণের বিভিন্ন মুখিতা প্রবন্ধে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে সবিশেষ ধারণা দেয়া দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষায় (চতুর্বিংশতিতম খন্ড) প্রকাশিত ফাহমিদা খাতুন ও খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম রচিত পোশাক শিল্পে ন্যূনতম মজুরিঃ বাংলাদেশ পেক্ষিত, ফকরুল ইসলাম রচিত শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা-প্রবন্ধ দুটি যেমন মজুরী কাঠামো শ্রম বাজারে নারীর বঞ্চনার চিত্রায়িত করে, নারী শিক্ষায় বর্তমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে তেমনি নারী উন্নয়ণের পথে সম্ভার সমাধানের ও পথ দেখায়। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে মিডিয়া নারীর সব অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক রাজনৈতিক ইত্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে কখনও তা ইতিবাচক আবার কখনও তা নেতি বাচক। Action Aid Bangladesh এর সহযোগিতায় জেন্ডার ইনমিডিয়া ফোরাম প্রকাশিত "জেন্ডার অধিকার ও গণমাধ্যম" এ প্রকাশিত বিভিন্ন সেমিনার পেপারগুলো নারীর অধিকার এর বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জেন্ডার ইন মিডিয়া ফোরাম এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ২৪ মার্চ শনিবার ২০০৭, 'জেন্ডার অধিকার ও গণমাধ্যম' শীর্ষক একটি সেমিনারে আয়োজন করে।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল জন নীতিমালা (Public policy) আছে, সে সব জন নীতিমালা এবং আইনি বিষয় গুলোকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে যার কৌশল ও করণীয় নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য যে সেমিনার করে সেটি নারী উন্নয়ন গবেষণার কাজে যথেষ্ট সহায়তা দান করেছে। এ ছাড়া Oxford University Press কর্তৃক প্রকাশিত (Oct 25, Friday, 2005) International Herald Tribune : Pay attention to the women এ Rownaq Jahan এর লেখা ও এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। উন্নয়ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গণমাধ্যমের সাহায্যে তথ্য প্রচার, শিক্ষন ও সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের আচরণগত পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। গণমাধ্যমের সকল প্রচার প্রচারণা উন্নয়নে সফল ভূমিকা রাখতে পারে। উন্নয়ন পদক্ষেপ (মার্চ ২০০৭) এ প্রকাশিত শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী রচিত উন্নয়নে জেন্ডার সংবেদণশী এবং কার্যকর যোগাযোগ উপকরণ-সংক্রান্ত লেখাটিতে এ বিষয়ে অত্যন্ত সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেছে। ঐ একই সংখ্যায় শাহীনা সুলতানা সুমী রচিত "জেন্ডার সমতা আনার ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা", গীতি আরা নাসরীনের "গোঁফ দিয়ে যায় চেনা ঃ অলিখিত জেন্ডার ব্যাকরণ নিয়ে পুর্নভাবনা", নাসিমুন আরা হক মিনু রচিত নিবন্ধ "সংবাদ মাধ্যমে নারীর অধিকার"; এপ্রিল ২০০৮ সংখ্যায় (মূলরচনা) স্টেপস্ বিশেষ নিবন্ধ-জেন্ডার এবং উন্নয়ন যোগাযোগ মেলাঃ সমাজ পরিবর্তনে সামাজিক যোগাযোগ, উন্নয়ন পদক্ষেপ ২৯ তম সংখ্যায় গীতি আরা নাসরিণের নিবন্ধ বিজ্ঞাপনে 'নারীর (অপ) রূপায়ণ', উন্নয়ন পদক্ষেপ পঁয়ত্রিশতম সংখ্যার প্রকাশিত স্টেপস্ নিবন্ধ "গণমাধ্যমে নারী" প্রভৃতি লেখনী গুলো গবেষণার কাজে বিশেষ সহায়তা দিয়েছে। গবেষণা কাজে উপরোক্ত প্রকাশনা সমূহের পাশাপাশি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করেছে বিভিন্ন বিশ্ব প্রতিবেদন। উন্নয়নের যথাযথ মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে Human Development Report 2008 বিশেষ ভাবে ভূমিকা রেখেছে। শুধু রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে বিজয় কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই মানবউন্নয়ন অর্জিত হয়না। এজন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা, শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সমাজের সার্বিক উন্নয়ন তথা নারী উন্নয়ন সম্ভব-যে ক্ষেত্রে গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ গবেষণার প্রয়োজনে যদিও প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন রচনাবলীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তবু এখানে এই আলোচনার সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশনা সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে অতিসংক্ষিপ্ত আকারে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন ও প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ

২.১ উন্নয়নঃ উন্নয়ন দর্শন ও ধারার ব্যাখ্যা, প্রবণতা, বিকাশ ও নারীর সম্পৃক্ততা

২.২ আধুনিক ও উন্নয়ন কৌশল ও মূলধারা উন্নয়নের সমস্যা

২.৩ বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের প্রবণতা বা ধারা এবং তার প্রয়োগ

২.৩.১ নারী উন্নয়নে সরকারী পদক্ষেপ

২.৩.২ নারী উন্নয়নের বেসরকারী পদক্ষেপ বা উদ্যোগ

২.৪ নারী উন্নয়ন গবেষণার ধারা

২.৫ উন্নয়ন ভাবনায় নারী ও জেন্ডার ফ্রেম ওয়ার্ক

২.৫.১ নারী উন্নয়ন মতবাদ

২.৬ মানব উন্নয়ন সূচক (এইচ ডি আই)

২.৬.১ লিঙ্গভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচক

২.৭ নারীর ক্ষমতায়ন

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ

২.১ উন্নয়ন দর্শন ও ধারার ব্যাখ্যা, উন্নয়ন উন্নয়ন, বিকাশ ও নারীর সম্পৃক্ততা ঃ

একঃ উন্নয়ন এর মত একটি বিমূর্ত চেতনা মূর্ত হয়ে ওঠে এর প্রায়োগিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে। উন্নয়ন-প্রত্যয়টি একটি সার্বিক ধারণার জন্ম দেয় যেখানে সমাজের সামগ্রিক অংশ প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশের মত এমন একটি অনুন্নত কিংবা উন্নয়নকামী দেশে উন্নয়ন বিষয়ক চিন্তাভাবনা প্রাধান্য পাবে এটাই স্বাভাবিক। তাই অনুন্নয়নের বা অবউন্নয়নের সমস্যায় ভারাক্রান্ত এই সমাজের যে কোন অংশ নিয়ে চিন্তা করলে সহজেই মনে প্রশ্ন জাগে, এর উন্নয়ন হবে কি করে; হোক সে শোষিত শ্রমিক, দরিদ্র কৃষক বা নিপীড়িত নারী। অবশ্য এই প্রশ্ন থেকেই সৃষ্টি হয় উন্নয়ন বিতর্ক কিংবা উন্নয়ন নিয়ে মত পার্থক্য, উন্নয়ন চিন্তার বিভিন্ন ধারা। কোন কোন সময় এসব চিন্তা উৎসারিত হয় বিদেশ থেকে, কোন কোন সময় এগুলি জন্ম নেয় দেশীয় প্রেক্ষাপটে। অনুরূপভাবে নারী সমাজের উন্নয়ন চিন্তা আসে দেশী ও বিদেশী উভয় ভাবধারা থেকে।

"এছাড়া 'উন্নয়ন' বলতে আমরা কি বুঝি এবং 'উন্নয়ন' শব্দটি দিয়ে আমরা কি লক্ষ্যকে চিহ্নিত করছি উভয় বিষয়ই প্রধানত দর্শনের সমস্যা। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের দার্শনিক বিচারের তুলনায় এ ক্ষেত্রে কমবেশী বিচার ও বিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে। এই বিতর্কের প্রতিফলন আমাদের দেশের উন্নয়ন সাহিত্যে তেমন কোন প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয় না। তবে সম্ভবতঃ এখন আমরা সবাই কমবেশী উপলব্ধি করি যে উন্নয়নের দার্শনিক বিতর্কের একটা সুরাহা ছাড়া উন্নয়নের কোন লক্ষ্যই নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যদিও সে বিতর্ক আমরা আমাদের দেশে শুরুই করিনি।[১]

উন্নয়নের যে দর্শন প্রচলিত চিন্তার মধ্যে প্রাধান্য প্রচলিত চিন্তার মধ্যে প্রাধান্য নিয়ে বিরাজ করে-মোটা দাগে সে দর্শনের অভিব্যক্তিগুলোকে দু'ভাবে চিহ্নিত করা যায়ঃ

[১] উবিনীগের মূল প্রবন্ধ 'নারী উন্নয়নের দর্শন ও ধারা, নারী ও উন্নয়ননীতি প্রবনতা, দর্শন ও প্রয়োগ নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণী পর্যালোচনা শীর্ষক উবিনীগ কর্মশালা, ২০ ও ২১ শে জানুয়ারী, ১৯৮৬, প্রকাশক ঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, পৃ. ১০-১১।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) উন্নয়ন শ্রেণী নিরপেক্ষ। অর্থাৎ উন্নয়ন গরীব ধনী উভয় শ্রেণীকেই উপকৃত করে। এমনকি উন্নয়নের গোঁয়ার্তুমি প্রায়শঃই ধরে নেয় যে উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারণের আগে সত্যিকারের জীবিত মানুষগুলোর ওপর কিরূপ প্রভাব পড়বে তার কোন হিসেবেরও দরকার নেই। কতিপয় পরিসংখ্যান, প্রবৃদ্ধির একটা গ্রাফ, কিছু গানিতিক মুন্সিয়ানা দিয়ে প্রমান করতে পারলেই চলে যে 'উন্নয়ন হয়ে গেছে'। পুরো ব্যাপারটাকে একটা পরাবাস্ত বাদীয় অংকে পরিণত করার প্রয়াস থাকে তথাকথিত শ্রেণীনিরপেক্ষ উন্নয়ন পরিকল্পনায়। উন্নয়নের সুফল যে সবার কাছে সমানভাবে পৌছুচ্ছে না এটা আজকাল স্বীকৃত। এই স্বীকারের মধ্য দিয়ে এযাবতকাল যে উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকান্ড তৎপর থেকেছে সে দর্শনের গলদটাই প্রকট হয়েছে মাত্র। কিন্তু সে দর্শন পুরোপুরি পরাস্ত হয়নি। কারণ এখন প্রস্তাব করা হচ্ছে 'টার্গেট' এর। 'শ্রেণী' শব্দটি খুবই সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে উন্নয়নের দর্শন, পরিকল্পনা এবং ক্রিয়াকান্ড সবই ঠিক আছে। আগে 'টার্গেট ' নির্ধারণ করা হয়নি, ফলে ভুল হয়েছে। এখন টার্গেট ঠিক করে উন্নয়নের সুফল ঠিক জায়গায় পৌছে দিতে হবে। উন্নয়নের দর্শন বিচার অতএব এখনো উপেক্ষিত।

খ) **উন্নয়ন নারী পুরুষ নিরপেক্ষ ঃ** অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্ক সমাজে বিরাজ থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নের সুফল বুঝি বা নারী ও পুরুষ উভয়েই সমানভাবে পায়। উন্নত দেশগুলোর নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাবে এ বিষয়টি এখন বিতর্কিত। নারী যে উন্নয়নের সুফল পাচ্ছেনা এটাও স্বীকৃত। কিন্তু উন্নত দেশগুলোর নারীবাদী আন্দোলন উন্নয়নের দর্শনে মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। পরিবর্তন হয়েছে কেবল ওখানেই যে নারী ও এখন উন্নয়নের 'টার্গেট'। উন্নয়নের দর্শন নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্ক নিরসনের কর্তব্যটি সতর্কতার সঙ্গে পাশ কাটিয়ে চলেছে। নারীকে উন্নয়নের 'টার্গেট' করা হয়েছে মাত্র, নারীর উন্নয়নের জন্যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। যে উন্নয়ন নারীকে সমাজে মানুষ সমাজে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং পুরুষের সমান করে তুলবে সেই উন্নয়নের পরিকল্পনা এখনো সদূর পরাহত। নারীকে উন্নয়নের টার্গেট হিসাবে নির্ধারণ করার মধ্য দিয়েও উন্নয়ন সংক্রান্ত চিন্তাও দর্শনের মৌলিক গলধটা প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

বোঝা যাচ্ছে উন্নয়ন মানেই সবার উন্নয়ন নয়। নারী বাদ থেকে যায়। নারীকে অতএব টার্গেট করা ছাড়া উপায় থাকে না।"[২]

দুটো ভিন্ন অর্থে নারী উন্নয়নের 'টার্গেট'-

"এক, নারী উন্নয়নের সুফল বিতরণের টার্গেট কারণ উন্নয়নের সুফল নারীর কাছে পৌঁছুচ্ছে না। অর্থাৎ সমস্যাটা সুফল বিতরণের। উন্নয়ন দর্শনের মধ্যে কিন্তু বিতরণের গলদ স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ উন্নয়নের সুফল নারীর কাছে পৌঁছুচ্ছে না জেনেও উন্নয়ন দর্শনের গোড়া নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। সে দর্শন ঠিকই বজায় রাখা হয়।

টার্গেট নির্ধারণ করে ধরে নেয়া হয় যে উন্নয়নের প্রচলিত দর্শনটা অলৌকিক উপায়ে টার্গেট হিট করবে। অতএব এক্ষেত্রে মূল দর্শনটাকে প্রশ্ন ও পরাস্ত করার দরকারটা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটাকে অক্ষত রাখার প্রয়োজনে।

দুইঃ উন্নয়ন ক্রিয়াকান্ডে নারীকে অংশগ্রহণ করিয়ে নেবার টার্গেট নারীর জন্যে আয় সংস্থান কর্মসূচী (ইনকাম জেনারেশন) কিংবা তাকে শিল্পপতি বানাবার প্রয়াস (উইমেন এন্টারপ্রিনিওর) ইত্যাদি এই টার্গেট দর্শনের অভিব্যক্তি। এই টার্গেট দর্শন গূঢ়ভাবে এবং চতুরতার সঙ্গে দাবি করে যে নারীর অর্থনৈতিক এবং উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে কোন অংশগ্রহণণ নেই। নারীর কাজের স্বীকৃতির অভাব কিংবা সংজ্ঞার অভাবেই অংশগ্রহণ নেই বলে ধরে নেয়া হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে কৃষি। কৃষিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকা সত্ত্বেও নারীর উৎপাদনমূলক ভূমিকার কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক স্বীকৃতি নেই। অন্যদিকে নারী কোন বিশেষ কাজ পারবেনা ধরে নিয়ে উন্নয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে সিদ্ধান্তের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাগের ধারণা প্রকটভাবে অভিব্যক্ত হয়। সে সকল শ্রম নিতান্তই নারীমূলক যে সকল শ্রম নারীকে যুগের পর যুগ পুরুষের চেয়ে হেয় অবস্থায় অধঃপতিত করে রাখে সে জাতীয় শ্রমেই কেবল নারীর অধিকার, পুরুষ যা পারে নারী তা পারেনা। এই লিঙ্গভেদ প্রচলিত উন্নয়ন দর্শন বিনা বিচারে বজায় রেখে দেয়।"[৩]

---

[২] প্রাগুক্ত পৃ.-১১।
[৩] পূর্বোক্ত, পৃ.১২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত সামাজিক প্রেক্ষিতে এটা ধরেই নেয়া হয় যে নারী কোন উৎপাদন মূলক কাজ করে না।

কৃষি ক্ষেত্রে বা শ্রমবাজারে নারীর গার্হস্থ্য শ্রম কিংবা ফসলের আগে বা পরের কৃষিশ্রম প্রভৃতি উৎপাদনমূলক কাজ হিসাবে এখনো অস্বীকৃত। তাত্ত্বিক, মতাদর্শিক যাই বলিনা কেন এটি একটি বিরাট সমস্যা। পয়সা আসে এমন ধরণের নারীমূলক কাজ যেমন সেলাই, কারুশিল্প, পাটি বুনানো ইত্যাদি অংশগ্রহণ করবার মত কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার নাম ও 'নারী উন্নয়ন' হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে।[৪]

এটা সত্য যে নারী চিরকাল অবহেলিত এবং উপেক্ষিত হয়ে আসছে এবং যে কোন ক্ষুদ্র সাহায্যই সে পায় তাকে নারী সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। ফলে নারীর মাধ্যমে যে সুফল অর্জন করা সম্ভব তা পুরুষ দ্বারা সম্ভব নয়। ডঃ ইউনুসের গ্রামীনব্যাংকের ঋণ সাহায্য গ্রহীতা নারীরা তা সমস্ত বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়ে গোটা উন্নয়ন মতাদর্শের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। আবার উন্নয়ন কর্মকান্ডে সামান্য সাহয্যে নারীর অংশগ্রহণের এবং ক্ষমতায়নের প্রমান মেলে ঠিকই কিন্তু উন্নয়ন দর্শনের গলদ থেকেই যায়।

'আসলে নারীকে উন্নয়নের টার্গেট করা হয়েছে নারীর উন্নয়নের জন্যে নয় বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে। এই ভিন্ন উদ্দেশ্য হল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। আর্থিক উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়ে নারীকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করাবার জন্য প্রনোদিত করা এই তথাকথিত (প্রচলিত) নারী উন্নয়নের উদ্দেশ্য।'[৫]

নারীকে যদি আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করা যায় তাহলে সে সন্তান ধারণের ব্যাপারে স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা অর্জন করবে। তাই জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রি বাজারজাতকরণের কৌশল হিসেবেও নারী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নারী উন্নয়নের একটি প্রধান উদ্দেশ্যে। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা নারী উন্নয়নের একটি প্রধান বাধা। তবে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে যেমন অর্থনৈতিক মুক্তি সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জুড়ে দেয়া জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তাকে সন্তান ধারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে । নারী মুক্তি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক-প্রচলিত

[৪] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।
[৫] পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন দর্শনের মধ্যে নারী উন্নয়নের এই চিন্তার সংযোজন করা একান্ত প্রয়োজন। "নারী উন্নয়ন দর্শনের যে কর্তব্য এখনও পালিত হয়নি সে কর্তব্য হচ্ছে নারীর সার্বিক উন্নয়নের প্রকৃত সংজ্ঞা আবিষ্কার করা।"[৬]

নারীকে পুরুষের সমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা এবং চিন্তা নিঃসন্দেহে এ যুগের দার্শনিক চিন্তার এক প্রধান শক্তিশালী ধারা। কিন্তু উন্নয়নের দিক থেকে এর মূর্ত নির্দিষ্ঠ লক্ষ্যটি কি; তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে নারী ও পুরুষের অসম হওয়ার প্রধান কারণগুলো সনাক্ত করতে পারলে নারী ও পুরুষ কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় পরস্পরের সমান হতে পারে তার একটা ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুলি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

২.২ আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন কৌশল ও মূল ধারা উন্নয়নের সমস্যা ঃ

বর্তমান ধনতান্ত্রিক বিশ্ব পরিসরে অনুসৃত উন্নয়ন মডেল মূলত অর্থনৈতিক মুনাফা এবং দ্রব্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের বাজার অর্থনীতি, আধুনিকায়নমায় সব ধরণের তাত্ত্বিক মতাদর্শ গণমাধ্যমের কল্যাণে সমগ্রবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে উন্নয়ন মডেল হিসেবে। গণমাধ্যমের কল্যাণে তা এতই প্রবলভাবে মানুষের মেধা, মনন ও মগজকে প্রভাবান্বিত করেছে যে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলি এর আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে না।

বর্তমানে এই উন্নয়ন মডেল প্রধানত দ্রব্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, মানব জীবনের অন্যান্য সার্বিক দিক যেমন মনস্তাত্বিক ও পারিবারিক দিক ইত্যাদি উপেক্ষা করে কেবল বস্তুগত দিক ও অর্থনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এ কারণে কোন দেশের উন্নয়ন এবং জনগণের সমৃদ্ধির মাপকাঠির নির্ধারক হলো সে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন। যা কিছু উৎপাদন করা হয় এবং বাজারে বিক্রি করা হয় তার দ্বারাই এই জিএনপি বা জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। মাদকদ্রব্য উৎপাদন, অশ্লীল সাহিত্য উৎপাদন, প্রদর্শন ও বিপনন, আগ্নেয়াস্ত্র উৎপাদন ও তাই জিএন পিতে অর্ন্তভূক্ত। কমলা ভাসিন তাঁর Some thoughts on Development and Sustainable Development এ প্রশ্ন

[৬] পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছেন, কিন্তু একটি দেশের আগ্নেয়াস্ত্র উৎপাদন দ্বারা কি সে দেশের ভালো মন্দ বিচার করা সম্ভব? প্রচলিত এই উন্নয়ন ধারায় মুনাফাই হচ্ছে ঈশ্বর। এই মুনাফা সাধারণত মুক্তবাজার ও মুক্ত বানিজ্যনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যা প্রকৃতপক্ষে মুক্ত ও নিরপেক্ষ নয়। উন্নয়নের এ ধারায় উৎপাদন প্রবনতা স্বত্ত্বেও জনগনের একটি বিরাট অংশের অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের ব্যবস্থা হয়নি এবং তাদের একটি বিরাট অংশ অপুষ্টিতে ভুগছে। আধুনিকায়নের আরেকটি প্রবনতা হচ্ছে উৎপাদনের বৈচিত্র যেমন- তত্ত্বের দর্শন যোগ্য উপস্থাপণা যা ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেমনঃ টেলিভিশন স্যাটেলাইট মাধ্যম, কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। আকাশ মাধ্যম মানুষের মনে প্রতিনিয়ত উন্নয়ন ধারণা সৃষ্টি, গ্রহণ, বর্জন, নির্মান, প্রতিস্থাপণ, পুনরুৎপাদন ইত্যাদি কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে করে যাচ্ছে। উন্নয়নের এ প্রচলিত ধারায় নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

এগুলো হচ্ছে ঃ

- প্রকৃতি ও পরিবেশ বৈরিতা
- জেন্ডার অসচেতনতা
- চাপিয়ে দেয়া কর্তৃত্বশীল মডেল
- সামরিকীকরণ ও সমর সজ্জামুখীতা
- একমূখীকরণ ও বৈচিত্র হ্রাস প্রভৃতি।[৭]

এ ছাড়া রয়েছে মূল্যবোধ ও মানবিকতার বাজারজাতকরণ এবং মনস্তাত্ত্বিক দিকটির প্রতি পরিপূর্ণ উদাসীনতা। এসব সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার সবগুলোই পরস্পর সম্পৃক্ত। তবে এগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা চাপিয়ে দেয়া কর্তৃত্বশীল মডেলের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

[৭] কমলা ভাসিন, "প্রচলিত উন্নয়ন বনাম টেকসই উন্নয়ন" উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা ১৯৯৮ পৃ. ৫৪-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

চাপিয়ে দেয় কর্তৃত্বশীল মডেল ঃ

উন্নয়নের বর্তমানধারায় অন্যতম সমস্যা হচ্ছে এর চাপিয়ে দেয়া প্রাধান্য বিস্তারকারী মডেল যার সার কথা বা ভিত্তি হচ্ছে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। স্থানীয় পর্যায়ে দেখা যায় অধিকাংশ জনগণ নিয়ন্ত্রণ না করে গুটি কয়েক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বেশীর ভাগ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছে। আবার জাতীয় পর্যায়ে কিংবা আন্তর্জাতিক বহুজাতিক সংস্থাগুলি অপর কোন দেশে বসে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জন্য বিভিন্ন রকম মতাদর্শ তৈরী করছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যা সেই সব দেশগুলির স্থানীয় পর্যায়ে কোন বিশেষ সুফল আনতে পারছে না। এ সকল সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপগুলো অনুন্নত, দরিদ্র কিংবা উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে উন্নত বিশ্বের বাজার সৃষ্টি করেছে ঠিকই কিন্তু গোটা বিশ্বকে একটি ভারসাম্যহীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে যা ঐ সকল দেশগুলোর সঙ্গে উন্নত দেশগুলির ব্যবধান বাড়িয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। এই ব্যবধান সৃষ্টির কৌশলকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠিত করেছে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন।

গ্রীক পুরানের অসাধারন চরিত্র রাজা মিডাস জীবনের এক পর্যায়ে এসে যা স্পর্শ করতেন তাই হয়ে উঠতো স্বর্ণপিন্ড। পুরানের এ চরিত্রটিকে আমরা বাস্তবে আবিস্কার করি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে একচেটিয়া পুঁজিবাদের মধ্যে। এই পুঁজিবাদ মিডাসের মতোই অভাবনীয় ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হয়। সে যা কিছুই স্পর্শ করুক না কেন বস্তু কিংবা নির্বস্তু তাই রূপান্তরিত হতে শুরু করে পন্যে, যা শুধু খুঁজতে থাকে বাজার আর মুনাফাকে। এই পুঁজিবাদ সাহায্য ও ঋণের নামে গোটা বিশ্বে কায়েম করলো এক নব্য সাম্রাজ্যবাদ বা আধিপত্যবাদ। যার জন্য প্রয়োজন হল মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খল চাপিয়ে দেয়ার প্রবনতা বা মনোজগতে উপনিবেশ স্থাপনের। সেই আগ্রাসনের জন্যে ব্যবহৃত হতে থাকলো সকল ধরণের যোগাযোগের মাধ্যমে'-এ সৃষ্টি হলো তথ্য সাম্রাজ্যবাদের যা রূপ নিয়েছে 'যোগাযোগ সাম্রাজ্যবাদ'এ পুঁজিবাদী অর্থনীতির অপরাপর শাখার মতোই গণমাধ্যগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে পরোক্ষভাবে শোষনের মাধ্যমে নব্য স্বাধীন দেশগুলোকে আদর্শিকভাবে অধীন রাখার লক্ষ্যে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম গুলোতে ও এই তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় সুস্পষ্টভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

- **প্রচলিত উন্নয়ন ধারা ঃ জেন্ডার অসচেতন ও বৈষম্যমূলক ঃ**

উন্নয়নের বর্তমান ধারা নারীকে প্রান্তিকভাবে উপস্থাপন করেছে। এ ধারা নারীর ক্ষমতা হরণ করেছে। নারীর মূখ্য ভূমিকা ও তা থেকে বিচ্যুত করণের ইতিহাস তুলে ধরেছেন কমলা ভাসিন। পরিবার যখন উৎপাদনের ও স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্র ছিল তখন নারীর অবস্থান ছিল কেন্দ্রবিন্দুতে। কৃষি, পশুপালন, কুটির শিল্প, ঔষধ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা তারা রপ্ত ও ধরণ করেছিল। কিন্তু এসব বিষয় যখন বানিজ্যিক ও শিল্পায়িত হয়ে গেল তখন সেখান থেকে নারী নির্বাসিত হল।[৮] তাদের কর্মপরিধি ও জ্ঞান ঐতিহ্যগত বলে অবৈজ্ঞানিক এবং অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করা হল।

ইষ্টার বসরূপ নারীর উৎপাদশীল ভূমিকা ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে বিশ্বব্যাপী নারীর শ্রমের শ্রমের অবদান বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, যখন উৎপাদন ক্ষমতা পরিবারের বাইরে চলে গেলে নারীরা তখন উৎপাদনের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল এবং ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ও তাদের আর কোন ভূমিকা রইলো না এবং তারা হয়ে পড়লো ক্ষমতাহীন। খাদ্যশষ্য উৎপাদনের পরিবর্তে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের বিষয়টা তখন এমন দাঁড়ালো যে, নারী শ্রম দেবে কিন্তু টাকা যাবে পুরুষের হাতে। খাদ্যশষ্য পরিবারকে খাদ্য যোগালেও যে ফসল অর্থ উৎপাদন করে সেই ফসল আর পরিবারের ভরণপোষনে থাকলো না। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, অধিকাংশ পুরুষের মধ্যে এই নগদ অর্থ প্রায়ই অপ্রয়োজনীয় খাতে অপচয় করার সম্ভাবনা বেশী থাকে। উন্নয়নের এই বর্তমান ধারা পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ও ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করেছে। এ কৌশলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে মুনাফা ভিত্তিক কৃষি ও শিল্পের প্রসার হয়। যা প্রধানত পুরুষকেই কাজ দেয়, প্রযুক্তির মালিক করে ও প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল শেখায়। কুটির শিল্প ধ্বংসের মাধ্যমে নারীর কাজের ক্ষেত্র বিনষ্ট করে দেয়, তার প্রাকৃতিক জ্ঞান ব্যবহারের ক্ষেত্র নস্যাৎ করে দেয়।[৯] বাংলাদেশের প্রধান শষ্য ধান উৎপাদন ও প্রক্রিয়ায় ক্ষেত প্রস্তুত, বীজ বপণ, আগাছা পরিস্কার এবং ধান কাটা পুরুষের দায়িত্ব। ফসল কেটে তারা বাড়ীতে নিয়ে আসে এবং বড়

---

[৮] কমলা ভাসিন, "প্রচলিত উন্নয়ন বনাম টেকসই উন্নয়ন" উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা ১৯৯৮ পৃ- ৫৪-৫৫

[৯] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জোর মাড়াইতে সাহায্য করতে পারে। এ পর্যায়েই শুরু হয় নারীদের কাজ। তারা ধান কে চালে রূপান্তরিত করে যা খাওয়া হয় বা বাজারে বিক্রি করা হয়।

এর মধ্যে রয়েছে ধান সিদ্ধ করার জন্য বড় চুলা তৈরী করা, আগুনের ধোঁয়ার মধ্যে বসে ধান সিদ্ধ করা, শুকানো, ভানা (এ প্রক্রিয়ার মধ্যে এ অংশটি সর্বাধিক সময় নেয়), ঝাড়া, বাছা এবাং গোলাজাতকরণ, এছাড়া উঠান ঝাড়ু দেয়া পরিস্কার করা নিকানো ইত্যাদি। তাছাড়া ও রয়েছে পশুপাখি কিংবা তস্করের হাত থেকে তা সযত্নে রক্ষা করা। চাল বাজারজাত করনের কাজটি করে পুরুষরা এবং পয়সা কড়ি তাদেরই পকেটস্থ হয়।

শ্রম যোগানের নিরিখে নারীরা প্রতিমন ধানে (৮০ পাউন্ড) ১.৫ দিনের শ্রম নিয়োগ করে অথচ পুরষগণ নিয়োগ করে ৪-৫ হতে ৬ দিনের মত শ্রম। অথচ মূল্য সৃষ্টির বিবেচনায় নারীদের অবদান অধিকতর উৎপাদনশীল। মোট মূল্যের শতকরা ২৫ হতে ৪০ ভাগ সৃষ্টি করে তারা।[১০]

কৃষি ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের পূর্বে নারী বীজসংরক্ষণ ও নির্বাচনের কাজটি করত। আধুনিকায়নের নামে নারীর কর্মের সুযোগ সীমিত হয়েছে, পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে নারী। বাংলাদেশে আধুনিকায়নের কৌশল এখনো অব্যাহত। বাজার অর্থনীতিতে নারীর অবস্থা দিন দিন অবনত হচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু নারীকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। নারীর শ্রমের সস্তা ব্যবহার হচ্ছে, নারীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি বা তার ক্ষমতায়নের জন্য কোন উন্নয়ন কৌশল নেয়া হয়নি। একদিকে বাজারে নারী তার স্বল্প দক্ষতা ও স্বল্প পুঁজি নিয়ে টিকে থাকতে পারছে না, অন্যদিকে দারিদ্রের কারণে পুরুষরা পরিবার ত্যাগ করে শহর অভিমূখী হওয়ায় নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। এই পরিবারগুলো বেশী দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছে।[১১]

নারী তার জীবনকালের বেশীরভাগ সময়ই নানারকম গঠনমূলক ও সেবামূলক কর্মকান্ডে জড়িত থাকেন। 'প্রচলিত উন্নয়ন ধারায় শ্রমমক্তিতে নারীর অংশগ্রহনের স্বীকৃতি নেই যথাযথভাবে, বিভিন্ন পরিসংখ্যান আজ স্পষ্ট করে দিয়েছে নারী কি বিপুল পরিমান শ্রম

---

[১০] নায়লা কবির, "অধস্তনতা এবং সংগ্রাম ঃ বাংলাদেশের নারী," বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ, হাসিনা আহমেদ অনূদিত, পৃষ্ঠা-১০

[১১] শামীমা পারভীন, "নারীর ক্ষমতায়ন," উন্নয়ন পদক্ষেপ, ষ্টেপ টু ওয়ার্ডস, চতুর্থ বর্ষ চতুর্দশ সংখ্যা, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত করছে বিশ্ব শ্রমশক্তিতে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারীরা আজ মোট শ্রমশক্তির ৪৮ ভাগ এবং জাতীয় আয়ে প্রায় ৩০ ভাগ অবদান নারীদের। যদিও প্রচলিত জাতীয় আয় (GDP) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষদের উৎপাদনশীলতার যেখানে প্রায় ৯৮% হিসাবে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদশীলতার মাত্র ৪৭% গণনা করা হয়। এছাড়া ও নারীদের গৃহস্থালী কাজকে (Unpaid labour) অর্থনৈতিক কাজ (Market work) হিসেবে ধরা হয় না।

তাই বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীদের এই অদৃশ্য অবদান (Invisible contribution) স্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার অপরিমাপযোগ্য থেকে যায়। অন্যদিকে নারী পুরুষের চেয়ে প্রায় ১৫ গুণ বেশী গৃহস্থালী কাজের বোঝা বহণ করে। নারী পৃথিবীর মোট কাজের তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পাদন করে কিন্তু মোট আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ নারী পায়। গোটা পৃথিবীর দরিদ্র মানুষের ৭০ ভাগ নারী এবং নারী বিশ্বের মোট সম্পত্তিরমাত্র ১ ভাগের মালিক।[১২] অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্বিক- এই সব বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্যের কারণে নারী উন্নয়নের মূলধারা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তাদেরকে ক্রমাগত অর্থনৈতিক অসাম্যের স্বীকার হতে হচ্ছে। তাদেরকে প্রতিনিয়ত স্বল্প মজুরীর কাজের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে দিনরাত পরিশ্রম করেও কর্তৃত্বের একেবারে নীচের সারিতে অবস্থান করছে। নারীদের এখন সাংসারিক এবং অর্থনৈতিক এই দ্বি-বিধ কাজের বোঝা বহণ করতে হচ্ছে। এই বৈষম্যের কারণে যথেষ্ট দক্ষতা থাকা সত্যেও পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, কোথাও সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেনা।

[১২] উন্নয়ন ও জেন্ডার বৈষম্য, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সপ্তম সংখ্যা ১৯৯৭, পৃ.১৯।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ বাংলাদেশ নারী উন্নয়নের প্রবণতা বা ধারা এবং তার প্রয়োগ ঃ

২.৩.১ নারী উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগঃ

স্বাধীনতা পর থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি তার অভ্যন্তরীন উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রে মহিলা বিষয়ক যে সব নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রবণতা বা ধারা গুলো পর্যায়ক্রমিক ভাবে নীচে পেশ করা হচ্ছে ঃ

১. স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ স্বীকৃত হবার চেষ্টা বীরাঙ্গনা মেয়েদের এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ মেয়েদের পুনর্বাসনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীর ধরন ছিল সমাজ কল্যাণ ও পুনর্বাসনের।

২. প্রথম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) মহিলাদের বিষয়ে কেবল সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচী নেয়া হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সময় কালেই দুটি আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটে যায়। একটি হচ্ছে বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলন (বুখারেষ্ট, ১৯৭৪) এবং বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৪৭৫) যা নারী দশকের জন্ম দেয়া এই দুটি ক্ষেত্রেই উন্নয়নে নারীর অংশ গ্রহণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আসে। জনসংখ্যা সম্মেলননে তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী সফল করে তোলার জন্য মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর জোর দেয়া হয়। এই জোর দেবার যুক্তি হচ্ছে মহিলাদের অর্থনৈতিক মুক্তি এলে তারা সন্তান সংখ্যা নির্ধারনের ক্ষমতা অর্জন করবে। অর্থাৎ সন্তান সংখ্যা সীমিত করার লক্ষ্যে মহিলাদের অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিতে হবে। বি আর ডি বি (মহিলা কর্মসূচী), মাদার্স ক্লাব এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এই নীতির ফসল। অন্যদিকে নারীবর্বের দাবীতে মহিলাদের শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। আন্তর্জাতিক ভাবে মহিলাদের দাবিতে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চাপে বাংলাদেশে ও মহিলা কর্মসূচী আরম্ভ হয়।[১৩]

১৯৭৬ সালে সরকারীভাবে প্রথম মহিলা বিষয়ক বিভাগ (Women's affairs Division) সৃষ্টি করা হয়। উন্নয়নে মেয়েদের অংশ গ্রহণ সর্বপ্রথম এই বিভাগের মাধ্যমে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু এ স্বীকৃতি নারী উন্নয়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট

---

[১৩] উবিনীগের মূল প্রবন্ধ, নারী উন্নয়নের দর্শন ও ধারা, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ধারণাজাত নয়। যখন আমরা দেখি যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে যে ৫টি মাত্র স্কীম গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে অধিকাংশই নেহায়েৎ সমাজকল্যাণ মূলক তখনই এর প্রমাণ মেলে। তবে এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হচ্ছে ১৯৭৮ সালে প্রথম সম্পূর্ণ আলাদা মহিলা মন্ত্রণালয় সৃষ্টি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত স্কীমগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় (Two Year Approach Plan 1978-80) আরও অর্থ বরাদ্দ করে স্কীমগুলো চালিয়ে নেয়া হয়।

৩. দ্বিতীয় পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) প্রণীত হয় নারী সংক্রান্ত ভিন্নতর এবং কিছুটা ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এ পরিকল্পনার প্রধান যেসব উদ্দেশ্য ছিল তা হচ্ছে-

ক) নারীর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ) অর্থকরী কাজ নেওয়ার জন্যে ঋণের এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গ) নারী এবং শিশুর জন্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করা [১৪]

বহু বিভাগীয় কায়দায় এই সময় কর্মসূচী গুলোকে প্রনয়ন করা হয়। মহিলা মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয় সমূহের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে এর সুফল লাভের চেষ্ট করা হয়। এই পরিকল্পনার সময়কালে মহিলাদের কৃষিক্ষেত্রে, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সময়কালে মধ্যে ১৯৮২ সালে মহিলা মন্ত্রণালয়কে সমাজ কল্যাণের সাথে একত্রীকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে এর দায়িত্ব।

৪. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮৬-৯০) উদ্দেশ্য আরও একটু ব্যাপক। এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

ক) অর্থকরী কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান অসম সম্পর্ক দূর করা।

খ) শিক্ষা এবং দক্ষতা অর্জনে মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করা।

---

[১৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

গ) নারীর স্ব-নিয়োজিত কর্মসংস্থানের জন্যে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঘ) কর্মজীবি মহিলাদের জন্যে হোস্টেল এবং তাদের বাচ্চাদের জন্যে ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করা।

ঙ) বিভিন্ন পর্যায়ে মেয়েদের নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থা করা।

চ) শিশুদের জন্যে নৈতিক,শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

ছ) সামাজিক ভাবে উপেক্ষিত এবং প্রতিবন্ধী মহিলাদের পুনর্বাসন করা।[১৫]

এই এক দশক সময়কালে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবার ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে মেয়েদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগদানের ফলে সৃষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে মর্মবস্তুর দিক থেকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনারই পুর্ণমুদ্রন এই তৃতীয় পরিকল্পনা। তবে এই পরিকল্পনার একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে নারী উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নের দিক নির্দেশনা এবং সমন্বয়ের জন্যে বেসরকারী কর্মসূচীকে উৎসাহ প্রদান। এ সকল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে ধীর গতিতে হলেও আমাদের মধ্যে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছে এবং গত তিন দশকে এদেশের নারী সমাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে এবং প্রতিনিয়ত উন্নয়ন হচ্ছে এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতিপয় বেসরকারী উদ্যোগ এবং তাদের ব্যাপক গণসংযোগ এক্ষেত্রে প্রনিধান যোগ্য।

২.৩.২ নারী উন্নয়নের বেসরকারী উদ্যোগ ঃ

স্বাধীনতা উত্তর দেশ গঠনের উদ্দেশ্যে নারী উন্নয়নের দিকে সরকারী ভাবে নানা রকম উদ্যোগের পাশাপাশি ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে এক্ষেত্রে বেসরকারীভাবে ও বিভিন্ন রকমের কর্মসূচী গড়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সাথে সাথে এ সংগঠন গুলি প্রচার প্রচারণা ও জনসচেতনতা মূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে থাকে। এ ক্ষেত্রে শুধু মাত্র মহিলা কর্মসূচী কিংবা সাধারণ উন্নয়নমূলক সংগঠনে মহিলা কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক এবং গ্রামভিত্তিক কর্মকান্ড আরম্ভ হয়। বেসরকারী পর্যায়ে মহিলা কর্মসূচীর মধ্যে যে সব প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছেঃ-

[১৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১. নারীদের সচেতন করা এবং সংগঠিত করা। গ্রামীন দরিদ্র মহিলাদের দল গঠন করে সচেতনতামূলক কর্মসূচী নেয়া।

২. সমবায় পদ্ধতিতে মহিলাদের সংগঠিত করে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা এবং কিছু অর্থকারী কাজ হাতে নেয়া।

৩. হস্তশিল্পে মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে পাটের কাজও সূচীকাজ এবং শহরমুখী এবং রপ্তানীমুখী বাজারে বিক্রয় যোগ্য পণ্য উৎপাদন করা।

৪. অর্থকারী কাজ ও পরিবার পরিকল্পনা, অথবা পরিবার পরিকল্পনা ও অর্থকারী কাজ একত্র করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিতরনের নিশ্চিত ব্যবস্থা নেয়া।

৫. স্ব-কর্মসংস্থানের জন্যে ঋণ প্রদাণ করা এবং দরিদ্র মহিলাদের সল্পসুদে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ দেয়া।

৬. চিরাচরিত ভাবে মেয়েরা যে সব কাজ করতে পারে না বলে ধরে নেওয়া হয় তা ভেঙ্গে দিয়ে কিংবা নারী পুরুষ শ্রম বিভাগ ভেঙ্গে দিয়ে সাধারণ কাজে মেয়েদের নিয়োগ করা।

৭. দুঃস্থদের জন্য রিলিফ মনোভাব পরিবর্তনের জন্যে রিলিফের গম দিয়ে রাস্তা বানাবার কাজ করানো।

নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসব পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয় ভূমিকা পালন করলেও আমাদের তৃপ্তির ঢেকুর তোলার কোন অবকাশ নাই। এ পর্যন্ত সরকারী কিংবা বেসরকারী পর্যায়ে নারীকে এতোভাবে এগিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা থাকলেও সাধারণ উন্নয়ন কমকান্ড থেকে তারা এখনও আলাদা রয়ে গেছে। উদাহরণ হিসাবে কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনায়, কিংবা শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনায় আজও নারীর কোন স্থান নেই। যদিও আমরা আওয়ামী সরকারের আমলে, দুইজন মহিলাকে কৃষি এবং বনও পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী দায়িত্ব পালন করতে দেখেছি কিন্তু তাদের মন্ত্রীত্ব কৃষি বা জমির উপর নারীর অধিকারকে কতটা অগ্রসর করেছে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন রয়ে গেছে। অথচ নারী যে কৃষি এবং শিল্প উভয়ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে তা স্বীকৃত। কিন্তু তবুও নারীর উন্নয়ন এসব পরিকল্পনার সাথে সমন্বিত করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

"তাছাড়া, ভূমিকাসংস্কার নীতি কিংবা মজুরী নীতিতে নারী আপনা আপনি, কোন এক অজ্ঞাত কারণে বাদ পড়ে যায়। ভূমিহীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে না নারীর ভূমি নেই কেন? ভূমিহীন নারী হয় কিনা? খাস জমি বিতরনের ক্ষেত্রে নারীর ভূমি পাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। অর্থাৎ, নারীকে উৎপাদনমুখী করার প্রয়াস আছে, তার আয়ের সংস্থানের চিন্তা আছে, কিন্তু সম্পদের অধিকারী করার চেষ্টা নেই।"[১৬]

২.৪ নারী উন্নয়ন গবেষণার ধারা

সরকারী এবং বেসরকারী কর্মকান্ডে ও আগ্রহের সাথে নারী বিষয়ক গবেষণা ও করা হয়েছে প্রচুর। ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে নারী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এবং বেগবান হয়। এর কারণ

প্রথমতঃ নারী উন্নয়নের জন্যে কি করা উচিত কোন পথে এগুনো উচিত তা নির্ধারণ করা দরকার।

দ্বিতীয়ত ঃ নারী উন্নয়নের যে ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে তা প্রয়োগ করার জন্যে যৌক্তিকতা স্থাপণ করতে হয়। অতএব গবেষণার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে যে গবেবনা শুরু হয় তার অধিকাংশই ছিল বিদেশী বিশেষজ্ঞদের হাতে। বিদেশ থেকে গবেষকরা এসে বলে দিতেন যে, এদেশের মেয়েরা পর্দায় অন্তরীণ থাকার কারণে অনুন্নত। তাদের বেপর্দা করতে হবে। মুসলিম প্রধান সমাজে এ ধরণের যুক্তি বেশ টিকে গিয়েছিল। কিন্তু উন্নয়নের সামান্য সুযোগ নারীরা যেখানেই পেয়েছেন সেখানেই দেখাতে পেরেছেন পর্দার যুক্তি সত্যি নয়। প্রকৃত সত্যি হচ্ছে, উন্নয়নে নারীর সুযোগ সুবিধার অভাব। আর সে কারণেই তারা পিছিয়ে রয়েছে।

নারী বিষয়ক গবেষণা করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেরিয়ে এসেছে যে 'নারীরা প্রায় প্রতিটি কাজে জড়িত আছে' তারা 'দিনে ১৪ ঘন্টা কাজ করে'। কৃষি কাজের প্রধান অংশ ফসল তোলার ব্যাপারটি নারীর অবদান; পশুপালন, হাঁস মুরগী পালনে নারীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মৎস চাষ, জাল বোনা, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, পোষাক কারখানা, রাস্তা মেরামত সবক্ষেত্রেই নারীর ভূমিকা রয়েছে। " এসব জেনে অনেকেই যেন হঠাৎ ঘুম থেকে

---

[১৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ওঠেন এবং অবাক হয়ে বলেন নারীও কাজ করে। গবেষণা গুলোকে প্রাথমিকভাবে এ কথাই প্রমান করতে ব্যস্ত থাকতে হয়।"[১৭]

দ্বিতীয় ঃ নারী কোন কোন দিকে বিশেষভাবে পিছিয়ে রয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলার জন্য গবেষণা করা হয়েছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এক অলিখিত সীমারেখা টেনে দিয়ে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। সামগ্রিক ভাবে নারী উন্নয়ন, নারী ও পুরুষের সমতার বিষয় গুলো গবেষণার বিষয় হিসেবে এখনও আসেনি।

তৃতীয়ত ঃ গবেষকদের মধ্যে নারী উন্নয়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা বিরাজ করবার কথা নয়। কারণ এই ধারণা গড়ে তোলার দার্শনিক বা তাত্ত্বিক তাগিদটা একেবারেই অনুপস্থিত। গবেষণার বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়েছে অধিকাংশক্ষেত্রে হুজুগে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে নারী উন্নয়নের সমস্যাকে চিহ্নিত করার পরিবর্তে এক একটা সময়ের এক একটা বিষয় প্রধান্যে এসেছে সে বিষয়টি নিয়ে তাতে থাকবার অছিলায়। অছিলাগুলো এসেছে দাতা দেশগুলোর দরকারে, ওদেরই স্বার্থে। তখন পর্যন্ত এর অন্যথা খুব একটা পরিলক্ষিত হয়নি (১৯৭৪-৭৫ থেকে ৮৬ পর্যন্ত)।

চতুর্থতঃ গবেষণাগুলোর অধিকাংশই তথ্যসংগ্রহমূলক। তথ্য সংগ্রহের গুরুত্ব আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার পেছনকার উদ্দেশ্য যদি স্পষ্ট না হয় তবে বিপদের কথা। অর্থাৎ উন্নয়ন কি সে ব্যাপারে আমাদের মাথাব্যাথা নেই অথচ নারী উন্নয়নের নামে আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি। .... এটা সন্দেহজনক। এসকল তথ্য দাতাদেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এবং হচ্ছে। আমরা যতই সরল বিশ্বাসে এসব গবেষণা করিনা কেন এসব তথ্যসংগ্রহমূলক গবেষণা দাতাদেশগুলোর স্বার্থকেই শুধু রক্ষা করে। এ থেকে বেরুবার উপায় আসলে শুরু থেকে শুরু করা। গোড়ার দিকে তাকানো। উন্নয়ন দর্শনের মূল ভিত্তিকে প্রশ্ন ও বিতর্কের সম্মুখীন করা। অথচ আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন যে ভাবেই হোক একটা ধারণা গেঁড়ে বসেছে যে উন্নয়নের নতুন তত্ত্ব আমরা বুঝি বা হাজির করতে পারবনা। দীর্ঘ বছরের ঔপনিবেশিক গোলামী আমাদের মাথা থেকে এখনও যায়নি। অতএব অর্থের জোগানটা যেমন বিদেশ

[১৭] পূর্বোক্ত, মূল প্রবন্ধ, পৃঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে আসে বুদ্ধির বা পরিকল্পনার আমদানিটাও হয় বিদেশ থেকে। বিদেশী ছাড়া আমরা একপাও নড়িনা।[১৮]

অথচ এটা মোটেই দরকারী কিছু নয়। এ ধরনের একটা যুক্তি আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে বিদেশীরা যখন অর্থ দেয় তখন ওদের পরামর্শ শুনতেই হয়। এটা যদি সরকারী পর্যায়ের ভাষ্য হয় তবে তর্ক করবার পথ নেই। কিন্তু গবেষকদের বেলায় এ যুক্তি খাটেনা। আমাদের অনেকেই আসলে নিজের দেশের দিকে তাকিয়ে গবেষণায় রত হয় না। অন্যের জন্যে ভাড়া কাজ করবার মনোবৃত্তি এখনও আমাদের অনেকের কাজ করে। আমরা প্রশ্ন তুলি নি। প্রশ্ন করতে শিখিনি।

এখন কর্তব্য হচ্ছে সেটাই তোলা এবং তুলতে শেখা। প্রাথমিক ভাবে এটাই আপাতত অর্জন করা দরকার।

দেশীয় সংস্কৃতি, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটেই আমাদের আমাদের নিজেদের জন্য টেকসই উন্নয়ন কৌশল আমাদের নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে। আমাদের দেশের গ্রামীন ব্যাংকই তা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। গ্রামীন ব্যংক বিশ্বের সমস্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধারণার বিপরীতে নিজস্ব ধারায় যে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা চালু করেছে তা আজ গোটা বিশ্বের কাছে একটি অনুকরনীয় মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এবং গ্রামীন ব্যাংকের নারীরাই তাই অর্জন করতে পেরেছে নোবেল শান্তি পুরস্কার।

তাই এ কথা জোর দিয়েই বলা যায় যে প্রচলিত উন্নয়ন দর্শনের সঙ্গে একটা রফা করার সময় এসে গেছে। নারী মুক্তির জটিল প্রশ্নের উত্তর ও উন্নয়নের ধারা পরিবর্তনের পথ আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে। তার অর্থ এই নয় যে উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাইরে এসে দর্শন নিয়ে বাদানুবাদ করে কাটাতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে এ ব্যাপারটা এতদিন উপেক্ষিত হয়ে থেকেছে। অনেকের এমন ও ধারণা থাকতে পারে যে তত্ত্বের আসলে দরকার নেই। এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থানটা হওয়া উচিত এই উপেক্ষা ও তত্ত্বহীন উন্নয়নের বিপক্ষে।

---

[১৮] পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২.৫. উন্নয়ন ভাবনায় নারী ও জেন্ডার ফ্রেম ওয়ার্ক ঃ

বিবেকবান মানব সত্ত্বা সর্বদাই মানবিক মূলবোধকে প্রধান্য দেয়। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন অবস্থানের নারীর অনগ্রসরতার বিভিন্ন কারণ তাঁদের বিবেককে নারীর পক্ষে জাগ্রত করেছে। সেই আড়াই হাজার বছর পূর্বেও তাই প্লেটো নারীকে বিচার করেছেন তার প্রজ্ঞার নিরিখে। তিনি আদর্শ রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণীতে তাই নারী পুরুষ নির্বিশেষে জ্ঞানী গুণি ও প্রজ্ঞাবানের অর্ন্তভূক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এরপর বহু বছর পেরিয়ে গেছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়া বিভিন্ন সময়ের চাহিদাকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। এরই কল্যাণে আজ আমাদের সামনে একটি আধুনিক উন্নয়ন কাঠামো মূর্ত হয়ে উঠেছে যেখানে নারীর অবস্থান নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখনি নারী উন্নয়ন মতাদর্শের পক্ষে এক সোচ্চার কণ্ঠস্বর রূপে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপিত হয়েছে।

জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর Subjection of Women গ্রন্থে নারীর অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন যেভাবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

'পরিবারে পুরুষ একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব' নারী তার অধীন। এই ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার মধ্যে একটি অহংবোধ আছে। আর এই অহংবোধ থেকেই জন্ম নেয় ব্যক্তিগত ও নিজ পছন্দ সই স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা। আর এই প্রবণতা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং সমগ্র পুরুষ শ্রেণী এই গতানুগতিক অভ্যাসের অনুশীলন করে। তাদের এই ক্ষমতা কোথায় ব্যবহার করে তা লক্ষনীয়। তাদের এই ক্ষমতা যখন প্রয়োগ করে তখন শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম নির্বেশেষে প্রত্যেক একজন উচ্চ বংশীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তির ন্যায়ই ক্ষমতার দাপট দেখায়। আর এই দাপট গিয়ে পড়ে তারই অতি কাছের ব্যক্তির ওপর যিনি তার জীবনের সাথে জড়িত, যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক; যাকে বাদ দিলে তাদের জীবন অসাড় হয়ে পড়ে সেই স্ত্রী নামক জীবটির ওপর। শুধু যে ক্ষমতার দাপট দিয়ে তাকে দাসত্বের শৃঙ্খল বেঁধে রাখে তা নয়। এই দাসত্বের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে মাথা তুলে দাঁড়াতে অনুমোদন দেয়া হয়না। যদিও বা কখনও কোন প্রতিবাদ প্রত্যক্ষ করে তখন তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে কঠোরভাবে প্রতিহত করে। সহ্য করে না। নারীর অযোগ্যতাই তাদের কাছে গ্রহণ যোগ্য।[১৯]

---

[19] John S. Mill, Subjection of women

Dhaka University Institutional Repository

এ ক্ষেত্রে মিলের মতামতের একটি জলন্ত প্রমান আমাদের দেশে প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য 'যত বিদ্যা বাড়ে, তত লক্ষী ছাড়ে'। নারীকে পুরুষ সর্বদা তথাকথিত লক্ষী অর্থাৎ শান্ত, শিষ্ট, অবুঝ, বুদ্ধি-বিদ্যাহীন, সর্বংসহা ধারিত্রীর মত দেখতে পছন্দ করে। এটা দেশ কাল পাত্র ভেদে সর্বযুগে সর্বত্র প্রতীয়মান হয়েছে।

সমাজে বিরাজমান নারীর এই পশ্চাৎপদ অবস্থানের জন্য মিল যেমন সোচ্চার ছিলেন, তেমনি পরবর্তীতে বিভিন্ন মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক তথা নারীবাদীরা এগিয়ে এসেছেন। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীরা অর্ন্তভূক্তি এবং কাজের স্বীকৃতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তথা নতুন নতুন মতবাদ। মতবাদ বিশ্লেষণের আগে আমাদের কাছে জেন্ডার ধারণাটি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

জেন্ডারঃ ইংরেজি শব্দ 'জেন্ডার' বাংলা ব্যাকরণের লিঙ্গ হিসাবে পরিচিত। কিন্তু উন্নয়ন প্রসঙ্গে আধুনিক বিশ্বে জেন্ডার শব্দটি একেবারে ভিন্ন এক মাত্রা অর্জন করেছে- যা কিনা ঠিক আভিধানিক অর্থে- প্রকাশমান নয়। ইংরেজীতে জেন্ডার শব্দের অর্থে (অভিধানে) লিখেছে Classification of things with regard to sexes or sex lessness, natural and grammatical. কিন্তু উন্নয়ন প্রসঙ্গে এসব অর্থের বদলে 'নারী পুরুষের সম্পর্ক' অর্থে জেন্ডার শব্দের ব্যবহার হচ্ছে। জেন্ডার ধারণার সংজ্ঞায়নে বলা হয়

Gender has been defined as the different roles, responsibilities and expectations of women and men in societies and cultures, which effect their ability and their incentive to participate in development projects and lead to different project impact for women and men.[20]

এই সংজ্ঞার বিচারে বলা যায় যে, জেন্ডার বলতে নারী পুরুষকে না বুঝিয়ে বোঝাচ্ছে সামাজিক পরিমন্ডলে উভয়ের আন্তঃসম্পর্ক কী তাকে।

---

[20] European Commission: 1993.

Dhaka University Institutional Repository

২.৫.১নারী উন্নয়ন মতবাদ

বৈষম্য হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের একটি প্রকটতর এবং ক্রমবর্ধমান সমস্যা। ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, শিক্ষা ইত্যাদি কারণে বৈষম্যের বিষয়টি বহুদিনের পুরানো। নারীর অধিকার রক্ষায় ও অনগ্রসর নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমকালীন বিশ্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। মানব জন্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনের, সমাজের তথা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের প্রায় প্রতিটি পর্যায়েই নারীর অবদান এ পৃথিবীকে করেছে মহিয়ান। কিন্তু নারীর এই অবদানকে চেতনে কিংবা অবচেতনে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে নানারূপে নানা কৌশলে। শুধু এড়িয়ে যাওয়া বললে ভুল হবে সোজা ভাবে বললে অস্বীকার করা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ফলে দেখা গেছে উন্নয়ন বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ খুবই হতাশা ব্যঞ্জক। উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গৃহীত বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি কখনোই। 'ষাট দশকের শেষার্ধে যখন এটি আবিস্কৃত হয় যে আধুনিককায়ন তত্ত্ব নির্ভর তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অনেকাংশই নারীদের অংশগ্রহণকে শুধু যে নিশ্চিত করতে পারেনি তা নয় বরং তাদের স্বার্থের পরিপন্থীও তখন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিতর্কে নারীদের প্রবেশ ঘটে।[২১]

এর ফলশ্রুতিতে নারী উন্নয়ন স্কুল Women In Development (WID) জন্মলাভ করে। ১৯৭০ সালে এষ্টার বসরাপের Women's Role in Economic Development গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় যেখানে আমরা নারী উন্নয়ন মতবাদ নিয়ে নানা রকম বিশ্লেষণ দেখতে পাই। তাঁর এই বই এর প্রকাশ এবং ১৯৭৫-এ জাতিসংঘের নারী দশকে উদ্বোধন হচ্ছে উন্নয়নে নারী স্কুলের বিবর্তনের শীর্ষবিন্দু। জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশ্বব্যাংক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (AID) বেসরকারী সংস্থা, নারী গবেষক এবং এমনকি তৃতীয় বিশ্বে নারী শ্রমিক অন্বেষণরত বহুজাতিক সংস্থা বর্তমানে এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত।[২২]

---

[21] Easter Boserup, Women's Role in Economic Development, London, 1970.

[২২] অশোকা বন্দরনায়েক, "উন্নয়নে নারীঃ উদারনীতিবাদ, মার্ক্সবাদ এবং মার্ক্সবাদী-নারীবাদ", মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম সম্পাদিত- নারীঃ রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ, (সমাজ নিরীক্ষণ সংখ্যা-২২-এ প্রকাশিত) পৃঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান পুজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উন্নয়নে নারী স্কুল, বিশেষ করে বিশ্ব অর্থনীতিতে নারীদের স্বতন্ত্র ভূমিকা বর্ণনা করে ও পুরুষ দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে থাকে। পাশ্চাত্য ও তৃতীয় বিশ্বে দীর্ঘদিনের পুরুষ দৃষ্টি ভঙ্গির ফলে উপেক্ষিত নারীর গার্হস্থ্য শ্রমের অদৃশ্যমানতা পরিহার করে নারীদের সকল ধরনের গার্হস্থ্য ও বেতনহীন শ্রমকে রাষ্ট্রীয় খাতে অন্তর্ভূক্ত করে তারা 'কাজের' সংজ্ঞা এবং অর্থের বিস্তৃতি সাধন করেছেন। 'গার্হস্থ্য কাজের জন্য বেতনের' শ্লোগান নারীদের কাজ সমন্ধে চেতনা অনেকটাই বাড়িয়েছে। এক দশকের ভেতরে 'উন্নয়ন স্কুলে নারী'র (উনা) ক্ষেত্রে বসরাপ এবং তাঁর অনুসারীরা তৃতীয় বিশ্বে নারীর অর্থনৈতিক অবদান এবং অবস্থা সমন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও শ্রমশক্তিতে নারীর অবদান বিষয়ে গবেষণা করে। তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি যে, নারী বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ আফ্রিকা এবং এশিয়ার নারীরা কৃষি শ্রমিকের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ এবং লাটিন আমেরিকার ক্ষেত্রে ৪০ ভাগের ও বেশী।[২৩] এখন দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। প্রায় এক তৃতীয়াংশের ও বেশী এ ধরনের পরিবারগুলো মূলত জীবনধারণের জন্য নারীদের উৎপাদশীল ভূমিকার উপর নির্ভরনীল। উনা লেখকগণ তৃতীয় তথা উন্নত বিশ্বের নারী উন্নয়ন গবেষণায় গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট। তাদের প্রণীত নারীদের কাজের ওপর ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতাশ্রয়ী পর্যালোচনাগুলি তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিতে নারীদের অন্যতম ও কখনো কখনো কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের বিষয়টিকে জোরালোভাবে তুলে ধরে। উনা লেখকগণ দেখান যে নারীদের কাজ যেমন তৃতীয় বিশ্বে তেমনি পাশ্চাত্য ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদনের সবচেয়ে কম মূল্যবান ও কম বেতনভুক্ত খাতে আবদ্ধ। তৃতীয় বিশ্বে নারীরা গার্হস্থ্য এবং তথাকথিত অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সবচেয়ে বেশী জড়িত। তার ফলে তাদের অধিকাংশ কাজ গণনা করা হয় না অথবা জাতীয় আয় ও উৎপাদনের হিসাব থেকে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ভাবে বাদ দেওয়া হয়। ফলশ্রুতিতে নারীদের কাজের অদৃশ্যমানতা ও পরিবারের প্রধান যে পুরুষ এই বিশ্বাসের সার্বজনীনতা তৈরী হয় এবং নারীরা অধিকতর দারিদ্র ও ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়। পাশ্চত্য উন্নয়ন মডেলের সুবিধা শুধুমাত্র পুরুষদের ভাগে পড়েছে, উনা চিন্তাবিদরা তা আমাদের দেখিয়েছেন। শিল্পায়নের ফলে বনভূমি ধ্বংস হয়েছে, পরিবেশের বিপর্যয় হয়েছে,

[23] UN (1979); New Internationalist (two parts) esp. part 2. p. 11.

কলকারখানায় কিংবা নিজ এলাকা ছেড়ে দূরে পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, কিন্তু নদী ও জলাশয় ভরাটের কারণে নারীকে জল আনতে আরো দূরের পথে হেটে যেতে হয়েছে। এভাবে আধুনিকতা নারীর ঐতিহ্যগত কাজকেও আরো কষ্টসাধ্য করে দিয়েছে। পুরুষ পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল পরিবেশে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে, তাদের মজুরীও বেড়েছে। কিন্তু নারী আরও কষ্টকর পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে-আরও কম উৎপাদনশীল ও অনুর্বর জমিতে চাষাবাদ করতে হচ্ছে। আবার কখনো একই কাজ করেও তারা মজুরী বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছে।

ইষ্টার বসরাপ ও অন্যান্যরা দেখিয়েছেন যে তৃতীয় বিশ্বে নারীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দু'ভাবেই প্রান্তিকতায় পৌছেছেন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার সূত্রপাত থেকেই নতুন ব্যক্তিক সম্পত্তি অধিকার, বেতন, শ্রম, কৃৎকৌশল, ঋন এবং শিক্ষা (বিভিন্ন মতবাদ আর তত্ত্বের ভিত্তিতে বাস্তবতার নামে) পুরুষদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। সে কারণে অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক খাতে অধিকতর অর্থকরী এবং সম্মানবহ কাজে পুরুষদের প্রবেশাধিকার ঘটেছে, এবং নারীরা কম উৎপাদনশীল ও কম বেতনের কাজে সরে গেছে। উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ কৃত অর্থ নারী পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে নিজের আয়ত্বে রাখতে পারছে না। কারণ যেহেতু নারীর সম্পদ কম, শিক্ষা কম, অভিজ্ঞা কম কিংবা দক্ষতা কম-ফলে প্রতিযোগিতা করার শক্তি পুরুষের চেয়ে নারীর অনেক কম। সম্পত্তি, দক্ষতা, পুঁজি কিংবা শিক্ষা না থাকার দরুন নারীরা স্বল্প মজুরীর ও কম উৎপাদনশীল কাজে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। একইভারে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক নারীবাদীর বিশেষ করে বেটি ফ্রিডান যুক্তি দেখান যে গার্হস্থ্য এবং রাষ্ট্রীক পরিসরের বিচ্ছিন্নতা ঘরের মধ্যে নারীর আবদ্ধতা হচ্ছে নারীর আর্থিক প্রান্তিকতা এবং সামাজিক অধস্তনতার উৎস।

উনা স্কুলের মৌল প্রস্তাবনা হচ্ছে অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণে নারীদের বর্তমান অসম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির স্থলে ঐ প্রক্রিয়ায় আরও ভালভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে মুক্তি অর্জন। সেজন্য উনা স্কুলের শ্লোগান হচ্ছে : 'উন্নয়নে নারীদের অন্তরিত কর।' বস্তুতপক্ষে নারীরা কম উৎপাদনশীল এবং অর্থেনৈতিক উৎপাদনের কম বেতনভোগী খাতে প্রান্তিক, কিন্তু এর অর্থ এই নয়, তারা অন্তরিত নয়। উনা পর্যালোচনা সমূহ বারবার দেখিয়েছে যে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারীরা এবং সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলির ক্ষেত্রে নারীরা

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রিক। অন্য কথায় তারা ইতোমধ্যেই সর্বত্র বিদ্যমান অর্থনৈতিক কাঠামাতে ভালভাবে অন্তরিত, যদিও নীচের পর্যায়ে।[২৪]

যদিও পাশ্চাত্যে উদারনৈতিক নারীবাদের আবির্ভাব ঘটেছে, তৃতীয় বিশ্বে তার সহপক্ষ আছে, বিশেষ করে মধ্য শ্রেণীর পেশাদার নারীদের মধ্যে। 'উনা স্কুলটি তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র নারী বিষয়ক একাডেমিক অন্বেষা এবং পলিসি প্রণয়নের একটি ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই স্কুলটির অবস্থান পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ঐতিহ্যের মধ্যে আধুনিকরণের তত্ত্ব এবং উদারনৈতিক নারীবাদের একটি স্পষ্ট মিশ্রণ হিসাবে এই স্কুলটি ধরে নেয় যে ধনতান্ত্রিক বৈশ্বিক ব্যবস্থার মধ্যে সকল নারীর মুক্তি সম্ভব।

এর জন্য প্রয়োজন সরকারী ও আন্তর্জাতিক ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ,তত্ত্ব প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আইনানুগ পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন, ইতিবাচক কাজ ও মনোভঙ্গি পরিবর্তনের রণকৌশল যেমন স্বাধিকার, প্রশিক্ষণ এবং সিদ্ধির মনোভাব তৈরিকরণ।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সবসময় শোষিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত জনগণের পক্ষে নিবিষ্ট। মার্ক্সবাদীরা সমসময় শ্রেণী বৈষম্যের কারণ চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন যুক্তিবাদীতার নিরিখে। 'এঙ্গেলস থেকে শুরু করে মার্ক্সিষ্টরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে নারীর অধস্তনতার উৎস ব্যক্তিক সম্পত্তি, শ্রেণী বিন্যস্ততা এবং বিনিময় মূল্যের উৎপাদন। সাম্প্রতিক মার্ক্সিষ্টরা দেখান যে নারী নির্যাতণ অবিচ্ছেদ্যভাবে জাতিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শ্রেণী নির্যাতণের সঙ্গে যুক্ত। সেজন্য, অধিকাংশ নারী এবং পুরুষের মুক্তি বিদ্যমান ধনতান্ত্রিক বৈশ্বিক ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব নয়।[২৫]

মার্ক্সিষ্টরা উদারনীতিবাদী উনা পর্যালোচনায় সঙ্গে একমত যে, অর্থনৈতিক আধুনিকরণ, কিংবা নির্দিষ্টভাবে ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন সাধারন তৃতীয় বিশ্বের নারীদের প্রান্তিক করে তুলেছে। তাঁরাও মনে করেন, সবুজ বিপ্লবের সুবিধা সাধারণত পুরুষের পক্ষে গেছে।[২৬] 'দারিদ্রের নারীঅয়ন' তৃতীয় বিশ্বে ধনতন্ত্রের খারাপ দিক। পাশ্চাত্যেও এই ব্যবস্থার

---

[২৪] অশোকা বন্দর বাগে রচিত এবং মেঘনাগুহ ঠাকুরতা ও মিলু শামসুন নাহার অনূদিত, "উদারনীতিবাদ, মার্ক্সবাদ এবং মার্ক্সবাদী নারীবাদ," সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ২২, ১৯৮৬।

[২৫] প্রাগুক্ত।

[২৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চারিত্রিক দিকগুলি পরিস্ফুট হচ্ছে। ধনতন্ত্র কর্তৃক গার্হস্থ্য কর্মের নিমজ্জায়ন (Subsumption) এবং অনু-পরিবারে (Nuclear family) শিথিলতা ক্রমাগত নারীদের স্থায়ী শ্রেণী নিম্নতায় (Underclass) ঠেলে দিচ্ছে। মৌল প্রয়োজন রণকৌশল হচ্ছে যেমন পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণ এবং তৃতীয় বিশ্বের জন্য খাদ্য সাহায্য, এই পরিস্থিতিতে উদারনীতিবাদের জবাব। রক্ষনশীল দাবী ছাড়াও এ সব রনকৌশল এখন প্রয়োজন দরিদ্র নারী এবং তাদের পরিবার সমূহের বেচে থাকবার জন্য, কিন্তু অন্য পক্ষে এ সব রণকৌশল কাঠামোগত পরিবর্তনের বিকল্পে পরিনত হয়ে গিয়েছে। এ কাটামোগ পরিবর্তন দরকার নারী মুক্তি সহ সামাজিক সমতা এবং ন্যায় বিচারের জন্য।

উদারনৈতিক উনা লেখকদের বিপরীতে মার্কিষ্টরা সোচ্ছার যে কৃৎকৌশলগত উদ্ভাবনা থেকে সকল পুরুষেরা উপকৃত হয়নি, তেমনি সকল নারীদের ওপর কৃৎকৌশলগত এবং পরিবর্তনের অন্যান্য দিকে প্রভাব পড়েনি।

মার্কিষ্টরা দেখিয়েছেন যে, উৎপাদকের নতুন কৃৎকৌলশসমূহ পুরুষের হাতে তুলে দেয়ার কলে নারীদের কাজের পরিসর হ্রাস হয়েছে এবং পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমের উৎপাদনশীলতা কমে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের নারীদের ক্ষেত্রে একটি ক্রমবর্ধমান ঘটনা হচ্ছে নারীদের বহুজাতিক সংস্থা কর্তৃক রপ্তানী প্রসেসিং এলাকায় চাকরীতে নিযুক্তি। তৃতীয় বিশ্বের সস্তা নারী শ্রম এবং তাদের পুঙ্খানুপূঙ্খ ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজে স্বাভাবিক নৈপূন্য তাদের এই কাজে সুযোগ দিচ্ছে। নারীরা আজ নির্দিষ্ট ধরণের কাজের সীমিত সুযোগের জন্য প্রতিযোগিতা করছে।[২৭]

২.৫.২ জেন্ডার ফ্রেম ওয়ার্ক ঃ

উন্নয়নে নারী ইস্যু সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে মূলত তিনটি ফ্রেম ওয়ার্ক কাজ করে। হার্ভাড ফ্রেম ওয়ার্ক প্রথম তৈরী হয়, সম্প্রদায়ের ভেতরে কে কি করে, কে কি ভোগ করে, এবং কে কি নিয়ন্ত্রণ করে এই ভিত্তিতে। মোসার পদ্ধতি যেটি পুরুষের দ্বৈত ভূমিকার প্রেক্ষিতে নারীর ত্রয়ী ভূমিকার ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করে এবং লংওয়ে ফ্রেম ওয়ার্ক যেটি নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা দেয়।[২৮]

---

[২৭] প্রাগুক্ত।
[২৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এই তিনটি ফ্রেম ওয়ার্ক একে অপরের সম্পূরক। সবগুলো ফ্রেম ওয়ার্কের সমন্বয়ে নারীর যে তিনটি ভূমিকার কথা এসেছে তা হল ঃ

উৎপাদনমূলক ঃ ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপাদন।

সম্প্রদায়/সামাজিক ব্যবস্থাপনা ঃ সমাজের মঙ্গল ও প্রচারের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।

পুনরুৎপাদনমূলক ঃ পরিবার/খানার দেখাশুনা (শিশুপালন ও শিশুলালন সহ)

অধিকাংশ সংগঠন এই তিনটি ফ্রেম ওয়ার্কের যে কোন একটি ব্যবহারের পরিবর্তে বরং উপরোক্ত তিনটি ফ্রেম ওয়ার্কের মূল ধারণা সমন্বয় সাধন করে কাজ করে।[২৯]

তবে এক্ষেত্রে ক্যারোলিন মোসার প্রণীত ফ্রেম ওয়ার্কটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিভিন্ন দশকে প্রণীত উন্নয়নের বিভিন্ন ধারা সমূহের বিশ্লেষণের আলোকে নিজেস্ব ধারণার প্রকাশ ঘটান।

মোসারের জেন্ডার প্লানিং ফ্রেম ওয়ার্ক ও এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী ধারাসমূহ বিশ্লেষণ ঃ

নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারাসমূহের মধ্যে ক্যারোলিন মোসার প্রণীত ফ্রেম ওয়ার্কটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি লিঙ্গভূমিকা, লিঙ্গ চাহিদা এবং লিঙ্গ ভিত্তিক এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে তাঁর ধারণাকে ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। মোসার মূলত : ৫টি পন্থার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

মোসার পন্থা ১ ঃ লিঙ্গ ভূমিকা/নারীর ত্রয়ী ভূমিকা, যথা ঃ (ক) উৎপাদন মূলক, (খ) পুনরুৎপাদনমূলক ও (গ) সম্প্রদায় ভিত্তিক কাজ।

মোসার পন্থা ২ ঃ লিঙ্গ চাহিদা নিরূপণ যথা ঃ (ক) ব্যবহারিক চাহিদা ও (খ) নীতি সংক্রান্ত চাহিদা।

মোসার পন্থা ৩ ঃ গৃহের অভ্যন্তরে সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা।

মোসার পন্থা ৪ ঃ ত্রয়ী ভূমিকার সমন্বয়করণে পরিকল্পনা।

মোসার পন্থা ৫ ঃ বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত পলিসির পার্থক্য ঃ WID/GAD Policy matrix

মোসার পন্থা ৬ ঃ পরিকল্পনায় নারী ও লিঙ্গ সচেতন সংস্থা পরিকল্পনাবিদের অর্ন্তভূক্তকরণ।

---

[২৯] Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও উন্নয়ন বিষয়ে মোসার নীতি এপ্রোচকে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন মূলত এভাবেঃ

গত দুই দশকে তৃতীয় বিশ্বের স্বল্প আয়ের নারীদের বিষয়ে ম্যাক্রো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি ছিল। পাঁচটি ভিন্ন পলিসি এপ্রোচকে তিনি চিহ্নিত করেছেন যার প্রত্যেকটি নারীর ব্যবহারিক ও কৌশলগত চাহিদা পূরণের প্রেক্ষিতে ফোকাস করেছে।

কল্যাণ ঃ ১৯৫০-৭০ এ সর্ব প্রথম এপ্রোচ। এর উদ্দেশ্য ছিল ভালো মা হিসেবে নারীদের উন্নয়নে অর্ন্তভূক্তকরণ। এখানে নারীকে উন্নয়নের পরোক্ষ ফলভোগী হিসেবে দেখা হয়েছে। এখানে নারীদের পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকায় স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এটি চ্যালেঞ্জ করে না এবং এখনো জনপ্রিয়।

সমতা ঃ ১৯৭৬-৮৫ নারী দশকে ব্যবহৃত প্রকৃত WID এপ্রোচ। এটি নারীদের জন্য সমতা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে। এখানে নারীকে উন্নয়নের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে দেখা হয়। এখানে নারীর ত্রয়ী ভূমিকার স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্রে সরাসরি রাষ্ট্রীক হস্তক্ষেপ এবং পুরুষের তুলনায় বৈষম্য কমানোর কথা বলা হয়। এটি নারীর অধস্তন অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে। এটি পাশ্চাত্যে নারীবাদ বলে সমালোচিত হয়েছে। এটিকে হুমকী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি সরকারগুলোর মধ্যে অ-জনপ্রিয়।

দারিদ্রের বিরোধীতা ঃ ১৯৭০ এর পরবর্তীতে WID এর দ্বিতীয় এপ্রোচ যা সমতা এপ্রোচের কিছুটা নমনীয় রূপ। এর উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র নারীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। এখানে নারীদের দারিদ্রতাকে দেখা হয়েছে অব-উন্নয়নের সমস্যা হিসেবে, অধস্তনতা হিসেবে নয়। এটি নারীর উপাদনশীল ভূমিকার স্বীকৃতি দেয় এবং উপার্জনের মাধ্যমে কৌশলগত চাহিদা পূরণ করতে চায়, বিশেষ করে ক্ষুদ্র পর্যায়ে অর্থ আয়কারী প্রজেক্টের মাধ্যমে। এটি এনজিও গুলোর মধ্যে অধিক জনপ্রিয়।

দক্ষতা ঃ ১৯৮০-এর ঋণ সমস্যা থেকে গৃহীত তৃতীয় এবং বর্তমানে প্রাধান্যপূর্ণ WID এপ্রোচ। এর উদ্দেশ্য হল নারীর অর্থনৈতিক অবদান ও সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নকে আরও অধিক দক্ষ এবং কার্যকর করার বিষয়টি নিশ্চিত করা। এটি নারীর সময়ের দীর্ঘ ব্যবহার ও ত্রয়ী ভূমিকাকে বিশ্বাস করে। এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এপ্রোচ।

ক্ষমতায়ন ঃ তৃতীয় বিশ্বের নারীদের দ্বারা সংকলিত অতি সাম্প্রতিক কালের এপ্রোচ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপক আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়িত করা। নারীর

Dhaka University Institutional Repository

অধস্তনতা শুধু পুরুষ কর্তৃক নিগ্রহের কারণে নয়, বরং উপনিবেশিক ও নব্য উপনিবেশিকতার কারণেও বটে। এটি নারীর ত্রয়ী ভূমিকার স্বীকৃতি দেয়। এটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে সম্ভাবনাময় পশ্চিমা নারীবাদকে এড়িয়ে যাওয়া স্বত্বেও এটি তৃতীয় বিশ্বের নারী এনজিও ছাড়া জনপ্রিয় নয়।[৩০]

এভাবে বিভিন্ন এপ্রোচকে বিশ্লেষণ সাপেক্ষে মোসার নারীর ত্রয়ী ভূমিকা ও পুরুষের দ্বৈত ভূমিকার কথা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। এবং বর্তমান সময়ে উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আলোচনায় সবগুলো ফ্রেম ওয়ার্ক থেকে ধারণা নেয়া হয়।

২.৬ মানব উন্নয়ন সূচক (HDI)

নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণাকে স্বচ্ছতা প্রদাণের জন্য উন্নয়নের লক্ষ্য বা পথ কি বা কোনটা সে সব প্রশ্ন চলে আসে। যার উত্তর এক কথায় হয়না। কারণ-এ সমস্ত প্রশ্নের একাধিক উত্তর রয়েছে। কখনও কখনও এগুলি পরস্পর বিরোধীও হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক কালের অন্যতম আলোচিত দৃষ্টিভঙ্গি হলো রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি। এতে বলা হয়েছে আয় বা পণ্য নয়, দেশের মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং উপার্জণের সুযোগ উন্নয়নের স্তরকে নির্ধারণ করবে। যে দেশে এ সমস্ত সুযোগ যত বেশি, সে দেশকে তত বেশী উন্নত বলা হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ১৯৯০ সাল থেকে ইউনাটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউ.এন.ডি.পি) প্রতি বছর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (সংক্ষেপে ইউ. এন. ডি. পির. এইচ. ডি রিপোর্ট) প্রকাশ করছে। সারাবিশ্বে বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবনযাত্রার অবস্থা বা গুণাগুণ সম্বন্ধে এবং আনুসাঙ্গিক নানা বিষয়ে বহু তথ্য ও মন্তব্য পাওয়া যায় এই রিপোর্টে।

অর্থনীতিবিদগন অতীতে দেশের উন্নয়নের হিসাবের জন্য জাতীয় আয়কে নিতেন। সে হিসাবে আরও আয় মানে আরও শিল্প, আরও বাণিজ্য, আরও চাকরি, আরও বিনিয়োগ। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫ এই দশকে সমস্ত উন্নয়ন তত্ত্বে মূল লক্ষ্য ছিল দ্রুত শিল্পায়ন আর শিল্পের সাহায্যের জন্য পরিকাঠামো (অর্থাৎ আরও বিদ্যুৎ, আরও রাস্তা, আরও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা) সৃষ্টি। কিন্তু বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও একটি বড় সমস্যা। দেখা গেল শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে

[30] Candida March, Ines Smith and Maitrayee Mukhopadhy "A Guide to Gender-Analysis Frameworks", OXFAM, Oxford, 1999 And Caroline O. N, Moser, "Gender Planning and Development: Theory, Practise and Training," Routtedge, 1993.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিফলিত করে না। তাই তুলনার জন্য দেশের জাতীয় আয়ের সঙ্গে এলো মাথাপিছু বা গড় আয়কে নেওয়ার প্রচলন।

কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তণ সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় আয় কিংবা মাথাপিছু আয় সঠিক ধারণা দিতে পারে না। সাধারণ মানুষ জীবনযাপনের মৌলিক রসদ যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা পাচ্ছে কিনা সেটা মাথাপিছু আয় থেকে পাওয়া যায় না। তাই ষাটের দশক থেকে শিল্প তথা আয় ভিত্তিক এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন শুরু হলো। "এশীয় বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল শিল্পের সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষনে ব্যয় বৃদ্ধি করলে দেশের অর্থনীতি দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। এই ব্যয়কে বলা হলো (সামাজিক ক্ষেত্রে) বিনিয়োগ। শুলজ, বেকার প্রমুখ তাত্ত্বিকরা বললেন যে শুধুমাত্র বস্তুগত মূলধন নয়, মানুষের উপর বা অর্থনীতির ভাষায় 'মানবিক মূলধনে' বিনিয়োগ করলে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে। এভাবে মানুষকে নতুন মূলধন ধরে নিয়ে তাকে উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হিসেবে গণ্য করা হলো।"[৩১]

মানুষই নতুন মূলধন ঃ

সেই উন্নয়ন সম্পূর্ণ নয় যদি তা অধিকাংশ মানুষের উন্নতি নিশ্চিত না করে। বিশ্ব শ্রম সংস্থার মতে উন্নয়নের স্বার্থেই মানুষের জন্য ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য আর পরিসেবার ব্যবস্থা করতে হবে। (বিশ্ব শ্রম সংস্থার দলিল আই, এল, ও. ১৯৭৭) ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজনগুলি এভাবে নিশ্চিত হল ঃ ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন হল পর্যাপ্ত খাদ্য, আশ্রয় এবং বস্ত্র, গৃহস্থালির সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র; জনগোষ্ঠির জন্য তাদের সাহায্যে বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃপ্রণালী এবং নিকাশী ব্যবস্থার নির্মাণ, জনপরিবহন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা।

প্রখ্যাত নোবেল বিজয়ী, ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য কুমার সেনের অন্যতম বিখ্যাত রচনা 'কমোডিটিস এন্ড ক্যাপালিটিজ' বা পণ্য ও সক্ষমতা-এর আলোকে বলা যায় যে কোন ও ব্যক্তি কোন পন্যের মালিক বলেই তার জীবন যাত্রার মানকে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করতে পারে না। বরং সে সেই পণ্যকে কতটা ব্যবহার করতে পারছে তার উপরই তার জীবন

[৩১] এম, এ. মান্নান, মানব উন্নয়ন সূচক এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, পঞ্চদশ খন্ড, পৃঃ ১১২, ১৪০৪।

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রার মান নির্ভর করে। যেমন কোন অন্ধ ব্যক্তিকে বই দিলে বা তার হাতে প্রচুর বই থাকলে আপতদৃষ্টিতে তার সম্পদ আছে ঠিকই কিন্তু সেই সম্পদকে ব্যবহার করার সক্ষমতা বা ক্যাপাবিলিটি তার নেই। ঠিক তেমনি ইউএনডিপি এর মানব উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি বলছে পণ্য বা সম্পদ (রিসোর্স) নয়, বরং পণ্যকে ব্যবহার করার ফলে সক্ষমতায় কি পরিবর্তন আসছে (আউটকাম) সেটাই মূখ্য বিচার্য।

অমর্ত্য সেনের মতে পণ্য নয় পণ্যকে ব্যবহারের প্রকৃত সুযোগ আর সক্ষমতার সাধারণ পরিমাপক পেতে হলে আয়ের সঙ্গে প্রত্যাশিত আয়ু, শিশু মৃত্যুর হার, স্বাক্ষরতা এবং উচ্চ শিক্ষার সুযোগকে ধরতে হবে। একই সঙ্গে লিখিত বা তাত্ত্বিক সুযোগ থাকলেও সামাজিক বৈষম্য কি ভাবে সুযোগ ব্যবহারের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে তাও যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখে। এ ভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন মাপার জন্য ইউ এনডিপি এমন আরও কতগুলি বিষয় নিয়েছে যাতে সমস্ত ধরণের দেশের জন্য একই মাপকাঠি ব্যবহার করা যায়। স্বাস্থ্য শিক্ষা আর উপার্জনের সুযোগকে ব্যবহার করার ক্ষমতাকে মাপকাঠি হিসাবে নেয়া হয়েছে ইউ এন ডিপি'র মানব উন্নয়ন সূচক, লিঙ্গভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচক এবং লিঙ্গ সক্ষমতার পরিমাপক হচ্ছে সে ধরণের মাপকাঠি।

'স্বাস্থ্যের সুযোগের জন্য প্রতি হাজারে নবজাতকের মৃত্যুর হার এবং প্রত্যাশিত আয়ু এবং শিক্ষার সুযোগের জন্য পনেরো বছর ও তদুর্ধ বয়স্কদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার এবং বৎসরের হিসেবে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের গড় পরিমাণ বিবেচনা করা হয়। দৈনিক খাদ্যের যোগান, নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ, শিশু মৃত্যুর হার ইত্যাদি অনেক হিসেবই এর মধ্যে জড়িত। সবার উপরে আছে একটা দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাথাপিছু হার বা 'জিডিপি পার ক্যাপিটা'। এই সব হিসেবগুলোর আবার প্রত্যেকটির আপেক্ষিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ওজন কমিয়ে বাড়িয়ে অনেক রকম অঙ্ক কষে ১৭৫টি দেশের প্রতিটির মানব উন্নয়নের সূচক (এইচ ডি আই) নির্ণয় করে গুণ ক্রমানুসারে একটি তালিকায় তাদের বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই তালিকায় বাংলাদেশের স্থান ১৪৪ নম্বরে অর্থাৎ নীচের দিকে।[৩২]

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬.১ লিঙ্গ ভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচকঃ

নারী পুরুষের প্রত্যাশিত আয়ু এবং নারী ও পুরুষ শিশুর মৃত্যুর তুলনা মূলক হার, নারী-পুরুষ স্বাক্ষরতা ও বিভিন্ন স্তরে বিদ্যার্থীর হার এবং নারী পুরুষের মজুরির পার্থক্য এবং অর্থকরী কাজে যোগদানের হার থেকে নারী-পুরুষ বা লিঙ্গ ভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচক নির্মিত হয়েছে। "মানব উন্নয়ন সূচক যে তিনটি বিষয়ে সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে নির্মিত সেই স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উপার্জনের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাপ্তি ভিন্ন রকমের। বহুদেশে মেয়েরা শিক্ষায় পুরুষের প্রায় সমান, স্বাস্থ্যের মধ্যে প্রত্যাশিত আয়ুতে পুরুষের চেয়ে বেশী (একমাত্র ব্যতিক্রম বাংলাদেশ এবং নেপাল)। কিন্তু আয়ের ব্যাপারে মেয়েরা এখনও অনেক পেছনে। এমনকি শিল্পোন্নত দেশে যেখানে মনে করা হয় বৈষম্য অনেক কম, সেখানেও মেয়েরা পুরুষের সমান বা বেশী কাজ করেও পুরুষের তুলনায় অনেক কম আয় হাতে পায়।[৩৩] লিঙ্গ ভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচক রাশিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য দেশগুলো অর্থাৎ অধুনা লুপ্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গুলো নারী সমতার ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে। লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য সূচক এদের অবস্থান মানব উন্নয়ন সূচকের চেয়ে শ্রেয়তর। ১৯৭০ থেকে ১৯৯৪ এই আড়াই দশকের লিঙ্গ ভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচকের মান যথেষ্ট বেড়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক এবং আমাদের জন্য আশার কথা। গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রচার প্রচারণার ফলে জন সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমরা এই ইতিবাচকতার নাগাল পেয়েছি। এখানে সারণি ২.১-এ ১৯৭০ থেকে ১৯৯৪ এই আড়াই দশকের লিঙ্গ ভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচকের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

সারনি ২.১

লিঙ্গ ভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচক ঃ আড়াই দশকের অগ্রগতি

দেশ	লিঙ্গভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচক ১৯৭০	লিঙ্গভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচক ১৯৯৪	সূচকের পরিবর্তন (%)
কানাডা	০.৭৬৬	০.৯৩৯	২৩
সুইডেন	০.৭৬৪	০.৯৩২	২২
ফিনল্যান্ড	০.৭১৪	০.৯২৫	৩০
নরওয়ে	০.৭১৯	০.৯৩৪	৩০
ডেনমার্ক	০.৭৫৯	০.৯১৬	২১

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	০.৮১০	০.৯২৮	১৫
অষ্ট্রেলিয়া	০.৭২৫	০.৯১৭	২৬
ফ্রান্স	০.৭৪২	০.৯২৬	২৫
জাপান	০.৭০২	০.৯০১	২৮
নিউজিল্যান্ড	০.৬৯১	০.৯১৮	৩৩
বৃটেন	০.৬৯০	০.৮৯৬	৩০
নেদারল্যান্ড	০.৭০২	০.৯০১	২৮
সিঙ্গাপুর	০.৫১৯	০.৮৫৩	৬৪
মালয়েশিয়া	০.৪২২	০.৭৮২	৮৫
থাইল্যান্ড	০.৪৪৮	০.৮১২	৮১
স্পেন	০.৬০০	০.৮৭৪	৪৬
শ্রীলঙ্কা	০.৪৬৮	০.৬৯৪	৪৮
ভারত	০.২৫০	০.৪১৯	৬৮
পাকিস্তান	০.১৯৬	০.৩৯২	১০০
নেপাল	০.১২৮	০.৩২১	১৫০
মায়ানমার	০.৩৩৯	০.৪৬৯	৩৮
বাংলাদেশ	০.১৭৪	০.৩৩৯	৯৫

উৎস ঃ ইউএনডিপি, মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯৯৫।

এই সূচকের সর্বোচ্চ মান ১.০০। মানব উন্নয়ন সূচক (মাউসূ) কোন দেশেই ১.০০ পায়নি। অর্থাৎ প্রত্যাশিত আদর্শে পৌঁছতে পারেনি। সামগ্রিকভাবে জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং নারী পুরুষ বৈষম্য হ্রাস সবদেশে এক ভাবে ঘটেনি। কয়েকটি দেশে জনগনের জীবনযাত্রার মান যতটা বেড়েছে, বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে তার তুলনায় বেশী। অর্থাৎ এদের মাউসূ-তে অবস্থানের তুলনায় লিঙ্গ ভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচকগত অবস্থান উপরে। এ সমস্ত দেশ নারী পুরুষ উভয়ের মৌলিক চাহিদা পূরনের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। তবে বাংলাদেশ সহ দরিদ্র বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশের মেয়েরা অবর্নণীয় দুর্দশার শিকার। এ সমস্ত দেশে মানব উন্নয়ন খাতে সার্বিক অর্জন এমনিতে কম উপরন্তু মেয়েদের অবস্থান ও অর্জন পুরুষের তুলনায় আরও অনেক নীচে।

মাউস্-এবং লিঙ্গভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচকের তুলনামূলক একটি পর্যালোচনা 'সারনি ২.২' এর মাধ্যমে তুলে ধরা হল ঃ

সারণি ঃ ২.২

মানব উন্নয়ন এবং নারী সমতা ঃ নির্বাচিত দেশ				
দেশ	মানব উন্নয়ন সূচক (১৭৫টি দেশ)	লিঙ্গ ভিত্তিক মানব উন্নয়ন সূচক (১৪৬টি দেশ)	লিঙ্গ পরিমাপ (৯৪টি দেশ)	মাথাপিছু আয় (পি.পি.পি. ডলারে) ১৯৯৪
কানাডা	০.৯৬০	০.৯৩৯	০.৭০০	২১,৪৫৯
ফ্রান্স	০.৯৪৬	০.৯২৬	০.৪৫২	২০,৫১০
নরওয়ে	০.৯৪৩	০.৯৩৪	০.৭৯৫	২১,৩৪৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	০.৯৪২	০.৯২৮	০.৬৭১	২৬,৩৯৭
নেদারল্যান্ড	০.৯৪০	০.৯০১	০.৬৬০	১৯,২৩৮
জাপান	০.৯৪০	০.৯০১	০.৪৬৫	২১,৫৮১
ফিনল্যান্ড	০.৯৪০	০.৯২৫	০.৭১৯	১৭,৪১৭
নিউজিল্যান্ড	০.৯৩৭	০.৯১৮	০.৭১৮	১৬,৮৫১
সুইডেন	০.৯৩৬	০.৯৩২	০.৭৮৪	১৮,৫৪০
ডেনমার্ক	০.৯২৭	০.৯১৬	০.৭২৮	২১,৩৪১
ইংল্যান্ড	০.৯৩১	০.৮৯৬	০.৫৪৩	১৮,৬২০
সুইজারল্যান্ড	০.৯৩০	০.৮৭৪	০.৬৪২	২৪,৯৬৭
কুয়েত	০৮৮৪	০.৭৬৯	০.৩৩৩	২১,৮৭৫
মালয়েশিয়া	০.৮৩২	০.৭৮২	০.৪২২	৮,৮৬৫
চীন	০.৬২৬	০.৬১৭	০.৪৮১	২,৬০৪
শ্রীলংকা	০.৭১১	০৬৯৪	০.৩০৭	৩,২৭৭
ভারত	০.৪৪৬	০.৪১৯	০.২২৮	১,৩৪৮
পাকিস্তান	০.৪৪৫	০.৩৯২	০.১৮৯	২,১৫৪
বাংলাদেশ	০.৩৬৮	০.৩৩৯	০.২৭৩	১,৩৩১

উৎস ঃ ইউ এন ডিপি, মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯৫, সারণি ৩.৪ এবং ইউ এন ডিপি, মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯৭, সারণি ইনডেক্স- ২

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পর্যলোচনাঃ

দীর্ঘদিন ধরে বহু গবেষক, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান বলে আসছিলেন যে সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প মূলত পুরুষকে সাহায্য করেছে। জনগনের বাকী অর্ধেক, মেয়েরা এর কুফল গুলির বোঝা বহন করছে। উন্নয়নের ফলে অরণ্য ধবংস হয়েছে, করাত কলে মজুরি পেয়েছে পুরুষ। নতুন নতুন প্রযুক্তিতে পুরুষরা প্রশিক্ষণ পেয়ে ভাল জমিতে বাণিজ্যিক ফসল ফলিয়ে হাতে পেয়েছে নগদ অর্থ। আর নারী তার পুরণো পেশা গুলো থেকে উৎখাত হয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আরও খারাপ জমিতে আরও বেশী সময় এবং শ্রম খরচ করে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। পুরুষরা কাজের খোঁজে শহরে বা উন্নয়নের কেন্দ্রগুলোতে গেলে বাকী পোষ্য এবং পরিজনের ভরণপোষন করেছে মেয়েরা। অধিকাংশ দেশেই জমির অধিকার, ঋণের সুযোগ এবং নতুন প্রশিক্ষণ থেকে মেয়েরা বঞ্চিত।

১৯৭০-১৯৯৫ এই আড়াই দশকের ইউ এন ডিপির মানব উন্নয়ন সমীক্ষার মতে শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কোন কোন দেশে মেয়েরা পুরুষের কাছাকাছি এলেও অর্থনৈতিক অধিকার বা কাজের প্রশিক্ষনের পদোন্নতির বা আয়ের ব্যাপারে পুরুষের সমান হতে পারেনি। অর্থই যেহেতু সমাজে এবং পরিবারে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম চাবিকাঠি, তাই পরিশ্রম আগের তুলনায় বাড়লেও আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে মেয়েরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। জীবনযাপনের তিনটি মৌলিক বিষয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা উপর্জনের অধিকার। তবে স্বাস্থ্য শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্য কমলেও অর্থকরী কাজে তা কমেনি।

'প্রত্যাশিত আয়ু বাড়ার তাৎপর্য হলো খাদ্য-পুষ্টি-চিকিৎসা প্রভৃতিতে সুযোগের ব্যাপারে বৈষম্য কমেছে। প্রকৃতিগতভাবে নারীর এমন কিছু শারীরিক সুবিধা আছে যাতে পুষ্টি স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার সমান সুযোগ পেলে মেয়েরা পুরুষের তুলনায় গড়ে প্রায় ৭ বছর পর্যন্ত বেশী বাঁচতে পারে। একমাত্র ব্যতিক্রম নেপাল এবং ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলো। তবে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশেও পুরুষের প্রত্যাশিত আয়ুর তুলনায় মেয়েদের প্রত্যাশিত আয়ু সামান্য হলেও বেড়েছে।[৩৪]

শিল্পোন্নত দেশ গুলোতে অনেক আগেই শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে এবং বেশ কিছু দেশে মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে এগিয়ে আছে। স্বল্পন্নত দেশগুলিতেও শিক্ষার

---

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে আগের তুলনায় বৈষম্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে তবে স্বাস্থ্য শিক্ষায় নারী-পুরুষ বৈষম্য পুরো মুছে ফেলতে এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এশিয়া উপমহাদেশে ও আফ্রিকার দেশ গুলিতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবার গুলোতে ছেলে সন্তানের তুলনায় কন্যাশিশুরা অবহেলিত, অনেক ক্ষেত্রেই তারা পর্যাপ্ত খাদ্য ও চিকিৎসার সুযোগ পায়না। মেয়েদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অবহেলার আর একটি উদাহরণ হলো মাতৃমৃত্যুর উচ্চ হার। এ সমস্ত দেশে মেয়েদের প্রতি অবহেলা এত প্রকট যে প্রতি দু'জন মায়ের মধ্যে একজন প্রসবকালীন অসুস্থতা/জটিলতায় ভুগে থাকেন।

ঠিক তেমনি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য অনেকটা কমে আসলেও এখনও ৯০ কোটি নিরক্ষরের মধ্যে ৮০ কোটি নারী। এখন প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত ১৩ কোটি শিশুর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী কন্যা সন্তান। এই হার অতিক্রম করতে আরও দেড় দশক সময় লাগবে যা অনেক দেশের উন্নয়নের পক্ষেই বিরাট বাঁধা রূপে দেখা দিবে।

২.৭ নারীর ক্ষমতায়নঃ

উন্নয়ন ধারণার সাথে নারীর ক্ষমতায়ন শব্দটি প্রচন্ডভাবে সম্পৃক্ত। ক্ষমতায়ন একটি জটিল ও বহুমুখী প্রত্যয় যার সঙ্গে গ্রথিত রয়েছে অংশগ্রহণ ও সাম্যের ধারণা। ক্ষমতায়ন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Paulo Freire (1973) গত দুই তিন দশক ধরে উন্নয়ন ডিসকোর্সে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ক্ষমতায়ন শব্দটি একটি জনপ্রিয় পরিভাষা হয়ে ওঠে এবং তা কল্যাণ (Welfare), উন্নয়ন (Development), অংশগ্রহণ (Participation), নিয়ন্ত্রণ (Control), প্রবেশ (Access), সচেতনায়ন (Conscieutisation) ইত্যাদি শব্দগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয় (Longwe, 1990:204)।[৩৫]

ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টির সাথে ক্ষমতার ধারণাটি জড়িত। ক্ষমতা হচ্ছে কোন কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। ক্ষমতা দুটি বিষয়কে নির্দেশ করে। একটি হলো ব্যক্তি যা চায় তা প্রাপ্তির সামর্থ্য এবং অন্যটি হলো ব্যক্তি অন্যের চিন্তা, অনুভূতি ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য

---

[৩৫] 'Longwe, S. From welfare to Empowerment: The situation of women in development in South Asia, a post-UN Women's decades update and future directions working paper, 204, Michigan State University, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

(Parenti, 1978)। এক সময় ছিল নারীরা ক্ষমতাবান, আবার সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তনের সাথে পুরুষ ক্ষমতাবান হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠা আর পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে নারীদের পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানানোর মাধ্যমেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। যারা ক্ষমতায়ন শব্দটি ব্যবহার করেন তারা ধরে নেন যে, প্রত্যেক জনগোষ্ঠিতে একটি বিরাট অংশ রয়েছে যারা নিঃস্ব, দরিদ্র সম্পদ নেই, আর কম কিংবা ইচ্ছা থাকলেও কাজের সুযোগ কম। আরও ধরে নেওয়া হয় যে অর্থনৈতিকভাবে এরা ক্ষতিগ্রস্থ। .... বস্তুগত সম্পদ (Material resources), বুদ্ধি বৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Resource) ও আদর্শগত ধারণার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে ক্ষমতায়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[৩৬]

সাধারণত ক্ষমতায়ন নির্ভর করে ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ক্ষমতা (Ability to participate in decision making), খ) অর্থনৈতিক উপকরণের উপর নিয়ন্ত্রণ (Control over economic resources) এবং গ) পরিবর্তন ও সমান সুযোগ সুবিধার (Change and equal opportunity) উপর। 'ক্ষমতায়নের স্বরূপ ও ব্যাপ্তি অনেক রকমের হতে পারে। যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। তবে ক্ষমতায়ন শব্দটি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বিষয়কে ঘিরে [৩৭] 'আশির দশকের মাঝামাঝি সময়েই নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়নের (Participatiory Development) উপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়েই সমাজ বিশেষজ্ঞরা ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গটা এনেছেন। এজন্য ক্ষমতায়নকে কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক আলোচনার বিকাশ ও পরিব্যাপ্তি এখন ও সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য এখন ও পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে দক্ষিণ এশিয়াতে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ভাবে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। যথা:

সমন্বিত উন্নয়ন (Integrated Development),
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন (Economic Empowerment)
ও সচেতনতা সৃষ্টি (Awareness raising)
(Sushama, 1998:50)

---

[৩৬] মোঃ ইসমাইল হোসেন-পারিবারিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও এনজিও উদ্যোগঃ একটি পর্যালোচনা, ক্ষমতায়ন সংখ্যা-৬,২০০৪।
[৩৭] নুরুল আলম এস এম, ক্ষমতায়নঃ অর্থনীতি, রাজনীতি ও বাস্তবতা, নৃ-বিজ্ঞান পত্রিকা, ৪(১৯৯৯), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে সম্পর্ক সব চেয়ে বেশি। 'বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে শিক্ষান্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী নিম্নোক্ত বিষয়ে ক্ষমতায়িত হয়েছে।

১। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে;

২। বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে;

৩। গৃহের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ গ্রহণ করেছে;

৪। সন্তানের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে;

৫। কোন বয়সে সন্তান গ্রহণ করবে সেই সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে;

৬। কোন ছেলেকে বিয়ে করবে সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার শক্তি অর্জন করছে;

৭। এমনকি সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ সম্বন্ধীয় মতামত সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছেন।"[৩৮]

আমরা জানি শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে, অধিকার সচেতন করে আত্নসম্মানবোধ আত্নকর্মসংস্থান তথা অংশগ্রহণ প্রবণতা বাড়ায়। এতে দেশের উন্নয়ন তরান্বিত হয়। কিন্তু নারী উন্নয়নের নামে আজও পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে সরকারী পর্যায়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু এই পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা নারী-পুরুষ ভেদাভেদ দূর করায় কতটা সহায়তা করে, কিংবা কতটুকুই বা কাজে আসে, কতটুকু মানবিক বোধ সম্পন্ন করে গড়ে তোলে তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। নিজেকে ক্ষমতায়িত করার জন্য যতগুলি গুণের প্রয়োজন তার প্রত্যেকটিকে নারী অর্জন করতে পারে প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার মাধ্যমে।

আবার Vanessa Griffen তাঁর সম্পাদিত Woman Development and Empowerment: A Pacific Feminist Perspective গ্রন্থে বলেন,

To me power means,

- Having control or gaining further control.
- Having a say and being listened to
- Being able to define and create from women's perspective.

---

[৩৮] ডঃ প্রতিমা পাল মজুমদার, 'বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা বাজেট ও নারীর ক্ষমতায়ন', বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, প্রকাশকাল, ২০০৫, পৃঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

- Being able to influence social choices and decisions affecting the whole society (not just areas of society accepted as women's palce)
- Being recognized and respected as equal citizens and human beings with a contribution to make (Power means being able to make a contribution at all levels of society and not just in the home. Power also means having women's contribution recognized and valued).

জাতিসংঘের সংজ্ঞানুসারে "It is the process by which women mobilise to understand identify and over come gender discrimination, so as to achieve equality of welfare and equal access to resources" ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া যায় দ্বারা নারী কল্যাণে সমতা এবং সম্পদ আহরণে সমান সুযোগ অর্জনের লক্ষ্য সামনে নিয়ে জেন্ডার বৈষম্য অনুধাবন, চিহ্নিতকরণ ও বিলোপ সাধনের জন্য একজোট হয়।" জাতি সংঘের সংজ্ঞায় ক্ষমতায়নের পাঁচটি স্তর আছে। স্তরগুলো উর্ধ্বক্রম অনুসারে নিম্নরূপঃ

ক্ষমাতায়ন (Empowerment)
↑
নিয়ন্ত্রণ (Control)
↑
অংশগ্রহণ (Participation)
↑
নারী জাগরণ (Consicieutisation)
↑
সম্পদ আহরণ ও নিয়ন্ত্রণে
অবাধ সুযোগ ও অধিকার (Access)
↑
কল্যাণ (Welfare)[৩৯]

[৩৯] (সূত্রঃ মাহমুদা ইসলাম 'নারী নির্যাতন ও নারীর ক্ষমতায়ন', নারীদের চিন্তা ও নারী জীবন, পৃঃ ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুগত, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণকে ক্ষমতায়ন বলে। এ ধরণের সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। এ সকল একটি বা অনেকগুলো সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি বা সামাজিক ক্ষমতার উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়।[৪০]

নারীর ক্ষমতায়নকে Kate Young দেখিয়েছেন 'অবস্থা' ও 'অবস্থানের' সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় অবস্থা হচেছ দরিদ্র নারী যেভাবে জীবন যাপন করে, কম মজুরী, পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যসেবার অভাব, শিক্ষার এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকা প্রভৃতি। আর অবস্থান মানে পুরুষের সাথে তুলনামূলকভাবে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা।[৪১]

Development crysis and Alternative versions third world women's perspective-এ সেন এবং গ্রাউন বলেছেন যে নারীর ক্ষমতায়নের অর্থ হচ্ছে অধস্তনতার কাঠামোর রূপান্তর। এর মধ্যে থাকবে আইন, পারিবারিক আইন, সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধিকার নারীর নিজের শরীর এবং শ্রম এবং সামাজিক এবং আইনী প্রতিষ্ঠান এর উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ। তারা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একদিকে সম্পদ (অর্থ জ্ঞান প্রযুক্তি), দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং নেতৃত্ব এবং অন্যদিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সংলাপ, সিদ্ধান্ত এবং নীতি নির্ধারণের অংশ গ্রহণ এবং দ্বন্দ্ব নিরসনে দক্ষতা অর্জন এর জন্য প্রয়োজনীয়তা আরোপ করেন।

Development Alternatives with Women for a new Era (DAWN) ক্ষমতায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট ও বিশেষ সংজ্ঞায়ন করেছে। DAWN ১৯৮৫ সালে নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব উইমেন এর আগে কিছু নারী ব্যক্তিত্ব এবং নারী সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হয়। DAWN এর উদ্দেশ্য বিশ্বের নারী সমাজের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা নয়, বরং তাদের লক্ষ্য বিকল্প সমাজ ব্যবস্থা গঠনের চিন্তাশক্তি গঠন করা। যার মূল উদ্দেশ্য এমন এক পৃথিবী গঠন করা যেখানে প্রত্যেকটি দেশ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার সম্পর্ক হবে শ্রেণী, লিঙ্গীয় সম্পর্ক এবং বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্যহীন। এর ভবিষ্যৎ পৃথিবী গঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী রূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিবেচনা করা হয়

---

[৪০] শামীমা পারভীন, 'নারীর ক্ষমতায়ন' উন্নয়ন পদক্ষেপ, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, ১৯৯৮ ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, পৃঃ ৩৮।

[৪১] আবেদা সুলতানা "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি, একটি বিশ্লেষণ," ক্ষমতায়ন সংখ্যা ২, ১৯৯৮, উইমেন ফর উইমেন, পৃঃ ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

দূর দৃষ্টি থেকে, যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।[৪২]

নারীর ক্ষমতায়নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যেমন-

সামাজিক ভূমিকা বৃদ্ধি

উচ্চ স্বাক্ষরতা, অধিক হারে সম্পত্তির অধিকার, উচ্চহারে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ, ঋণে প্রবেশাধিকার, প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপকহারে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ এগুলো হলো-নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক। এর মাধ্যমে শুধুমাত্র নারীর কল্যাণ অর্জনে সহায়ক হবে না বরং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে তাদের ভূমিকাকে আরো শক্তিশালী করবে।[৪৩]

বৈষম্য দূরীকরণ

ক্ষমতায়ন পদ্ধতি নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এবং পরিবার যে নারীর অধস্তনতার উৎস এটা বলে থাকে। সেই সাথে এটাও মনে করে যে, নারীর প্রতি নির্যাতনের যে অভিজ্ঞতা তা তাদের বর্ণ, শ্রেণী, উপনিবেশিক ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিমন্ডলে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন। যা এটাই নির্দেশনা দান করে যে, নারীকে একই সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান নির্যাতনমূলক কাঠামো ও অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। যে প্রক্রিয়া এ সকল ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাকে বলে নারীর ক্ষমতায়ন।[৪৪]

---

[৪২] মেঘনাগুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন, প্রসঙ্গ বাংলাদেশঃ নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৭, পৃঃ ১৮০।

[43] Binayak Sen: "Bangladesh poverty analysis: Trends, policies and Institutions, 2000'' Hossain Jillur Rahman and Mahbub Hossain edlted, Rethinking rural Poverty-Bangladesh as a case study, University Press Limited, 1995.

[৪৪] শাহীন রহমান, "জেন্ডার পরিভাষা/শব্দকোষ" উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ৭ম সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃঃ ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাঃ

পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নারী উন্নয়নের আর একটি দিক নির্দেশক। ক্ষমতায়ন পদ্ধতি নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়। নারী তার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্পগুলো গ্রহণ করতে পারছে কিনা এবং গুরুত্বপুর্ণ বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে নিজ জীবনের পরিবর্তন আনতে পারছে কিনা অর্থাৎ নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে কিনা তার উপর এই স্বনির্ভরতা ও আভ্যন্তরীন শক্তি কিভাবে নির্দিষ্ট হচ্ছে তা নির্ভর করে।

ডঃ নাজমা চৌধুরী ক্ষমতায়ন বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন করেছেন এভাবে, নারীর ক্ষমতায়ন অর্থ এই নয় যে, "যারা ক্ষমতার চেয়ারে অধিষ্ঠিত আছেন, নারীরা তাদের সরিয়ে নিজেরা ক্ষমতায় আসবেন....... । নারীর ক্ষমতায়ন বলতে আমরা নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি, তার জীবন, তার অবস্থান তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি বৃদ্ধি বুঝাচ্ছি।"[৪৫]

পুরুষের সাথে সমতা ঃ

উন্নয়নের আর একটি দিক হল সমতা। ক্ষমতায়ন অর্থ হলো যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সব বিরাজমান কাঠামো অসমতা নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের পশ্চাৎপদ অবস্থায় রাখে তা থেকে উত্তরণ। এই যৌথ প্রচেষ্টায় পুরুষ ও অংশীদার, ক্ষমতার জন্য পুরুষের সঙ্গে নারীর বৈরীমূলক সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা নয়। ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত আলোচনার আদর্শিক ধারণা হলো পুরুষের সঙ্গে সহাবস্থানে, সম মর্যাদায় নারীর অবস্থান প্রয়োজন, কেননা নারীও সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক। প্রক্রিয়া হিসেবে উন্নয়ন বহুমাত্রিক, যার সঙ্গে নারী ও সম্পৃক্ত। সমাজের যে সকল কর্মকান্ডে নারী নিয়োজিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী সমাজে যথাযথ মূল্যায়নে অধিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ সহাবস্থানে দাঁড়াবার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হবে। কারণ জ্ঞান, আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জণই হল ক্ষমতায়ন।

---

[৪৫] ডাঃ নাজমা চৌধুরী, 'ইউনিয়ন পরিষদে নারী, প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন' শীর্ষক সেমিনারের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত, উইমেনফন্ড, উইমেন, ১৯৯৫, পৃঃ ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী সমস্যা তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য,কর্মস্থান, আইনগত, পরিবেশগত, অর্থাৎ সার্বিক অস্তিত্বে পশ্চাৎপদ অবস্থান এবং এসব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্যের নিরসন ঘটানো, নারীর স্বকীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও অবদানের স্বীকৃতি এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। ১৯৯০ এ প্রনীত বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের টাস্কফোর্স রিপোর্টে বলা হয়েছে, নারীর ক্ষমতায়নের অর্থনৈতিক, আইনগত ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যমান। সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হতে হল এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত বা মাত্রা ধারণ করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের মূখ্য উদ্দেশ্য শুধু নারীর শক্তি সঞ্চয়নই নয়, বস্তুতপক্ষে নারীর ক্ষমতায়ন সুষম ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটানোর একটি মাধ্যম।[৪৬]

নারীর ক্ষমতায়নে PEAঃ

বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল PEA, এটি বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা। চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন ১৯৯৫ এ বৈশ্বিক ঐকমত্য স্বরূপ এই মূল দলিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। এতে দারিদ্র, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নির্যাতন সশস্ত্র সংঘাত দূরীকরণ, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান সুযোগ এবং পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নীতি নির্ধারণ এবং নেতৃত্বে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের দিক নির্দেশনা খোঁজা হয়েছে। কারণ সামাজিক ইস্যু হিসেবে নারী উন্নয়ন সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত যা নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। তবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীর রাজনৈতিক সক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই তার সামাজিক অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যদি প্রয়োজনীয় শর্ত হয় তবে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন পর্যাপ্ত শর্ত এবং দুটি শর্ত পূরণ হলেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফসল হিসেবে নারী সচেতায়িত হলেও

---

[৪৬] ডঃ নাজমা চৌধুরী এবং অন্যান্য "নারীর ক্ষমতায়ন" উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, টাস্কফোর্স প্রতিবেদন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারী নীতি নির্ধারণে নারী প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িত না হওয়ায়।[৪৭]

নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে নারী অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এগিয়ে যায়।' মূলতঃ PEA, হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের এজেন্ডা এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেনের মূল দলিল। PEA, এর ১৩ নং অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে, সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি অর্জনের জন্য নারীর ক্ষমতা লাভের সুযোগসহ সমতার ভিত্তিতে সমাজের কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। ১৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতি সাধনের জন্য প্রতিটি পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নসহ সকল কার্যক্রমে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ সহকারে কার্যকর, দক্ষ এবং পারস্পরিক শক্তিবৃদ্ধিমূলক জেন্ডার সচেতন নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অপরিহার্য।[৪৮]

---

[৪৭] আবেদা সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।

[৪৮] আবেদা সুলতানা ''নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি, একটি বিশ্লেষণ" ক্ষমতায়ন সংখ্যা : ২,১৯৯৮, উইমেন ফর উইমেন, পৃ: ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা
৩.২ বিশ্বব্যাপী শ্রম শক্তিতে নারীর অবস্থান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী
৩.২.১ শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা ও তার মূল্যায়ন
৩.২.২ রাষ্ট্রীয় সুযোগ ও অধিকারের বৈষম্য
৩.৩ উন্নয়নে নারী ঃ জাতিসংঘের অবস্থান
৩.৩.১ জাতিসংঘ চার্টারে নারী
৩.৩.২ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও নারী দশক
৩.৩.৩ জাতিসংঘ কাঠামোয় নারী

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণার বিষয়বস্তুর মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে 'উন্নয়ন'-এ নারীর যথাযথ অবস্থান এবং সেক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকার বিষয়টি ফোকাস করা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নীতি নির্ধারণী, অর্থনীতি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের বহুমাত্রিক ব্যাপ্তির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বর্তমান পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়টি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস রয়েছে। উন্নয়নে নারীর প্রকৃত অবস্থান বিশ্লেষণ করার জন্য সমাজ কাঠামোয় নারীর অবস্থান,কর্মের বিভাজন, নারীর কর্মের স্বীকৃতি, নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রভৃতি আলোচনার প্রেক্ষিতে বর্তমান বিশ্ব শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের প্রকৃতি এবং প্রশাসনিক অধস্তনতা তুলে ধরার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জাতিসংঘের গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

৩.১ উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা ঃ

আমরা জানি উন্নয়ন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রত্যয়। কোন সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের সামগ্রিক ও সুষম উন্নয়ন নির্ভর করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে ঐ সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের প্রতিটি সদস্যের সমান অংশীদারীত্বের উপর। সমগ্র বিশ্বজুড়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হলেও আজও তা সামাগ্রিকতার আস্বাদ গ্রহণ করেনি। কারণ সমাজের অর্ধেক জণগোষ্ঠি এখনও এই উন্নয়নের প্রান্তে অবস্থান করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীদের যে সমস্যাটি প্রকট ভাবে মোকাবেলা করতে হয় তা হল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সমস্যা, সিদ্ধান্তগ্রহণের এবং রাজনৈতিক প্রশাসনে নিজের ভূমিকা রাখার সমস্যা। একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নগত অবস্থান বোঝার জন্য সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্বের ও অংশীদারিত্বের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর সম্পৃক্তিকরণ অর্থে উন্নয়ন অর্থ হল 'সনাতন মূল্যবোধের দূর্বলীকরণ, প্রজনন হার হ্রাস, নগরায়ন বৃদ্ধি, নারীর জন্য ব্যাপক শিক্ষা ও শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ এবং নারীর যথাযথ ভূমিকা সম্পর্কে ধারণার ব্যবহারিক পরিবর্তন।[১]

[১] উন্নয়ন পদক্ষেপ, ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা-১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

যুগ যুগ ধরে সমাজ সভ্যতা তথা উন্নয়নে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে নারীরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নারীরা ও তাই পুরুষের ন্যায় জাতীয় উন্নয়নে সমান অংশীদার প্রকৃত পক্ষে নারীরা সেই সুদূর অতীত থেকেই উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি। কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্য জাতীয় উন্নয়নে নারীর এই অবদান আজ ও যথাযথভাবে পরিমাপ করা হয় না। নারীর অবদান ও ভূমিকা পুরুষতান্ত্রিকতার জটিল মারপ্যাচের আড়ালে চাপা পড়ে থাকে।

নারীর অবস্থান নির্দিষ্ট করতে প্রচলিত উন্নয়ন ব্যবস্থায় নারীর সার্বিক অবস্থান এবং ভূমিকা পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। সমাজ কাঠামোর কালানুক্রমিক পর্যায় গুলি বিশ্লেষণ করলে সুদূর অতীত কাল থেকে নারীর অবস্থান পরিলক্ষিত হবে। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব ব্যবস্থায় উন্নয়নের সার্বিক সুযোগ সুবিধা গুলি পুরুষের পক্ষে কাজ করে। অপর পক্ষে নারীর ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হয় না; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া হয় কিংবা অস্বীকার করা হয় কিংবা অবমূল্যায়ন করা হয়। অসম, কর্ম ও শ্রেণী বিভাজন সার্বিক গার্হস্থ্য কাজ নারীদের উপর চাপিয়ে দেয়া এবং সে কাজের আর্থিক মজুরী বিবেচনা না করে কর্ম হিসাবে স্বীকৃতি না দেয়া, পুনরুৎপাদনমূলক কাজের অবমূল্যায়ন, সনাতন কাজের মধ্যে আটকে রেখে প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখা, বিনা মজুরীতে শ্রম ও অসম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। সময়ের ও যুগের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী যতই আধুনিকতার কথা বলা হোক না কেন নারীর পশ্চাৎপদ, অনগ্রসর ও প্রান্তিক অবস্থান টিকিয়ে রাখার প্রয়াস কোন কোন সমাজে এখনো বর্তমান। এর জন্য ব্যবহার হচেছ নতুন নতুন প্রযুক্তির নতুন নতুন সব কুটকৌশল। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে অন্তর্ভুক্তকরণে প্রকট আকারে বৈষম্য বিরাজমান রয়েছে একবিংশ শতাব্দীতেও। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের মূলে থেকেও নারী প্রকৃত পক্ষে বরাবর পুরুষতান্ত্রিক সমাজে উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিকরণ ও দাবী উথাপিত হওয়ার মাধ্যমে উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আমাদের সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

মূলসত্য হল এই যে, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পূর্ণাঙ্গ মানব উন্নয়ন ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে হলে অর্ধেক মানব সম্পদ নারীকে বাদ রেখে যে তা সম্ভব নয় এটা এখন সুস্পষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে উঠেছে। আধুনিকায়নের কল্যাণে আমরা যে প্রযুক্তি পেয়েছি তা আমরা দু'ভাবে ব্যবহার করতে পারি-

১) **সময় বাঁচানোর ক্ষেত্রে**- যেমন, কম্পিউটারের কল্যানে আমরা স্বল্প সময়ে বড় বড় গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে নিতে পারি, দূর দেশের তাৎক্ষণিক খবরা খবর নিতে পারি, বিশ্বের বিভিন্ন লাইব্রেরীর পুস্তক সম্ভার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে অনেক জরুরী সমস্যার সমাধান করে নিতে পারি অনেক অল্প সময়ে ইত্যাদি।

২) **সময় নষ্ট করার কাজে** ঃ আমরা এই কম্পিউটার এ গেমস খেলে বা চ্যাটিং করে সময় নষ্ট করতে পারি ঘন্টায় পর ঘন্টা, দিনের পর দিন। এতে সময় নষ্ট হওয়ার পাশা পাশি একটি ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এভাবে সৃষ্টির অর্ধেক জনগোষ্ঠী কল্যাণময়ী, পুনরুৎপাদনশীল নারীকে উন্নয়নের স্রোতে সম্পৃক্ত করে সার্বিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে পারি; আবার এই নারী শক্তিকে প্রান্তিকতায় ঠেলে দিয়ে আমরা উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্থ করে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে যেতে পারি এবং সভ্যতা প্রকৃত পক্ষেই নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত না করে এখনও অনেক পিছনে পড়ে আছে। তবে আমার কথা হল যে, সমাজ এখন ক্রমশ উপলব্ধি করছে যে, নারী শুধু মাতা বা গৃহবধু নয়, তারা উন্নয়নের সমভাগদার। মানব সম্পদ সৃজনের, গঠনের এবং লালনের দায় দায়িত্ব মূলত নারীরাই বহন করে। তাই বলা হয় পিতৃ হারা একটি সন্তানের মাকে নিয়ে ভালই চলতে পারে- কিন্তু মাতৃহারা একটি সন্তানের জীবনে দুঃখ কষ্টের সীমা থাকে না। নারীরা মজুরি বিহীন সার্বক্ষণিক অগণিত কাজ এবং মজুরি ভিত্তিক উভয় ধরণের কাজের দ্বারা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ‘‘তারা আয় উপার্জন মূলক কাজের পাশাপাশি পরিবারের নানা কাজে যুক্ত। যেমনঃ গৃহস্থালী কাজকর্ম, পারিবারিক কৃষিকাজ, খাদ্য উৎপাদন, সন্তান লালন পালন শিশু বৃদ্ধ ও অসুস্থদের সেবা শুশ্রূষা। এ ছাড়া ও পাড়া মহল্লায় মানুষের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কাজ ও করে নারীরা। কিন্তু নারীর এসব মজুরী বিহীন পারিবারিক কাজকর্ম ও স্বেচ্ছাশ্রম জাতীয় হিসেবে ধারা হয় না। ফলে জাতীয় উন্নয়নের তাদের অবদান অবমূল্যায়ন করা হয়। অথচ দুনিয়ার সমস্ত কাজের তিন ভাগের দুই ভাগ করে নারী।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ও পুরুষের চাইতে নারীকে প্রায় ১৫গুণ সাংসারিক কাজের বোঝা বহন করতে হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নারীরা সপ্তাহে প্রায় ৪০ ঘন্টা মজুরী বিহীন কাজে নিয়োজিত থাকে এবং পুরুষেরা এ ধরণের কাজ সপ্তাহে করে মাত্র ১০ঘন্টা বিশ্বের প্রতিটি দেশের পুরুষের চাইতে মজুরি ও মজুরি বিহীন কাজ তাই নারীরাই বেশি করে থাকে। আর নারীর এসব মানব সম্পদ বা সক্ষম শ্রম শক্তি গড়ে তুলতে অপরিহার্য।"[২]

এভাবে ঘরের বাইরে মজুরি ভিত্তিক কাজ এবং ঘরে বিনা মজুরির কাজ এই উভয় ধরনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে আজকের নারী। অন্যদিকে মেয়েদের পারিবারিক বা গৃহস্থালী কাজকর্ম, মজুরি বিহীন, অদৃশ্য ও স্বীকৃতি হীন। অথচ গোটা মানব সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে নারী তার অমূল্য শ্রম ও ভালাবাসার বিনিময়ে। নারীর অবদান যে কতটা তা পুরুষ সমাজ তো বুঝেই না- অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ও বুঝে না বা জানে না প্রতিনিয়ত সে কী মাঙ্গলিক কর্মকান্ড সাধনা করে যাচ্ছে পৃথিবীর উন্নয়ন সাধনের জন্য। অথচ অধিকাংশ সময় পৃথিবী তাদের এসব কষ্ট সাধ্য কামকর্মের মূল্য পরিমাপ করে না। "জাতি সংঘ তথ্য মতে নারীর বিনা মজুরির গৃহস্থলী শ্রমের মূল্য ১১ লক্ষ কোটি (১১ ট্রিলিয়ন) ডলার। হিসাব না করায় বিশ্ব অর্থনীতি থেকে প্রতি বছর এই ১১ লক্ষ কোটি ডলার হারিয়ে যায়, যা হল নারীর অদৃশ্য অবদান। জাতিসংঘ সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে, নারীরা সংসারে যে শ্রম দেয় তা বাজার মূল্যে জাতীয় আয়ে যুক্ত করলে বিশ্বের মোট উৎপাদন আরো ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। আবার বিশ্ব খাদ্য সংস্থার গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অধিকাংশ দেশে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে নারীরা মূল ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী অফ্রিকার ভোগ করা মোট খাদ্যশস্যের ৮০ ভাগ এবং ল্যাটিন আমেরিকার ৪০ ভাগ নারীরাই উৎপাদন করে।"[৩]

নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোতের বাইরে রেখে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয় একথা এখন স্পষ্ট হয়েছে। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের ধারণার ও পরিবর্তন হয়েছে এবং জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজের স্বীকৃতির দিকে তাকিয়ে না থেকে নারীরাও তাদের অবস্থার পরিবর্তন এবং মর্যাদা আদায়ের ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন।

[২] স্টেপস বিশেষ নিবন্ধ-উন্নয়ন পদক্ষেপ, সাঁইত্রিশ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩১।
[৩] স্টেপস বিশেষ নিবন্ধ-উন্নয়ন পদক্ষেপ, সাঁইত্রিশ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩২।

বিশ্বব্যাপী নারীর অবস্থানের যথাযর্থ মূল্যায়নের সুযোগ এসেছে। একুশ শতকের প্রারম্ভে নারীরাও আশায় বুক বাঁধতে পারছে যে, সময় এসেছে সমাজের ঘুনে ধরা ভিত্তির পরিবর্তন সাধন করে উন্নয়নে নারীর অবস্থানের যথাযত স্বীকৃতি আদায় করার এখনই সময়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে নারীর অবস্থানের কিছুটা পার্থক্য থাকলে ও তাদের অবস্থান সার্বিক ভাবে অনগ্রসর ও একই ভাবে অবমূল্যায়ন কৃত, অস্বীকৃত এই বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে গবেষনার আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও অবস্থান থেকে বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। উন্নয়নে নারীর প্রকৃত অবস্থান কোথায় আছে তা নিয়েও মত পার্থক্য রয়েছে।

প্রায়শঃই বলা হয় যে, ‘‘নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে হবে ‘‘উন্নয়নে নারীর ভূমিকা নিয়ে নীতি নির্ধারিকদের এ ধরণের ধারণা কিংবা মন্তব্য এক ধরণের জটিলতা তৈরী করে। এ কথাটি এভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যে, এর অর্থ নারী উন্নয়ন কার্যক্রমে কোন ভূমিকা রাখছে না কিংবা অনুপস্থিত। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং একেবারেই ঠিক নয়। মূলত ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শ্রম বিশেষজ্ঞায়নের জটিল কৌশলের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি। সমাজে উন্নয়নের প্রথম ধাপে সকল পণ্য এবং সেবা পারিবারিক গ্রুপের মধ্যে উৎপন্ন হতো, কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান হারে নির্দিষ্ট কাজে বিশেষজ্ঞাতার সৃষ্টি হলো এবং পারিবারিক গ্রুপের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলো পন্য ও সেবার বিনিময়। কিন্তু একেবারে আদিম অবস্থায় পারিবারিক স্বয়ংস্পূর্ণতার সময় ও কিছু কিছু শ্রম বিভাজন ছিলো নারী- পুরুষ-শিশু ও বৃদ্ধের জন্য। বস্তুতঃ তখন থেকেই ক্রমে কর্ম বিভাজন থেকে লিঙ্গ বৈষ্যমের সূচনা।[৪]

অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার শুরু থেকেই নারীরা তাতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, কিন্তু কর্মের যে বিভাজন তৈরী হয়েছে তাতে নারীরা দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়েছে। লেনিন বলেছেন, ‘‘সমস্ত মুক্তিদায়ী আইন সত্বে ও মেয়ে সাংসারিক বাদীই থেকে যাচ্ছে, কারণ তাকে দাবিয়ে রাখছে, শ্বাসরুদ্ধ করছে, বিমুঢ় করছে, হীন করে রাখছে ক্ষুদ্র সাংসারিক গৃহস্থালি। বেঁধে রাখছে তাকে পাঁকশালায় আর শিশুপালন ঘরে। অমানুষিক ভাবে অনুৎপাদক, তুচহ পিত্তি জ্বালানো, মন ভোঁতা করা, হাড়-গুঁড়ানো কাজে অপচয় হচ্ছে শ্রম। সত্যকারের নারীমুক্তি,

[৪] Easter Boserup, Womens' Role in Economic Development, George Allen and Unwin LTD, London, 1970.

Dhaka University Institutional Repository

সত্যকারের কমিউনিজম শুরু হবে কেবল তখনই এবং সেখানেই, যখন এবং যেখানে শুরু হবে এই তুচ্ছ গেরস্থালির বিরুদ্ধে গণ সংগ্রাম...অথবা আর ও সঠিক ভাবে বললে, শুরু হবে বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি রূপে যে গেরস্থালির ব্যাপক পুনঃনির্মাণ।[৫]

উৎপাদন ব্যবস্থার শুরু থেকেই নারীরা যে অসমতার আবর্তে আবদ্ধ হয়েছিল ক্রমেই তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে শ্রমবিভাজনের ক্রমবর্ধমান প্রসারে নারীর অবস্থান প্রান্তিক হয়েছে। এই প্রান্তিকতা শুধু অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নয়, বরং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা, তাঁদের অর্জন ও প্রাপ্তি প্রতিটি বিষয়েই প্রযোজ্য। বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলে নারীরা বেশি মাত্রায় এই অবাঞ্চিত পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে নারী উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত অধিকাংশ নারী বিশেষ করে বিশ্বের নারী অর্থনীতির অপর্যবেক্ষণকৃত খাতে কাজ করছে যা অংশ গ্রহণ বলে বিবেচ্য নয় এবং তাদের সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়। এই ভ্রান্তি দূর করে এভাবে প্রকৃত অবস্থা করতে হবে যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী প্রান্তিক নয়, কেন্দ্রীয়। এবং নারীর সম্পৃক্তকরণ বলতে সরকার ও বে-সরকারী কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করণ নয়, বরং উন্নয়নের ফলে নারীর ক্ষেত্রে কি ঘটেছে, তাদের ভূমিকা, ও তারা কি লাভ করছে এসবই উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিবেচ্য হওয়া উচিত।[৬]

পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যকার লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের কারণে ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের বহুবিধ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্যা গুলি শুধু নারীকেই প্রভাবিত করছে না একই সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিকতার আবর্তে আবর্তিত পুরুষরাও এর প্রভাব মুক্ত হতে পারছে না। তাই কর্মের পরিধি বিস্তৃতকরণ নারী সংক্রান্ত গবেষণা গুলিতে উৎসাহিত করণের মাধ্যমে নীতিনির্ধারণ, সমস্যা চিহ্নিত করণ, উন্নয়নে নারীর অবস্থানগত দিক নির্দেশনা এবং সঠিকভাবে পরিসংখ্যানে অন্তর্ভূক্ত করণের বিষয়টি ও এখন অত্যন্ত জরুরী।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান নির্ণয় ও শ্রমের স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নারীর মতামত গ্রহণের বিষয়টি ও গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

[৫] উন্নয়ন পদক্ষেপ, আটত্রিশতম সংখ্যা, লেনিন (মহা উদ্যোগ), পৃষ্ঠা-৩২।
[৬] Raunaq Jahan & Hanna Papanek eds; Women and Development Institute of law & International Affairs, Dhaka.

পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে জাতীয় নীতি প্রনেতাগণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নারীর মতামতকে অন্তর্ভূক্ত করা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন।[৭]

ফলে, যে কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোতে করা হয়, অর্থাৎ নারীর অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিবেচনা করা হয় না বলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সার্বিক রূপ লাভ করতে পারে না- অপূর্ণ থেকে যায়।

এ কারণে প্রথম: নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা একমুখী ও নারীর প্রতি বিমুখ হয় কিংবা নারীর জন্য সহজগম্য হয় না। দ্বিতীয়ত: বাস্তবায়ন পর্যায়ে নারীর উপযোগী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় না। ফলশ্রুতিতে মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়ে নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজের সুস্পষ্ট অবস্থান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। অর্থাৎ বলা যায়, নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সর্বত্র অংশগ্রহনের মাধ্যমে স্বীয় অবদান রেখে চলেছে কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিবন্ধকতার কারণে বিশেষত: পুরুষ তান্ত্রিকতার প্রভাবে তার অংশ গ্রহণ পূর্ণ স্বীকৃতি পাচ্ছে না। এজন্য প্রয়োজন উন্নয়ন নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ নারী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, গবেষক, রাজনীতি বিদ, নারী উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নারী প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সঠিক উন্নয়ন নীতি কৌশল প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ ও কার্যকর করা।

৩.২ বিশ্বব্যাপী শ্রমশক্তিতে নারীর অবস্থান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নারী ঃ

নারী উন্নয়ন গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী শ্রমশক্তিতে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণের জন্য আন্ত র্জাতিক শ্রমবাজারে নারীর অবস্থান এবং পশ্চাৎপদতা এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীরা কী ধরণের পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে বর্তমান বাজেট কতটুকু জেন্ডার সচেতন ইত্যাদি জানা একান্ত প্রয়োজন। উপরোক্ত বিষয়গুলো গবেষণার এই পর্যায়ে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

[৭] Rehman Sohhan, Planning and Public Action for Asian Women, University Press Ltd. 1992.

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.১ শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা ও তার মূল্যায়ন ঃ

উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততার বিষয়টি এ অধ্যায়ের শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অবদানের স্বীকৃতি নেই নীতি নির্ধারনের (পুরুষতান্ত্রিক) জটিলতার কারণে। আবার এই পুরুষতান্ত্রিকতার কারণেই নারী উন্নয়ন পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই দ্বৈত সমস্যার প্রেক্ষিতে বিশ্ব শ্রম বাজারে নারীর সীমাবদ্ধ অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সভ্যতা, সমাজ তথা উন্নয়নে নারীরা যুগ যুগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পালন করে চলছে। নারীরা সেই সুদূর অতীত থেকেই উন্নয়নে অন্যতম চালিকা শক্তি। কিন্তু দুঃখ জনক হল জাতীয় উন্নয়নের নারীর এই অবাদান আজও যথাযথ ভাবে পরিমাপ করা হয় না। তবে পর্দার আড়ালে রয়ে যাওয়া তাদের এই অবদান ও ভূমিকাকে জন সম্মুখে প্রকাশ করার আলোকিত প্রয়াস দেখা যাচ্ছে বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রমশক্তিতে বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে পুরুষের সাথে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ। 'আশির দশকের গোড়ার দিকে উৎপাদন মূলক কাজের ধারণায় এক পরিবর্তনের ধারা তৈরী হয় এবং গৃহস্থালী কাজ পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। দেখা যায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মসূচীতে অর্থনীতির বিভিন্ন ইস্যুতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হয়নি, (The World's Women 1995, Trends and Statistics, A World Report, United Nations Publications, Newyork, 1995). শ্রমবাজারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তখন থেকে নারীর অংগ্রহণ ও অবস্থান নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত হয়। উন্নত দেশগুলিতে শ্রমশক্তি রূপে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের চেয়ে দুইগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের মোট শ্রমশক্তির ৮০ ভাগই নারী। বর্তমানে শ্রমশক্তির সংজ্ঞাও অর্থনৈতিক অবদান পরিমাপের মানদন্ড উন্নত করায় বিশ্বজুড়ে নারীর উন্নয়ন ভূমিকা মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

বিশ্বের সর্বত্র প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখ যোগ্য হারে বাড়ছে। তাদের অবদানে সমৃদ্ধ হচ্ছে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি। ILO এর রিপোর্ট অনুসারে 'পৃথিবীর তিনভাগের দুইভাগ কাজ নারীরা করে'' ।[৮]

---

[৮] International Labour Organization, Report to Copenhegen Mid-decade conference on Women-1980.

Dhaka University Institutional Repository

শ্রম বাজারে অংশগ্রহণের বিভিন্ন মুখিতা (diversification)শ্রমজীবন উন্নয়নের একটি পূর্ব শর্ত। কৃষি, মৎস, পোল্ট্রি ইত্যাদি খাতে নারীরা উদ্যোক্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও গড়ে তুলছে নারীরা। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান এই ইতি বাচক প্রবণতা লক্ষনীয়। পরিবারে নারীর আয় উপার্জন জনিত অবদান এখন ক্রমশ আবশ্যক হয়ে উঠেছে। বিদেশে কর্মতর নারীরা বৈদিশিক মুদ্রা উপার্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। শহরাঞ্চলে রপ্তানিমূখী শিল্পকারখানা আর গ্রামঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী সমূহ চালু হওয়ার ফলে নারীর গতিশীলতা ও জনসমক্ষে উপস্থিতি বিস্ময়কর ভাবে বেড়েছে। তারা ব্যাপক ভাবে অপ্রচলিত পেশায় প্রবেশ করেছে। শ্রমবাজারে অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছে এবং সেই সূত্রে গৃহস্থালি পর্যায়ে নারীর মত প্রকাশের ক্ষমতা বাড়িয়েছে। বাড়তি আয়ের মাধ্যমে এটি দারিদ্র দূরীকরণে ও অবদান রাখছে। "বাংলাদেশের নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের হার প্রায় ৬৭ শতাংশ। মোট নারী শ্রমশক্তির ৭৮ ভাগ এখন কৃষিখাতে নিয়োজিত। দেশের সার্ভিস খাতে ১২ ভাগ এবং শিল্পখাতে প্রায় ১০ ভাগ নারী শ্রম শক্তি অবদান রাখছে। অন্যদিকে পারিবারিক কাজে ৮০ ভাগেরই বেশি হচ্ছে নারীর শ্রম। উল্লেখ্য যে, জাতীয় প্রবৃদ্ধি পরিমাপের প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতি পুরুষের উৎপাদনমূলক কাজের ৯৮ ভাগকেই হিসাবে ধরে কিন্তু নারীর উৎপাদনী কাজের মাত্র ৪৭ ভাগ এক্ষেত্রে গণনা করা হয়। ফলে পুরনো হিসাব অনুযায়ী জাতীয় আয়ে নারীর অবদান দাঁড়ায় ২৫ ভাগ। কিন্তু নারীর বাজার বহির্ভূত কাজ বা মজুরি বিহীন শ্রমকে জাতীয় আয়ে অন্তর্ভূক্ত করলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান বেড়ে দাঁড়াবে ৪১ভাগ।[৯]

গবেষণার ক্ষেত্রে শ্রমশক্তিকে বিভিন্ন খাতে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।

কৃষি ও নারী ঃ

সৃজনশীলতা নারীর সহজাত প্রবৃত্তি। তাই সৃষ্টির প্রথম থেকেই কৃষি ও নারীর সম্পর্ক সুনিবিড়। নারী সৃষ্টির আদিতে যখন প্রত্যক্ষ করল জঙ্গল থেকে আহরণ করা ফলের বীজটি ধীরে ধীরে বৃক্ষের রূপ লাভ করে একই ফল দিচ্ছে, তখন সে তার ও পরিবারের ক্ষুন্নি বৃত্তির এক সহজ উপায় পেয়ে গেল। সে বৃক্ষ রোপনের পথ পেয়ে গেল এবং তখন থেকেই

---

[৯] উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস বিশেষ নিবন্ধ সাইত্রিশতম সংখ্যা, এপ্রিল, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩২।

সন্তানের খাদ্য সরবরাহ করার উৎস হিসেবে কৃষি কাজকে বেছে নিল। সে শস্য, আবাদ করল, যত্ন নিল; কিন্তু যখন শস্য পাকলো এবং ঘরে উঠানোর সময় হল তখন সে সন্তান প্রসবের কারণে ফসল আহরণের কাজ থেকে দূরে থেকে সন্তানের যত্নে নিজেকে নিয়োজিত করল। এ সময় তার পুরুষ সঙ্গীর সাহায্যের প্রয়োজন হল। পুরুষ বাজারে শস্য নিয়ে গেল শস্যের বিনিময়ে অন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ঘরে নিয়ে আসল এবং তখনই পণ্যের নগদ বিনিময় মূল্য তার হাতে আসল, এতে শ্রম বাজারে নারীর এতদিনের পরিশ্রম চোখের আড়ালে নিমজ্জিত হল। নগদ বিনিময় মূল্য পুরুষ আপন হস্তগত করল এবং তখনই শরীরের জোরে সে প্রতিষ্ঠা করল পণ্য বাজারে নিজের প্রভুত্ব। এর ফলে ধীরে ধীরে সমস্ত শ্রম বাজার পুরুষের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল-নারী সন্তানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে গৃহিনীর আসনে নিজেকে আসীন করল। কৃষির শুরুতে পুরুষেরা। মূলত শারীরিক সামর্থযুক্ত কাজ বেশী করতো এবং নারীরা গৃহপরিচালনার সাথে সাথে কৌশলপূর্ণ কাজ বেশী করতো। এখানেই শ্রমবিভাজন প্রকট হয়ে দেখা দিল। আবার 'যেহেতু কৃষি ক্রমে পেশী শক্তির উপর নির্ভরতা কমিয়ে এনেছিল তাই আশা করা হয়েছিল লিঙ্গ বৈষম্য ক্রমে কমে আসবে। কিন্তু তা হয়নি, বরং পুরুষরা আধুনিক পদ্ধতিতে অর্থকারী ফসল উৎপাদনে থেকে যায় এবং নারীরা সনাতন পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে থেকে যায়। এভাবে ক্রমে কৃষি উন্নয়ন পরিক্রমায় পুরুষের শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারীরা পিছিয়ে পড়েছে।[১০]

নারীর জৈবিক পুন: উৎপাদন শীলতা পুরুষকে শ্রমবাজারে প্রভুত্ব বিস্তারে সুযোগ করে দিয়েছিল। 'নারীর শ্রম উৎপাদনশীলতার এই নিম্নমুখীনতা কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত তার মর্যাদাকে ও নিম্নমুখী করেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এশিয়ার একটি বড় অংশে নারীদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মজীবি জনসংখ্যা কৃষিকাজে নিযুক্ত। নারীরা এখাতে মুখ্য। কিন্তু এশিয়ার কৃষিখাতে ভূমির মালিকানা কাজের মূল্যায়ন এবং আয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য প্রকট। কৃষিতে প্রযুক্তির প্রবর্তন ও নারীদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কাজের চাপ কমে,

[১০] Easter Boserup, Women's Role in Economic Development, George Allen & Unwin Ltd, London, 1970.

এই বিষয়গুলো এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে উদ্বৃত্ত শ্রমের বাজারে নারীদের কর্মের সুযোগকে সীমিত করে তোলে।[১১]

তাছাড়া প্রযুক্তির বিকাশ যেহেতু সবক্ষেত্রে হয়নি তাই গৃহের অভ্যন্তরে কৃষি কাজের চাপ কমেনি, তাই এই সুযোগ নারী পুরুষের জন্য সমান ভাবে সুফল বয়ে আনতে পারেনি। কৃষি বিষয়ক জরীপ গুলো সাধারণত উৎপাদন ও ভূমি ব্যবহারকে ফোকাস করে, মানব সম্পদের ব্যবহার ও গৃহস্থালী কাজকে গুরুত্ব দেয় না।[১২]

Boserup এর মতে, একদম আদিম অবস্থাতে পরিবারের ক্ষেত্রে শ্রম বিভজনের ধারণা বিদ্যমান ছিল বয়সও লিঙ্গের ভিত্তিতে।"[১৩] Lourders Beneria ও Gita sen Boserup কে সমর্থন করে বলেছেন যে, শ্রমবিভাজনের লিঙ্গ হচেছ গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

পণ্য সামগ্রীর মূল্য সৃষ্টিতে নারীদের অবদান কৃষি উৎপাদন তথা শস্যকণা এবং ভাল প্রস্তুত প্রক্রিয়া এবং সংরক্ষণ আর পরিবার ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পে অংশ গ্রহণ হতে উৎসারিত। উভয় কাজের বেলায়ই অবশ্য পুরুষগণ কাজের যে পর্যায়ে দক্ষতা অর্জন করে যা জন সম্মুখে অর্থাৎ মাঠ, রাস্তা এবং বাজারে সংঘটিত হয়। নারীরা এ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে যখন এ কাজ পরিবারের গন্ডির মধ্যে সম্পাদিত হয়। খাদ্য উৎপাদন, রান্না, সন্তান পালন, গবাদি পশুর দেখাশোনার পারিবারিক পরিষ্কার পরিচছন্নতার কাজ শষ্য গুছিয়ে দেয়া ইত্যাদি কাজ এবং পারিবারিক মর্যাদা ও পর্দা প্রথা ইত্যাদি কারণে নারীকে ঘরে থাকতে হয়, ফলে পরিবারে প্রস্তুত সকল পণ্যই পুরুষের মাধ্যমে বাজারে বিক্রি হয়। শষ্য বাছাই সংরক্ষণ, যত্ন করা, ধানভানা, মাড়াই, ঝারা, কাড়া বাছা, গোলা জাতকরণ, উঠান নিকানো, রোদে শুকানো, অতঃপর তা আবার বাজারে বিক্রি করার জন্য বস্তাবন্দী করণ বা অন্য উপায়ে সাজিয়ে দেয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি (ক্ষেত্র বিশেষে অবস্থাপন্ন ঘরে কিছু বেতনভুক্ত সাহায্যকারীসহ) নারীর দায়িত্বে থাকলেও এটা সত্য যে, যে সময়ে নারীদের শ্রমশক্তির মূল্য অর্জিত হয় সে সময়ে তাদের অনুপস্থিতির কারণে তাদের অবদান সামাজিকভাবে অদৃশ্য থেকে যায়, তাদের শ্রমের ফলে সৃষ্ট পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় পুরুষের হাতে। এভাবে

[১১] The world's women-1995, Trends and statitics, A world Report, United Nations Publications, Newyork, 1995.
12 Ibid.
[১৩] (Boserup, Easter, Women's Role in Economic Development, London, 1970).

ধানকে খাদ্যোপযোগী চাল প্রস্তুত করণে নারীর অবদান শতকরা ৬০ ভাগ, কিন্তু এক্ষেত্রে গৃহাভ্যন্তরে শ্রেণী বিভাজন নারীকে সম্পদের উৎস থেকে পৃথক করে রাখে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে পুরুষের উপর। নারীর এই অর্থনৈতিক অধস্তনতা নারী পুরুষের মধ্যে অসম সম্পর্কের জন্ম দেয়। আদমশুমারী ও শ্রমশক্তির জরীপে যদিও জনসংখ্যার কাজকে ব্যাপকভাবে দেখা হয় তবু তাতে নারীদের শ্রম প্রতিবেদনভুক্ত করা হয় না। কারণ তাদের অধিকাংশ কাজই অ-মজুরীপ্রাপ্ত ও গার্হস্থ্য সংক্রান্ত। কিন্তু কয়েকটি পরিসংখ্যানে নারীদের অদৃশ্য কাজের ব্যাপ্তি তুলে ধরা হয়েছে ১৯৯১ এ ভারতীয় শুমারীতে ৭৩% গ্রামীণ নারী অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় নয়। কিন্তু ১৯৮৭-৮৮ সনের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জরীপে দেখা যায় ৬০% গ্রামীণ এবং ১৫% শহুরে নারী জ্বালানী সংগ্রহ, বাগান, রান্না এবং পশুপালনে ব্যস্ত থাকে যা অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে জরীপে আসে না। তাছাড়া ৫২% গ্রামীণ নারী ও ৯% শহুরে নারী গোবর সংগ্রহ করে জ্বালানীর জন্য এবং ৬৩% গ্রামীণ ও ৩২% পৌর নারী বাইরে থেকে পানি সংগ্রহ করে। এস, এন ও এবং আই, এল ও সুপারিশ অনুযায়ী এগুলো সবই অর্থনৈতিক কাজ। পাকিস্তানে মহিলাদের অফিসিয়াল অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ৩% (৮০ সনের জনসংখ্যা জরীপ) থেকে ১২% (একই বছরের শ্রমশক্তি জরীপ) এ পার্থক্য দেখা যায়। ১৯৮০ সনের কৃষি জরীপ অনুযায়ী ৭৩% নারী কৃষি সংক্রান্ত গ্রার্হস্থ্য কাজের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাজে সক্রিয়। ১৯৯০/৯১ এর শ্রমশক্তি জরীপে নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের হার ৭% যখন প্রশ্নপত্র হয় গতানুগতিক অথচ যখন প্রশ্নপত্র হয় নির্দিষ্ট কাজ ভিত্তিক যেমন, ধান রুপান্তর, বীজ সংগ্রহ প্রভৃতি তখন এই হার ৩১%। বাংলাদেশে ১৯৮৫/৮৬ সনের শ্রমশক্তি সংগ্রহ প্রভৃতি তখন এই হার ৩১%। বাংলাদেশী ১৯৮৫/৮৬ সনের শ্রমশক্তি জরীপে নারীর হার ১০%। কিন্তু যখন ১৯৮৯ সনের শ্রমশক্তি জরীপে প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট কাজভিত্তিক হলো তখন অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের হার গিয়ে দাড়ালো ৬৩% এ।[১৪]

অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরুষতান্ত্রিকতার ফাঁদে পরিসংখ্যানগত তথ্যের মধ্যেও নারীর অবস্থানকে পিছিয়ে রাখা হয়। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কৃষিতে নারীর অবস্থান সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

---

[১৪] Ibid, P-114.

Dhaka University Institutional Repository

১. কৃষি সংক্রান্ত গার্হস্থ্য কাজের মূল্যায়ন না করা।

২. নারীর শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থে পুরুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা।

৩. ভূমির মালিকানাতে নারীর অংশীদারিত্বের অভাব।

৪. শ্রমশক্তি জরীপের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মানদন্ড অনুসরণ না করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ক্ষেত্রে জটিলতার কারণেই মূলতঃ নারী কৃষি খাতে পশ্চাৎ পদ অবস্থানে রয়ে গেছে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনা দশকে দাঁড়িয়ে তাই আমাদের এক্ষেত্রে নুতন করে ভাবনার সময় এসেছে। আমাদের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাই পুরান সব পশ্চাৎপদ ধারণা ও সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত হতে হবে নারীকে সমাজের প্রান্তিকতায় ঠেলে না দিয়ে উন্নয়নের মূলধারায় তাদের অবদানকে বিবেচনা করতে হবে।

গার্হস্থ্য কাজ ও মজুরীলব্ধ শ্রমের তুলনামূলক পরিমাপঃ

নারীর কর্মক্ষেত্র হচেছ তার গৃহস্থালী অপরদিকে পুরুষের কর্মক্ষেত্র হচেছ সমাজের বৃহত্তর পরিসর-এ ধারণা বিনির্মাণ করেছেন এদেশের অনেক নারী। আর উন্নয়নের সাথে সাথে এ গতানুগতিক ধারণার পরিবর্তনের প্রয়াস ও সর্বত্র লক্ষনীয়। বাংলাদেশের নারীরা গৃহস্থালির বাইরে আসতে পারবে না এ ধারণা সত্য নয়, গৃহস্থালীতেই নারীর অবস্থান হবে এ ধারণা ভেঙ্গে তারা বেরিয়ে এসেছে।[১৫]

নারীরা একই সঙ্গে গার্হস্থ্য কাজ ও মজুরীলব্ধ কাজ করছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি কাজ মৎস্য চাষ, রাস্তা নির্মাণ, মাটি কাটা থেকে শুরু করে রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ পর্যন্ত তারা করছে। তারা সম্পৃক্ত হচেছ জাতীয় শ্রমশক্তিতে। আর শ্রমশক্তির বিভিন্ন খাতের আলোচনায় অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হলো গার্হস্থ্য কাজ ও মজুরীলব্ধ শ্রমের তুলনামূলক পরিমাণ। "পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। পৃথিবীর তিনভাগের দুইভাগ কাজ তারা করেন। কিন্তু পৃথিবীর মোট আয়ের দশভাগের একভাগ পান তারা।[১৬]

বিশ্বব্যাপী শ্রমশক্তির হিসেবে নারী পিছিয়ে থাকে কর্ম মূল্যায়ন পরিমাপের ভিন্নতার কারণে, সামাজিক ব্যবস্থায় দীর্ঘ সময়ের প্রচলিত মূল্যবোধের কারণে নারী ও পুরুষের জন্য কিছু

---

[১৫] White C Sarah, Arguing with the Crocodile; Gender and Class in Bangladesh-1992.
[১৬] ILO, Report to Copenhegen Mid decade conference on women-1980.

স্বতন্ত্র কর্ম পরিধি রয়েছে। লিঙ্গ বিভাজন কর্মের বিভাজন তৈরী করে অসমতার প্রেক্ষিত তৈরী করে ও টিকিয়ে রাখে।

জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে-" অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রে পরিবার ও কাজ এক সংগে জড়িত থাকে। অধিকাংশ পুরুষের জন্য কাজ অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ীর বাইরে থেকে আয় উৎপাদনকারী চাকুরী।[১৭]
অর্থাৎ নারীর জন্য কর্মের পরিধি ব্যাপক কিন্তু তার মূল্য কম। অন্যদিকে পুরুষের কর্ম এলাকা নির্দিষ্ট ও সীমিত অথচ মূল্য বেশী। কর্মের হিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সময়ের বাবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে দেখা গেছে অধিকাংশ রাষ্ট্রে নারীরা সপ্তাহে ৩০ ঘন্টা বা আরো বেশী সময় গার্হস্থ্য কাজে ব্যয় করে, যেখানে পুরুষেরা সপ্তাহের ১০-১৫ ঘন্টা ব্যয় করে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে এই হার বেশী।[১৮]

আগে নারীর এই মজুরীবিহীন শ্রমের কোন হিসাব থাকত না বা এর কোন শ্রম মূল্য বা পরিসংখ্যানগত হিসাব থাকত না। কিন্তু বর্তমানে অনেক প্রতিবেদনে তা অন্তর্ভূক্ত হচেছ। "গবেষণায় দেখা গেছে, যখন গৃহের মজুরীবিহীন অর্থনৈতিক কাজকে হিসাবে নেয়া হয় তখন নারীরা বিশ্বের শ্রমের ৫৫% সম্পন্ন করে। অর্থাৎ নারীর গার্হস্থ্য কাজও গৃহের বাইরে কর্মক্ষেত্রের কাজ সংযুক্ত হলে বিশ্বের শ্রমশক্তির অর্ধেকের বেশী নারীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। সময়ের পরিবর্তনে অনেক নারী গার্হস্থ্য কাজের পাশাপাশি মজুরীপ্রাপ্ত শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত হয়েছে। ১৯৯৪ সনে উন্নয়নে নারী শীর্ষক বিশ্ব জরীপে দেখা গেছে আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীদের নজিরবিহীন অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ১৯৯০ এ বিশ্বব্যাপী ৮৫৪ মিলিয়ন নারী অর্থনৈতিক ভাবে সক্রিয় যা বিশ্ব শ্রমশক্তির ৩২%। ১৫ বছর বা তার উর্ধ্বে নারীরা শ্রমশক্তিতে আছে যা সকল নারীর এক তৃতীয়াংশ।[১৯]

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ রয়ে গেছে পূর্বের মতই সম্পূর্ণ পুরুষসুলভ এবং সম্পূর্ন ভাবে নারীর জীবন বিমুখ। ফলে নারীকে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয় প্রাইভেট ও পাবলিক স্পেসের কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে এবং এর অনিবার্য পরিণতি হলো নারীর জন্য

---

[১৭] The Worlds Women 1995-Trends and statistics A world Report, United Nations Publications, Newyork, 1995.
[১৮] Ibid.
[১৯] Women and Economic decision making, Women looking beyond 2000, United Nations Publications.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈত কার্যদিবসের বোঝা বহন।[২০] গৃহস্থালীর বাইরে অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত হওয়া সত্ত্বেও নারীকে গৃহস্থালী পরিচালনার দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে পালন করতে হয়। তাই দেখা যায় কর্মজীবী ও ব্যবসায়ী নারীদের একই সঙ্গে ঘরে ও বাইরের কাজে দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে গিয়ে পরিবারের সব ধরণের কাজে অংশগ্রহণের বিষয়টি কিছুটা হলেও ব্যাহত হয়, যার জন্যে পরিবারের মধ্যেও নারীকে দেন দরবার করতে হয় নিজস্ব কৌশল ব্যবহার করে। আবার কর্মক্ষেত্রে একই পদমর্যাদা সম্পন্ন অথবা একই কাজ করলেও অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীরা নারীদের তাদের যোগ্য মর্যাদা দিতে কুন্ঠাবোধ করে, কিংবা কখনও কখনও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন নারী সহকর্মীর অধীনে কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করে কিংবা তাদের কতৃত্ব বা আদেশ মেনে নিতে নিরুৎসাহিত থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে তারা তাদের এড়িয়ে চলে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে নারী কর্মজীবীরা তাদের পুরুষ সহযোগী বা সহকর্মীদের কাছ থেকে যথোচিত মর্যাদা পান না। এক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীদের অনেক সময় হীনমন্যতায় ভুগে থাকেন। এ ধরণের আচরণগুলি নিছক পুরুষ সুলভ বা পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিনিধিত্ব করে। অনেক সময় কর্মজীবী নারী কর্মক্ষেত্রে কিংবা পাবলিক স্পেসে পুরুষ কর্তৃক বিভিন্ন রকম অনুচিত ব্যবহারের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। কখনও তারা নিগৃহীত লাঞ্চিত অশালীন মন্তব্য, কুরুচীপুর্ণ আচরণ ইত্যাদির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। অনেক সময় তাদেরকে বিভিন্ন হুমকীরও সম্মুখীন হতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী, কিংবা বিভিন্ন ধরণের চাকুরিজীবী নারীদের তা এই পুরুষের সাথে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে দেন দরবার করে চলতে হয় কখনও বা কর্মক্ষেত্রে নিজের চলাফেরার সুবিধার জন্য বা নির্বিঘ্ন করার জন্য, আবার কখনও বা যৌন হয়রানীর মোকাবেলা করার জন্য। এসব সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাদের কিছু বাড়তি কাজ বা সময় ব্যয় করতে হয়। ঘরে বাইরে সর্বত্র প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলতে হয়। ঘরে বাইরে সর্বত্র তাকে প্রতিনিয়ত প্রমাণ দিতে হয় যে সে তার সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্য-কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে অধিক যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়। নারী তাই কখনো কখনো অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা স্বাধীনতা পেলেও সামগ্রিকভাকে কাজের চাপে আরো বেশী শোষিত হচ্ছে। নারীদের এই অধিক কাজের বোঝার উদাহরণ নীচের ছকটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

---

[২০] Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩.১৪ তিনটি দক্ষিণ এশিয় রাষ্ট্রের সময়ের ব্যবহার, ১৯৮৯/৯২

অর্থনৈতিক কাজের সপ্তাহব্যাপী শ্রম ঘন্টা

	বেতনভুক্ত	জীবন ধারণযোগ্য	মোট	গৃহস্থালী কাজে সপ্তায় শ্রম ঘন্টা	সপ্তাহে মোট শ্রমঘন্টা
বাংলাদেশ বয়স ৫+					
নারী	১৪	৮	২২	৩১	৫৩
পুরুষ	৩৮	৩	৪১	৫	৪৬
ভারত বয়স ১৮+					
নারী	২৮	৭	৩৫	৩৪	৬৯
পুরুষ	৪৩	৪	৪৭	১০	৪৭
নেপাল বয়স ১৫+					
নারী	১৮	১৭	৩৫	৪২	৭৭
পুরুষ	২৯	১২	৪১	১৫	৫৬

সূত্রঃ World's Women 1995, Page 108.

সুতরাং এতক্ষণ আলোচনার প্রেক্ষিতে নারীর গার্হস্থ্য শ্রম এবং বাইরের কর্মক্ষেত্রের শ্রমের তুলনামূলক পরিমাণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় আলোচনায় এসেছে। এগুলো হলো-

১. অর্থনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকল গার্হস্থ্য কাজের কর্মের অন্তর্ভূক্তকরণ না হওয়া।

২. কর্মের স্বীকৃতি প্রাপ্ত মজুরীবিহীন কাজকে প্রতিবেদনভুক্ত করার নিশ্চয়তা সৃষ্টি না হওয়া।

৩. প্রাইভেট ও পাবলিক স্পেস উভয় ক্ষেত্রে কাজের স্বীকৃতি ও পরিমাপের স্পষ্টতা না থাকা।

৪. নারীদের বাড়ীর বাইরে কাজ করার ব্যাপারে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কিংবা অনুকূল পরিবেশ না থাকা।

৫. পাবলিক স্পেসের কাজের পরিবেশ নারীর প্রতি সংবেদনশীল না হওয়া।

৬. নারীর পরিবর্তিত ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে তার গার্হস্থ্য কাজে পুরুষের সহযোগিতা না থাকা।

এই বিষয়গুলো উন্নয়নে নারীর যথাযথ ভূমিকা নির্ণয়ে সীমাবদ্ধতা তৈরী করে।

শ্রমবাজারে প্রবেশ এবং প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণঃ

বাল্য বয়স থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত নারীকে নানা রকম কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। আধুনিক অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীকে বাড়তি কিছু কাজ করতে হচেছ। আর তা হল শ্রমবাজারে নিজেকে অন্তর্ভূক্তকরণ। আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীর প্রবেশের ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে পুরুষেরা দিনমজুরী কাজের সন্ধানে নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যায় এবং তখন নারীরা এমন ধরণের কাজে নিযুক্ত হয় যা আগে সাধারভাবে পুরুষেরা করতো।[২১]

পরবর্তীতে এই ধারা আরো গতিশীল হয় এবং এই ধারাবাহিকতা এখনো বর্তমান। যেসব রাষ্ট্রে পুরুষরা ব্যাপক হারে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন (Migrate)করেছে এবং যেখানে শিক্ষা ও চাকুরীর সুযোগ বেশী সেখানে নারীদের পাবলিক স্পেসে প্রবেশের হার বেশী। পাশাপাশি নারী প্রধান পরিবারে অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য নারীদের চাকুরী খুঁজে নিতে হয়েছে। এছাড়া উন্নয়ন মনস্কতা, চাহিদা, দারিদ্র ইত্যাদি মেটাতে গিয়েও নারীকে ব্যাপক হারে শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে হয়েছে। সুতরাং বলা যাচেছ যুগের প্রয়োজনে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন, পরিবর্তনের আলোকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি পরিবর্তনের ফলে নারীদের শ্রমবাজারে প্রবেশের প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীর প্রবেশের আরেকটি টার্নিং পয়েন্ট হলো ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে নারীর প্রবেশাধিকার। ৮০'র দশকের শুরুতে অনেক ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান স্বল্প আয়ের নারীদের অন্তর্ভূক্ত করলো এবং পরিবর্তনের এক সম্ভাবনাময় বাহক হিসেবে তাদের আবিস্কার করলো। কারণ অভিজ্ঞাতায় দেখা যায়, স্বল্প আয়ের নারীরা যদি বাজারে নির্ধারিত সুদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রবেশাধিকারের সুযোগ পায়, তাহলে তারা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে এবং তাদের নিজেদের আয় এবং সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। এ-ও দেখা গেছে নারীরা তাদের নিজের আয় এবং সম্পদ বৃদ্ধির পর তাদের পরিবারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্ঠি বৃদ্ধিতে তা ব্যবহার করে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভাবে অগ্রণী কয়েকটি ক্ষুদ্র ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রমে নারীদের ব্যাপক হারে অন্তর্ভূক্ত

---

[২১] Easter Boserup, Women's Role in Economic Development, George Allen & Unwin Ltd. London, 1970.

Dhaka University Institutional Repository

করছে নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং উন্নয়নের নিশ্চয়তার সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে।[২২]

মাইগ্রেশন ক্ষুদ্র ঋণ ইত্যাদি নারীদের শ্রম বাজারে প্রবেশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তখন নারীদের অর্জিত যোগ্যতাকে দমিয়ে রাখা ও প্রাপ্য অধিকারকে দমন করে শ্রমবাজারে নারীর প্রবেশাধিকারকে সীমিত করার ঘটনাও ঘটছে। অর্থাৎ শুধু গৃহের বাইরে প্রবেশের সুযোগ তৈরি হয়নি এর বিপরীত চিত্র ও বিরাজ করছে। বিভিন্ন উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ও পূর্ব ইউরোপের পরিবর্তন শীল সময়ে দেখা গেছে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও সরকারী ব্যয়ের সংকোচন অনেক ক্ষেত্রে নারীদের কাজের সুবিধা হ্রাস করছে। কখনো কখনো জোর করেই নারীদের শ্রমবাজারের বাইরে রাখছে।[২৩]

শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের সুযোগ উন্নয়নে অংশীদারিত্ব অর্জনের অন্যতম বাহক। তবু আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও লিঙ্গ সমতা ভিত্তিক দিক নির্দেশনা না থাকার কারণে আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীর প্রবেশাধিকার সীমিত ও অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

বিভিন্ন খাতে শ্রম বিনিয়োগ ঃ

যুগ পরিক্রমায় কর্মের বিভিন্নক্ষেত্রে যথা প্রশাসন, শিক্ষাঙ্গন, বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ কল্যাণ, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, বীমা করপোরেশন, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা কৃষিকার্য ইত্যাদি ছোট-বড় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চিকিৎসা , ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনলজির ক্ষেত্রেও তাদের স্থান নেহায়েত নগণ্য নয়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নারীরা ভিন্ন ভিন্ন খাতে শ্রম বিনিয়োগ করে। নারীদের ক্ষেত্রে মজুরী প্রাপ্ত ও মজুরীবিহীন শ্রম বিনিয়োগে খাত অনুযায়ী ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সকল ক্ষেত্রেই লিঙ্গ বৈষম্য প্রকট আকারে- লক্ষ্যনীয়। কৃষি, শিল্প চাকুরী খাতে শ্রমশক্তির বন্টণে অধিকাংশ অঞ্চলে লিঙ্গ বৈষম্য লক্ষ্যনীয়। পূর্ব ইউরোপের বাইরে উন্নত অঞ্চল এবং ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল প্রায় ৭৫% শ্রমশক্তির নারী কাজ করছে সার্ভিস সেক্টরে। সাব সাহারা আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে কম অংশ নারী-পুরুষ

[২২] The World's Women 1995-Trends and statistics op. cit.
[২৩] Chapter : Girls and Women, UNICEF annual Report, 1996.

চাকুরিতে নিযুক্ত। এই হার সাধারণত ৩০% এর কম। দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত শিল্প প্রতিষ্ঠানে নারীদের চেয়ে পুরুষের নিয়োগ বেশি হয়।

সাব সাহারা অঞ্চলে বিশেষত: নারীদের জন্য কৃষিই হচেছ মূল শ্রমশক্তি। এখানে প্রায় ৭৫% নারী কৃষিতে নিযুক্ত এবং দক্ষিণ এশিয়ার ৫৫% নারী কৃষিতে নিযুক্ত। এই দুই অঞ্চলের ক্ষেত্রেই কৃষিতে নিযুক্ত অনেক নারী মজুরী প্রাপ্ত শ্রমশক্তিতে নেই, যারা কৃষি সংক্রান্ত মুজরী বিহীন কাজ করছে। অনেক নারী বাইরে যাবার সুযোগের অভাবে কৃষি ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে আত্মকর্মস্থান মূলক কাজে নিযুক্ত থাকে। সাব সাহারা, আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ায় শিল্পখাতে ২০% এবং ও কম নারী নিযুক্ত। কয়েকটি ব্যক্তিক্রম হচ্ছে মালয়েশিয়া (২৬%) হন্ডুরাস (৩৪%,) ম্যাক্সিকো (৩৫%), এর সিঙ্গাপুর (৪২%)। যখন বেতনপ্রাপ্ত চাকরির সুযোগ অপ্রতুল থাকে তখন অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত দেখা দেয়। আফ্রিকার দেশগুলোতে এই প্রবনতা বেশী। পশ্চিম এশিয়ায় ১০% এর কম নারী এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকলে ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে এই হার বেশি। কোরিয়ায় ৪১% ইন্দোনেশিয়ায় ৬৫% নারী অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত আছে।[২৪]

৩.২.২ রাষ্ট্রীয় সুযোগ অধিকারের বৈষম্য:

মানবাধিকারের ধারণা জাতিসংঘের ধারণারও আগে। তবুও জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মানবাধিকার আনুষ্ঠানিক ও সার্বজনীন স্বীকৃত লাভ করে। "জাতিসংঘ জুন ১৯৯৩ সালে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনের আন্দোলনের আয়োজন করে। এর আগে ১৯৬৮ সালে ইরানের তেহরান মানবাধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ২৫ বছরে এটি হচ্ছে মানবাধিকারে সম্পর্কিত প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্মেলন। এই সম্মেলনের মূল এজেন্ডা ছিল:

- ১৯৪৮ সালে মানবাধিকাররের সার্বজনীন ঘোষনা পত্র গৃহীত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কি অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার ওপর সাধারণত বিতর্ক;

[২৪] Chapter : Girls and Women, UNICEF annual Report, 1996.

Dhaka University Institutional Repository

- ➢ উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের পরিপ্রেক্ষিত সার্বজনীন ভাবে মানবাধিকার উপভোগ বিবেচনা করা;
- ➢ নারীও পুরুষ এবং সবচাইতে বেশি ক্ষতির মুখোমুখি (valnerable) গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যে নতুন চ্যালেঞ্জ সমূহ দেখা দিয়েছে তা বিবেচনা করা।

বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনের ফলস্বরূপ যে দলিলটি বের হয়ে এসেছে তা হচ্ছে VIENNA DECLARATION বা ভিয়েনা ঘোষনা পত্র ঘোষণা পত্রটিতে ১৩৯টি অনুচ্ছেদ রয়েছে যার মধ্যে ১৩টি বিশেষ ভাবে নারী ও বালিকা সম্পর্কিত।[২৫]

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনা পত্রে নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী সবার সমান সুযোগ ও অধিকারের উপর জোর দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নারী পুরুষ সকলের কিছু সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী নারীরা এইসব সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখন ও পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা মালিকানা রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ, প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা এখন পশ্চাশৎপদ বা প্রান্তিক পর্যায়ে অবস্থান করছে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষার সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী ও পুরুষ ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণের মধ্যে একটি উচ্চ ইতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এটাও দেখা গেছে, বর্তমানে নারী ও পুরুষের শিক্ষা ব্যবধান ব্যাপক। শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা যায় এখন পর্যন্ত বিশ্বের নিরক্ষরের মধ্যে নারী দুই-তৃতীয়াংশ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য অকেকাংশে কমে এসেছে। ২০০৫ সালের মধ্যে এই বৈষম্য সম্পূর্ণ রোধ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী নারীদের ভর্তির হার উল্লেখ যোগ্যভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে (website)। তবে বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলেই তা পুরুষের তুলনায় কম। পাকিস্তানের মাহবুবুল হক মানব উন্নয়ন কেন্দ্র প্রণীত 'দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন ২০০৫' বিষয়ক রিপোর্টে বলা হয় দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে প্রতিদিন নূন্যতম ৫০৭ জন গর্ভবতী নারীর মৃত্যু হচ্ছে (ইত্তেফাক, ২৬ জানুয়ারী, ২০০৭) স্বাস্থ্যখাতে দেখা যায়, নারীদের মধ্যে মাতৃমৃত্যু হার অনেক বেশি। তাছাড়া নারীরা পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরণের

[২৫] নারী ও মানবাধিকার, বাংলাদেশ ও বিশ্বপ্রেক্ষিত, ইনস্টিটিউট ফর ল এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট/নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইন শিক্ষা (পুস্তিকা-২, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫), পৃঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসবজনিত জলিতার ভোগে। অধিকাংশ নারী পুরুষের তুলনায় অধিক হারে পুষ্টিহীনতায় ভোগে।

সম্পত্তির ক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষের তুলনায় কম অংশের মালিকানা পায়। নারীদের জন্য বর্তমান সময়ে আরেকটি অত্যন্ত বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে মৌলবাদের উত্থান। মৌলবাদ সামগ্রিক উন্নয়নের বিপরীতে অবস্থান করলেও নারীরা এর প্রধান শিকারে পরিণত হচ্ছে। আধুনিকায়নের পাশাপাশি লক্ষণীয় যে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আফগানিস্থানের তালেবানী শাসন সে দেশের নারীদের একটি সম্পূর্ণ প্রজন্মকে অব উন্নয়নের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে পর্যায়ক্রমে। শিক্ষা কর্মসংস্থান বহির্জগতে প্রবেশধিকার সবদিক থেকে রুদ্ধ করে নারীদের ফিরিযে নেয়া হয়েছে প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগীয় সমাজে। ফলে একটি জাতি পশ্চাৎপদতার আর্বতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারীরা বিশেষ ভাবে বৈষম্যের সম্মুখীন হয়। রাজনৈতির পুরুষ সুলভ পরিবেশ নারীদের জন্য বিরূপ পরিস্থিতি তৈরি করে। পুরুষতান্ত্রিতা রাজনীতিতে নারীদের স্বাভাবিক অবদানকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে বিভিন্ন ভাবে তার অধিকার, বিকাশ, স্বাভাবিক চলাচল ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তাদের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সামাজিক রাষ্ট্রীয় সকল ধরণের সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী অনগ্রসর অর্থাৎ পশ্চাৎপদ অবস্থানে রয়েছে। আর সকল ক্ষেত্রে এই পশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে রাষ্ট্রীয় নীতির অভাব।

উন্নয়নের নারীর অবস্থান ও প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করা সুবিধার্তে বিশ্ব পর্যায়ের আলোচনায় বিভিন্ন আঙ্গিকে নারীর বর্তমান সীমাবদ্ধ আবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে। অহ-রাত্রি নারীর দেয়া বিপুল শ্রম এখন ও পর্যন্ত রয়েছে অস্বীকৃত। বিভিন্ন কারণে ও পেক্ষাপটে সীমিত আকারে শ্রমবাজারে নারীর অনুপ্রবেশ ঘটলে প্রকৃত পক্ষে সম-সুযোগ ও অধিকার অর্জন করতে পারেনি। মজুরী বৈষম্য, কর্মক্ষেত্রে বিরূপ পরিবেশ, কাজের ধরণের পাথর্ক্য পেশাগত ভিন্নতা সব মিলিয়ে নারী উন্নয়নে কাঙ্খিত সাফল্য পায়নি। প্রথমত নারী যথাযথ অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত নারী উন্নয়নের সুফল সমানভাবে

ভোগ করতে পারেনি। এর ফলে উন্নয়নে নারীর সম-অধিকার ও সম অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তবে আশার কথা বিশ্বব্যাপী নারীর এই অসম অবস্থান নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে এই অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগে চলছে এবং এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করছে গণমাধ্যমের প্রচার প্রচারণা। নারী উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং তাদের পশ্চাৎপদ অবস্থান থেকে মুক্ত করে আনার ক্ষেত্রে সর্বত্র যে প্রয়াস চলছে। এ ব্যাপারে সবোর্চ্চ আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের ভূমিকা জানা একান্ত প্রয়োজন। তাই গবেষণার এ পর্যায়ে নারী উন্নয়নের জাতিসংঘের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।

৩.৩ উন্নয়নে নারী ঃ জাতিসংঘের অবস্থান

সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ নানা ধরণের কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে শুরু থেকে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের কেন্দ্রস্থল এইপ্রতিষ্ঠান নারীর সম্পর্কে কী ধরণের কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে কিংবা কী ভাবছে এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা এ পর্যায়ের বিশ্লেষণ করা হল।

৩.৩.১ জাতিসংঘ চার্টারে নারী ঃ

জাতিসংঘ সমগ্র বিশ্বের মানুষের শান্তি সহযোগিতা, সহমর্মীতা, উন্নয়ন ইত্যাদির লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে- যা জাতিসংঘ চার্টারে বিধিবদ্ধ রয়েছে। 'জাতিসংঘ চার্টার' একটি আন্তর্জাতিক দলিল। জাতিসংঘ চার্টারে লিঙ্গ ভেদে সমতা বা জেন্ডার সমতার সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছেঃ The peoples of the united nations determine to reaffirm faith the fundemental human rights in the only dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women......'' (Hilkka Pietila and Jeanne Vickers Making Women Matter: The role of the UN. United Nations Publications. চার্টারের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, জাতিসংঘের লক্ষ্য হচ্ছে গোত্র, লিঙ্গ, ভাষা কিংবা ধর্মভেদে কোন পার্থক্য না করে মৌলিক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের প্রতি সম্মান রক্ষায় উৎসাহ ও পৃষ্ঠ পোষকতা দানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন করা ১৯৪৮ সনে গৃহীত সার্বজনীন

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার ঘোষনায় বলা হয়েছে সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় ধারায় আরো স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, কোন রকম পার্থক্য না করে যেমন গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষাভেদ না করে প্রত্যেককে এই ঘোষণায় সকল অধিকার ও স্বাধীনতার সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে।[২৬] উপরিউক্ত ধারা দুটো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জাতিসংঘ চার্টারে নারীর প্রতি কোন ভাবেই লিঙ্গ বৈষম্য করা হয়নি বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

৩.৩.২ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনও নারী দশক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা এবং ঔপনিবেশিকতার পতনের ফলে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের নারী সমাজের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক মুক্তির ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ১৯৭৫ এ মেক্সিকো সিটিতে ও ১৯৮০ তে কোপেহেগেন বিশ্ব সম্মেলন এবং সাম্য উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক নারী দশক পালন (১৯৭৬-১৯৮৫) জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায় নারীদের অবস্থান বা মর্যাদার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ দূর করার পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

১৯৭০ এর প্রথম দিকে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার প্রচেষ্টা এবং সমাজে নারীদের সমান অংগ্রহণের নিশ্চয়তার জন্য সকল পর্যায়েই উদ্যোগ নেওয়া হয়।[২৭] সমতা ও মানবাধিকারে নারীর অবস্থান স্বীকৃত হয় জাতিসংঘের নারী দশক উন্নয়নের এক কেন্দ্রীয় ইস্যু হিসেবে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ১৯৭৯ সনের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ৩৪তম সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত দলিল (CEDAW)।[২৮]

এই প্রচেষ্টা সমূহ আবার অনুপ্রাণিত হয়েছে এই সচেতনতাবোধ থেকে যে, নারীর প্রজনন (REPRODUCTIVE) এবং উৎপাদন (PRODUCTIVE) ভূমিকা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আইনগত, শিক্ষা এবং ধর্মীয় অবস্থার সাথে ঘনিষ্ট ভাবে

---

[২৬] Ibid.

[২৭] এ্যাডভোকেট শাহীন আখতার মুনীর, "নারী ও মানবাধিকারঃ বাংলাদেশ ও বিশ্বপ্রেক্ষিত" নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইন শিক্ষা পুস্তিকা-২, পৃঃ ৩৬ (অনূদিত)।

[২৮] আয়শা খানম, বেইজিং কর্ম পরিকল্পনা (অনূদিত)।

সম্পর্কযুক্ত যা নারীর অগ্রগতিতে বাধা প্রদাণ করেছে এবং এসকল কারণ সমূহ নারীর অর্থনৈতিক শোষণ, প্রান্তিকতা এবং বঞ্চনাকে ঘনিভূত করেছে; পরিবার সম্প্রদায়গত জাতীয় উপআঞ্চলিক আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রমাগত অসাম্য, অন্যায় এবং শোষণের অবস্থা থেকে বাস্পায়িত হয়েছে।[২৯]

সাধারণ পরিবদ ১৯৭২ সালে ৩০১০ সিদ্ধান্ত প্রস্তাবে ১৯৭৬ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। আর এই ঘোষণার মূল লক্ষ্য ছিল এই বছরে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা উন্নয়নের জন্য সমাগ্রিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় নারী সমাজকে পুরোপুরি ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং বিশ্ব শান্তিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নারীর অবদানকে বাড়ানোর জন্য এই বর্ষের সকল কার্যক্রমকে ঘণিভূত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের উদ্দেশ্য সমূহকে বাস্তবায়িত করা জন্য ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো সিটিতে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব কর্মসূচী (World Plan of Action) গৃহীত হয়। এ সময়ই সাধারণ পরিষদ সাম্য, উন্নয়ন ও শান্তির সাথে শিক্ষা , কর্ম নিয়োগ এবং স্বাস্থ্য এই তিনটি Sub-Theme কে অন্তর্ভূক্ত করে ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে বিশ্ব সম্মেলন আহবান করে। এই সম্মেলনের উদেশ্য ছিল নারী দশকের প্রথমার্ধে অর্জিত অগ্রগতিকে পর্যালোচনা ও মুল্যায় করা । ১৯৭৯ তে প্রকাশিত UNITER রিপোর্ট শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে নারী ও প্রযুক্তি'-তে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে প্রযুক্তির উন্নতিতে নারীদের জন্য কি সমস্যা তৈরী হয়েছে তার ব্যাখ্যা হয়েছে। "১৯৮০ সালে নারী দশকের মাঝামাঝি সময়ে কোপেন হেগেনে বিশ্ব সম্মেলনে জাতিসংঘের নারী দশক; সাম্য, উন্নয়ন ও শান্তির দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যমান বাধা সমূহ এবং নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঐক্যমতের ওপর ভিত্তি করে বিস্তৃত কর্মসূচী (PROGRAMME OF ACTION) গ্রহণ করে। এই কর্মসূচী বা PROGRAMME OF ACTION কে সাধারণ পরিষদ একই বছরে ৩৫/১৩৬ প্রস্তাবের মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত করে। এ বছরেই সাধারণ পরিষদের, ৩৪/৩৬ সিদ্ধান্তে তৃতীয় জাতিসংঘ উন্নয়ন দশকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মকৌশল (International Development Strategy) গ্রহণ করে এবং কোপেন হেগেন বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশ সমূহকে পুনঃব্যক্ত (Reaffirm) করেছে। এই কর্মকৌশল, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়

---

[২৯] এ্যাডভোকেট শাহীন আখতার মুনীর, প্রাগুক্ত, ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধি (Agent) ও উপযোগভোগী (Beneficiaries) এই দুই ভাবেই নারীর অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে।[৩০]

PROGRAMME OF ACTION ও WORLD PLAN OF ACTION উল্লেখিত কৌশলসমূহ নারী সমাজের ভবিষ্যত প্রক্ষিতে বৃহত্তর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ১৯৮২ তে নেদার ল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। 'উইম্যান এন্ড দি ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক অর্ডার' এর উপর এনজিও কনফারেন্স। তাতে বলা হয়, উত্তর ও দক্ষিণ উভয়ের জন্য এখন আমাদের প্রয়োজন আরেকটি উন্নয়ন। নারীদের স্বার্থও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। শুধুমাত্র তখনই উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক টার্ম হিসেবে বিবেচ্য হবে না, বরং মানবিক বিষয় হিসেবে বিবেচ্য হবে।[৩১]

১৯৮৫ এর নাইরোবী কনফারেন্সকে সামনে রেখে সংগঠিত হয় 'উন্নয়নে নারী' শীর্ষক বিশ্ব জরীপ। সাধারণ পরিষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী এ জরীপে যে সব বিষেয়ে দৃষ্টিপাত করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

ক) উন্নয়নের প্রতিটি খাতে সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে নারীদের বর্তমান ভূমিকা

খ) উন্নয়নের অংশ গ্রহণের ফল হিসেবে বিশেষতঃ আয়, কাজের প্রকৃতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা কি অর্জন করছে তার পরিমাপ

গ) জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এজেন্ট সুবিধাভোগী হিসেবে নারীদের ভূমিকার উন্নয়নের পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ।

ঘ) সার্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে এ ধরণের অগ্রসরতার সম্ভাব্য ফল জরীপে শিল্প খাতে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোতে (Export Processing Zone EPZ) সম্পূরক শ্রমিক হিসেবে নারীদের অব-মূল্যায়নকৃত অবস্থাকে তুলে ধরে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হয়।[৩২]

World Survery এর পাশাপাশি UNDP (United Nations Development Programme) উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে পৃথক একটি Study করে, যা, ছিলো

---

[৩০] প্রাগুক্ত।
[৩১] আয়েশা খানম, বেইজিং কর্ম পরিকল্পনা অনূদিত।
[৩২] Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০ এর কোপেনগেহেন সম্মেলনের Follow-Up কার্যক্রম। এক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়। DAWN এর পক্ষ থেকে সম্মেলনে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এতে বলা হয়, "চলমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় যেখানে সম্পদ, ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ জনগণের এক ক্ষুদ্র অংশের জন্য সংরক্ষিত সেখানে নারীর জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়নতা এবং নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।[৩৩]

নাইরোবী সম্মেলনে দেখা য়ায় WID তেমন কার্যকর হয়নি। তখন Gender and Development (GAD) ধারণার সূত্রপাত ঘটে। নাইরোবী সম্মেলনের চূড়ান্ত দলিল হিসেবে Forward Looking Strategies (FLS) গৃহীত হয় নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে। এর মূল বিষয় হচ্ছে সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। "সমতা হলো একই সঙ্গে লক্ষ্য ও উপায়। যার মাধ্যমে ব্যক্তি আইনের অধীনে সম মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রাপ্তির মাধ্যমে নিজেদের মেধা ও দক্ষতার উন্নতি ঘটিয়ে জাতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সুবিধা ভোগ ও সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারে। ....(প্রারাগ্রাফ-১১)

উন্নয়ন অর্থ হলো, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক এবং মানব জীবনের অন্যান্য দিক-যেমন, তেমনি, মানুষের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের এবং শারীরিক, নৈতিক বৃদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ সহ সামগ্রিক উন্নয়ন .... (প্রারাগ্রাফ-১২)

শান্তি বলতে শুধু জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুদ্ধ সন্ত্রাস এবং শত্রুতার অনুপস্থিতি বোঝায় না। বরং সমাজের অভ্যন্তরে মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের পূর্ণবিকাশ এবং অর্থনৈতিক সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমতা ভোগ করাকে বোঝায়। ....(প্রারাগ্রাফ-১৩)

FLS এ বলা হয়েছে, উন্নয়নে নারীর বুদ্ধিজীবী সিদ্ধান্ত প্রণেতা, নীতি প্রণয়নকারী, পরিকল্পনা কারী এবং অবদানকারী ও সুবিধাভোগী হিসেবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। ....(প্রারাগ্রাফ-১৫)। এটি নতুন পদক্ষেপ, যে, UN সিস্টেমে প্রনেতাদের চোখে

---

[৩৩] আয়েশা খানম, বেইজিং কর্ম পরিকল্পনা অনূদিত।

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে অবজেক্ট নয় সাবজেক্ট হিসেবে দেখা হচ্ছে । বলা হয়েছে, এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে উন্নয়নের নুতন কৌশলকে পৃষ্ঠপোষকতা করবে এমন রাজনৈতিক সদিচ্ছা যা নারীর অগ্রসরতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে এবং সর্বাগ্রে বর্তমান অসম অবস্থা ও কাঠামো যা ক্রমাগত নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে নারী ইস্যুকে সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেয় এই অবস্থায় পরিবর্তন সাধন। উন্নয়ন এখন পৃথক খাতে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে সমাজে নারীর কেন্দ্রীয় ভূমিকা স্বীকৃত হবে এবং তার যর্থাথ মূল্যায়ন হবে। এর ফলে কৌশলে নারী তার আইনগত ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং স্থায়ী উন্নয়নের জন্য এই পরিবর্তন জরুরী ....(প্রারাগ্রাফ-২১)। FLS এ উন্নয়ন ধারণায় নারীদের আত্মনির্ভরশীলতাকে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। FLS দলিলে সমতা ও কল্যাণকে উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দুই হাজার সন অবধি এই দলিল সীমিত হারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার সমূহের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সম্মেলনে নারী ইস্যু আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। ১৯৯৫ সনে অনুষ্ঠিত হয় বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। এবং ঘোষিত হয় বেইজিং প্লান ফর এ্যাকশন। দশক ধরে বহু নিরীক্ষাধর্মী গবেষণা ও তৃনমূল পর্যায়ে বিশ্বব্যাপি বাস্তব কাজের অভিজ্ঞাতার আলোকে সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রতিনিধিদের মতৈক্যের মাধ্যমে বারোটি বিষয় চিহ্নিত করা হয় সমস্যা হিসেবে। দারিদ্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী নির্যাতন, যুদ্ধাবস্থা, অর্থনীতি, নীতি ও নির্বাচন প্রক্রিয়া, মানবাধিকার, গণমাধ্যম পরিবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কন্যা শিশুর অধিকার, এই বারোটি বিষয়ের মধ্যে সামাগ্রিক ভাবে নারীর অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে। এবং বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রীয় ও আর্ন্তজাতিক ভাবে সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৩৪]

৫৫৪৪৭৭

২০০০ বেসরকারী প্রতিনিধি জাতিসংঘ আয়োজিত নারী দশকের অর্জিত সফলতা পর্যালোচনা (Review) এবং মূল্যায়ন (Appraisal) করার জন্য ২০০০ সাল নাগাদ অগ্রগতি সাধনে ভবিষ্যতমূখী কর্মকৌশল (Forward Looking Strategies for Advancement of Women) গৃহীত হয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

[৩৪] Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

২০০০ সালে অনুষ্ঠিত হয় বেইজিং +৫ সম্মেলন। বেইজিং প্লান ফর এ্যাকশন এর অগ্রগতি বাস্তবায়নে সমস্যা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

এছাড়া ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংগঠন উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইউনিসেফ মহিলাদের সক্রিয়া এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। সংঘবদ্ধ গ্রুপ হিসেবে তারা যে সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তা সামাজিক সম্পদ বলে সম্পৃক্ত করা ও নির্ধারিত সরকারী সম্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজনে বলে অভিজ্ঞমত ব্যক্ত করেছে ইউনিসেফ। এবং একজন ব্যক্তি হিসেবে যে সব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে সেগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি স্যানিটেশন পর্যবেক্ষণ, বয়স্ক, শিক্ষার প্রশিক্ষক এবং পরিবারের প্রভাব স্থাপনকারী। ইউনিসেফের উচিত বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, উৎপাদনকারী,ম্যানেজার, শিক্ষক, স্বাস্থ্য কর্মী ইনকাম আর্নারস প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা বৃদ্ধি করা; এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশগ্রহণে সহায়তা এবং তাদের নিকট সেবা পৌছানোর নিশ্চয়তার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে সর্বোচ্চকরণ নিশ্চিত করা।[৩৫]

একই ভাবেই ইউএনডিপির সকল উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম ও প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ও সুবিধাভোগী হিসেবে নারীদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য নয়, বরং এই দৃঢ় প্রত্যয় থেকে যে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে, যখন নারীরা আরো কার্যকর ভাবে সম্পৃক্ত হবে। এই উদ্যোগ নাইরোবীতে ১৯৮৫ তে গৃহীত নারী দশক অনুযায়ী Forward Looking Strategies অনুযায়ী স্বীকৃত অঙ্গীকার সমূহ পূরণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার গুলোকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করছে। ইউএনডিপি কর্মীরা নিয়মিত ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে ইউমেন ইন ডেভেলপমেন্ট (WID) বিষয়ক ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে প্রশিক্ষিত হয়। এও গ এবং বে-সরকারী গঠনগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদানের লক্ষ্যে Women

[৩৫] Jeanee Vickers, programme for women and Girls, Women and the world Economic Crysis, Zed books Ltd., London and New Jersy.

in Development বিভাগের পক্ষ থেকে ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ ভাষায় WIDLINK নামক এক পৃষ্ঠায় একটি কান্ট্রি প্রোফাইল বের করা হয়।[৩৬]

সুতরাং বলা যায়, জাতিসংঘ পর্যায় ক্রমিক ভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও তার ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে নারীর জন্য উন্নয়ন ও নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করণে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে কার্যকর উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে।

৩.৩.৩ জাতিসংঘ কাঠামোয় নারী ঃ

১৯৪৫ সালে যখন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এই সংগঠনটি জাতিসংঘ ভূক্ত সকল জনগণের মানবাধিকারের প্রতি আস্থা পুনরায় ব্যক্ত করে। মানবাধিকার জাতিসংঘের মূল চার্টারের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উল্লেখিত হয় এবং আজো কেন্দ্র বিন্দুতেই রয়েছে। নারীর অগ্রসরতা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও নীতিমালা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে জাতিসংঘ কাঠামোয় একাধিক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় অংঘ সংগঠন রয়েছে। সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কমিশন অন দ্যা স্ট্যাটাস অব উইম্যান এর সুপারিশ Economic and Social council (Ecosoc) গ্রহণ করে এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে চুড়ান্ত স্বীকৃতির জন্য সাধারণ পরিষদে প্রেরণ করে। সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বিশেষতঃ যেগুলো জরীপের মাধ্যমে গৃহীত হয় তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সকল সদস্য রাষ্ট্র বাধ্য। CEDAW এর অগ্রগতি এর পর্যবেক্ষনের জন্য নিদির্ষ্ট বিচার সংক্রান্ত CEDAW কমিটি রয়েছে।

The United Nation International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) একটি স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান। এছাড়া UNDP এর দায়িত্বের অংশ বিশেষ পালন করে নিজস্ব Division for Women in development এর মাধ্যমে।[৩৭]

---

[৩৬] Ibid.

[৩৭] The World's Women 1995-Trends and statistics, op cit.

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ কাঠামোয় নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতিসংঘ চার্টারে বলা হয়েছে "The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in an capacity and under conditions of equality in its Principal and subsidiary organs".[৩৮]

"এই ব্যক্তব্য স্বত্ত্বেও সকল প্রতিনিধিত্ব থেকে নারীরা এখনো অনেক দূরে। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ৪৯ জন সভাপতির মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র দু'জন। ১৯৫৩ সনে অষ্টম সেশনে ভারতের বিজয় লক্ষীপন্ডিত এবং ১৯৬৯ সনে চব্বিশতম সেশনে লাইবেরিয়ার এনজিক্রকস। জাতিসংঘ কর্মীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২০% এর কম নারী সিনিয়র লেভেলে আছেন। বাকিরা সবাই এন্ট্রী লেভেল ও মিড লেভেলে। ১৯৭২ সনে প্রথম একজন নারী সহকারী মহাসচিব পদে নির্বাচিত হন। এই পর্যায়ে নারীদের নিয়োগ দুই থেকে তিন এ সীমাবদ্ধ থেকে ১৯৯৩/৯৪ সনে তা পৌছেছে বারো জনে। বিভিন্ন মিশনগুলোতে দেখা যায় মিলিটারী শান্তি কমিশনে নারীদের হার খুব কম। বিভিন্ন পলিসি এজন্য দায়ী। বে-সামরিক শান্তি মিশনে নারীদের হার কিছুটা বেশি।[৩৯]

উপরোক্ত আলোচনায় নারী উন্নয়নে জাতিসংঘের মোটামুটি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ ফুটে উঠে। এতে বুঝা যায় জাতিসংঘ নারীর উন্নয়নে উদ্যোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও নিজস্ব কাঠামোতো নারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি। যেহেতু জাতিসংঘ একটি সম্মিলিত আন্তর্জাতিক সংস্থা, তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া পূর্ণ সফলতা অর্জণ করা, সম্ভব নয়। রাষ্ট্রগুলোর নীতি নির্ধারণী ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেলে জাতিসংঘের পক্ষে প্রকৃত ভূমিকায় অবতীর্ন হওয়া সম্ভব পর হবে।

গবেষণার এ পর্যায়ে এসে বলা যায় বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর অবস্থানের বাস্তব চিত্র তুলে ধরাই ছিল এই অধ্যায়ের আলোচনার উদ্দেশ্য। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা

---

[৩৮] Ibid.
[৩৯] The World Women 1995-Trends and statistics, op. cit.

Dhaka University Institutional Repository

যায়, নারীরা যদিও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আছে, কিন্তু তার কোন নির্দিষ্ট মাত্রা বা সঠিক পরিমাপ যোগ্য মানদন্ড নেই। এক্ষেত্রে দুটো সীমাবদ্ধতার দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে।

প্রথমতঃ প্রচুর অবদান থাকা সত্ত্বেও নারী তার বিপুল উৎপাদনশীল শ্রম কর্মের স্বীকৃতি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়তঃ আধুনিকতার ও উন্নয়নের মূল স্রোতে সমাসীন না হতে পেরে, প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে নারী পুরুষের সাথে সমান ভাবে এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগের অভাবে প্রান্তিকতায় রয়ে গেছে, এবং বঞ্চিত এ শ্রেণী সনাতন কর্মকান্ডে আটকে রয়েছে। একই সাথে যা লক্ষ্যনীয় বলে বিবেচ্য তা হলো সমগ্র বিশ্বের নারীরা বিভিন্ন মাত্রায় তাদের যোগ্যতানুযায়ী নানা রকম শ্রম ও কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে গোটা বিশ্বকে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করছে দারুন ভাবে। নারীরা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন মাত্রায় শ্রম শক্তিতে এগিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ শক্তি শ্রম শক্তিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু জাতিসংঘ গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও উদ্যোগ সমূহের সকল বাস্তবায়ন এর সদস্য রাষ্ট্র সমূহের সদিচ্ছা ও নিজস্ব নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান এর উপর নির্ভর করে। এই পর্যায়ে এসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রক্ষণশীল নীতির কারণে জাতিসংঘ গৃহীত অনেক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সীমিত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ রীতিনীতি ও রক্ষণশীলতার কারণে অনেক প্রচেষ্টাই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা গ্রস্থ হয়। এই অধ্যায়ে জাতিসংঘের বর্তমান চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে বাস্তব অবস্থাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ে অগ্রসরতার প্রয়োজন উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে নারীর সমান অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলেই সুসম উন্নয়ন সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ উন্নয়নে নারী ঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা
৪.২ নারীর অধঃস্তন আর্থ-সামাজিক অবস্থান
৪.২.১ নারীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, নির্মাণ প্রক্রিয়া
৪.২.২ বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি নারী উন্নয়ন ও বাংলাদেশ
৪.২.৩ স্কুল কারিকুলাম এ লিঙ্গ সংবেদনশীলতা
৪.৩ সামাজিক অবস্থান
৪.৩.১ আইনগত অধিকার
৪.৩.২ বাংলাদেশের সংবিধানে নারী
৪.৩.৩ মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ ও নারী উন্নয়ন
৪.৪ নারী উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ উন্নয়নে নারীঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নারীর সম্পৃক্ততা ও অবস্থানগত মর্যাদা বিশ্লেষণের পর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে বৈশ্বিক পর্যায়ে নারীর উন্নয়নগত অবস্থান পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ ও নিম্নমুখী। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশে উন্নয়নে নারীর অবস্থান কী পর্যায়ে রয়েছে গবেষণার এ পর্যায়ে তা উপস্থাপন করার প্রয়াস রয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়নে অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা, উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমের অ-স্বীকৃতি ও অবমূল্যায়ন এবং উন্নয়নের ফলে প্রাপ্ত অর্জন থেকে নারীকে বিচ্যুতকরণ সকল দিক থেকেই বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করে। ইতোপূর্বে বিশ্ব পর্যায়ের আলোচনায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর যে বঞ্চিত ও অনগ্রসর অবস্থানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা বাংলাদেশের নারীদের ক্ষেত্রে ও কম বেশি পরিবর্তন সাপেক্ষে একইভাবে প্রযোজ্য। পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের টাস্কফোর্স রিপোর্ট মার্চ ১৯৯১ অনুযায়ী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উন্নয়নকে একটি প্যারডাইমের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে ঃ

ক) দারিদ্র বিমোচন

খ) স্ব-নির্ভরতা

গ) গণতন্ত্রায়ন

ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন

বিদ্যমান সম্ভবনা ও সম্পদের সচেতন, সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ দ্বারা উন্নয়নের এই নির্ণীত মাত্রা অর্জণ সম্ভব। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ এই ইঙ্গিত মাত্রার কোথায় অবস্থান করছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশের নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর সীমাবদ্ধতা । বাংলাদেশে নারীর এই অবউন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, বর্তমান অবস্থান, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, জাতীয় বাজেটে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর অবস্থান কী, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে এক্ষেত্রে গণমাধ্যম কতটুকু সহায়ক ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।
নারীর প্রান্তিক ও সীমাবদ্ধ অবস্থান এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় সন্ধানে ইতিবাচক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনই এই গবেষণার লক্ষ্য।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে "উন্নয়নে নারী" শীর্ষক ধারণা ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সর্বত্র পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ গুলো ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে। সর্বত্র সামাজিক তথা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য নতুন নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া জোরদার হতে শুরু করে। আর এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার চিন্তনে 'উন্নয়নে নারী' শীর্ষক মতাদর্শিক ধারণাটি একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মূলতঃ ৭০-এর দশকে 'উন্নয়নে নারী' শীর্ষক ধারণাটির ব্যাপক প্রসার ঘটে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত মার্চ ১৯৯১-এর টাস্কফোর্স রিপোর্ট অনুযায়ী এ ধারণার প্রসারে প্রয়োজনীয়তার পেছনে দুটি পরিপূরক মূলক যৌক্তিকতা রয়েছে। যথা প্রথমত ঃ একটি জনগোষ্টির অর্ধেক অংশকে অবহেলায়, অবজ্ঞায় ও অস্বীকৃতির মাঝে ফেলে রাখা অনভিপ্রেত ও অমানবিক এবং দ্বিতীয়তঃ দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বিবেচিত কলাকৌশলের ভিত জোরদার করা সম্ভব।

নারীর অনগ্রসরতা বাংলাদেশের সমাজের একটি চিরন্তনরূপ। এদেশে বিরাজমান একটি আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে বিশেষতঃ যেখানে দেশের অর্ধেক জনগোষ্টি অর্থাৎ নারীরা চরমভাবে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে তাদের উন্নয়নের পথে সমস্যা সমূহকে চিহ্নিতকরণ এবং পাশাপাশি তাদেরকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূলধারায় আনায়নের উদ্দেশ্যে স্থান ও সময়োপযোগী কলাকৌশল নির্মাণ ও নির্ধারণ বিশেষ প্রয়োজন। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ সহজতর করা; দেশের আইনগত ও মূল্যবোধগত কাঠামোকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণের প্রচেষ্টার সহায়ক হিসেবে নির্মাণ করা-এই দুটি বিষয়কে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে 'উন্নয়নে নারী' শীর্ষক ধারণার ক্ষেত্রে বিবেচনাধীন রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দিকটি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। বাংলাদেশকে মিলিনিয়াম

Dhaka University Institutional Repository

ডেভেলপমেন্ট গোল-এ পৌঁছতে হলে অবশ্যই নারী উন্নয়নের জন্য গৃহীত সার্বিক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে এবং এজন্য সমাজকে জেন্ডার সচেতন হতে হবে। জেন্ডার সচেতন সমাজ নির্মাণে গণমাধ্যমের ভূমিকা হতে পারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্য অবশ্যই জেন্ডার সচেতন বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। এ অধ্যায়ে নারীর বহুমুখী অধস্তন অবস্থা, উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সংবিধানে নারীর অবস্থান, জেন্ডার মুখী বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং তারই ভিত্তিতে বর্তমান বাজেট কতটা জেন্ডার সচেতন ইত্যাদি আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।

৪.২ নারীর অধস্তন আর্থ-সামাজিক অবস্থানঃ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আমাদের পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের আগের দিন গুলিতে শুধু পুরুষরাই ছিল অর্থউপার্জনের উৎস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে স্বাধীন, শক্তির আধার এবং মানব জীবনের সার্বিক সুযোগ সুবিধার অধিকারী; যেখানে জনসংখ্যার অর্ধেকেই নারী। নারী ছিল সংসারের খাঁচায় বন্দী স্বযত্ন লালিত অথবা অত্যাচারিত নিপীড়িত, অধস্তন গৃহবন্দী রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'Narrow Domestic Wall' দ্বারা সীমাবদ্ধ। ফলে পুরুষ ছিল তাদের ভাগ্য নিয়ন্তা এবং চরম অভিভাবক। তারই ধারাবাহিকতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতিতে আবদ্ধ সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী আজও পশ্চাৎপদ। যদিও একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নারীর অগ্রগতি পূর্বের তুলনায় আশা ব্যাঞ্জক তবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

বাংলাদেশে নারীর অধস্তন ও অসম অবস্থানের কারণে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিটি পর্যায়েই শ্রম, মেধা নিয়োজিত থাকলেও তার যথাযথ মূল্যায়ন নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর গার্হস্থ্য সময়ের যেমন মূল্য নেই তেমনি নেই আর্থিক কর্মজীবনের পূর্ণ স্বীকৃতি। 'পুরুষের চেয়ে অধিক শ্রম বিনিয়োগ করে ও নারী উন্নয়নের অংশীদার নয়। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বিণ্যাসে সমাজের মূল নিয়ন্ত্রণ পুরুষের হাতে। বাংলাদেশের ভূমির মালিকদের হাতেই থাকে সমাজের ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়নের অধিকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার মানবিক নাগরিক ও জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন না কোনভাবে নারী বৈষম্যের শিকার।[১]

[১] Salma Khan "Women's Development and Public Policy in Bangladesh", Integration of Women in Development, published by United Nations.

"নারীদের মতাদর্শগত ভূমিকা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নৃতত্ত্ববিদগন তিনজোড়া দ্বন্দ্বমূলক ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন: প্রকৃতি-কৃষ্টি (Nature-Culture), নারী-পুরুষ ও প্রাইভেট-পাবলিক। প্রকৃতি-কৃষ্টি ধারণাটির উদ্ভব হয় অষ্টম শতাব্দীর ইউরোপে মতাদর্শগত বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে। পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানী লেভী স্ট্রাউস এ ধারণা প্রতীকি বিশ্লেষণে প্রয়োগ করেন প্রকৃতিকে ধরে নেয়া হয় এমন কিছু হিসেবে যা নিষ্ক্রিয়, ইতিপূর্বে প্রদত্ত হয়ে আছে এবং যাকে সামাজিক পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ করা আবশ্যক। অপরদিকে কৃষ্টি সৃজনক্ষম, সক্রিয় শক্তি যা প্রদত্ত প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে প্রকৃতি কৃষ্টির বৈষম্যমূলক ধারণারই আলংকারিক রূপান্তর হচ্ছে নারী পুরুষের দ্বন্দ্বমূলক ধারণা। .... নারীদের সৃজনশীলতা প্রাকৃতিক উপায়ে জীবন উৎপাদন করে; পুরুষের সৃজনশীলতা কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তি ও রূপকের মাধ্যমে উৎপাদন করে। নারীদের প্রাকৃতিক নিয়ম ও নৈতিকতার সঙ্গে এক করে দেখা হয় যা আবেগময় ও উত্তেজনা প্রবণ এবং তাই পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। পুরুষরা চিহ্নিত হয় স্রষ্টা ও সামাজিক হিসেবে, নারীরা চিহ্নিত হয় জীব সাম্বন্ধীয় বিষয়ের সঙ্গে, অ-সামাজিক হিসেবে। আদর্শ গতভাবে নারীদের ভূমিকা স্থাপিত হয় পরিবারে এবং কর্ম নির্ধারিত হয় প্রাণীস্বরূপ মানবশিশুকে সভ্য মানুষে সামাজিকীকরণ কারী এবং প্রকৃতিজাত অপক্ক খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে পরিণত করার মধ্যে। অপরদিকে পুরুষের ভূমিকা স্থাপিত হয় সমাজে এবং কর্ম নির্ধারিত হয় ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রাজনীতি ও কৃষ্টি সম্পর্কিত প্রতীকী পদ্ধতির মধ্যে।[২] আর পুরুষের তৈরী সামাজিক রীতিনীতি সার্বিকভাবে পুরুষকেন্দ্রিক সুযোগ সুবিধা সমূহ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে এবং এ সমস্ত নিয়ম কানুন নারীর সুযোগ সুবিধা দানের বিষয়ে খুব একটা তৎপরতা দেখায় না। 'নারীরা উন্নয়নের পুরো সুফল ভোগ করতে পারে না, কারণ প্রায়শ:ই তারা পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরীক্ষন এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যায় যা তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। সমাজও অর্থনীতিতে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রাপ্য স্বীকৃতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের অবদানের যথাযথ ব্যবহার এবং তাদেরকে উন্নয়নের সম্পূর্ন সুফল পৌঁছে দেয়া সম্ভব। উন্নয়ন প্রেক্ষিতে সাধারণ ভাবে নেতৃত্ব এবং নিদির্ষ্ট করে নারী নেতৃত্ব পরস্পর সম্পৃক্ত।[৩]

---

[২] নাসিম হোসাইন নারীদের অধস্তনতা ও বাংলাদেশের সমাজ, নারী রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ, সম্পাদনা-মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯০, পৃঃ-২৫।

[৩] Dr. Sayeda Rowshan Qadir, Women Leaders in Development organizations and Institutions, P-21.

Dhaka University Institutional Repository

সম্পত্তির মালিকানাই পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের ক্ষমতার উৎস এবং তাদের সিদ্ধান্তই সমাজে অনুমোদিত। সামগ্রিক উৎপাদনশীল কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলে ও তা থেকে নারীর কোন প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি নেই। অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ আয়কারী নয় বলে তাদের কাজের স্বীকৃতি নেই কর্ম হিসাবে। তাই শ্রমবাজারে তারা শ্রমিকের হিসাব থেকে বাদ পড়ে যায় । আবার বাইরের কর্মক্ষেত্রে যে সব নারী প্রবেশ করেছে তারাও পুরুষের সম্মান প্রাপ্ত হয় না। আবার কোন কোন নারী সামাজিক রীতিনীতির কারণে নানা রকম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের স্বীকার হয়ে থাকে। স্বীয় মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় তারা পুরুষের সমান দরকষাকষিতে ও লিপ্ত হতে পারে না।

মর্যাদাগত দিক থেকে পরিবারে নারী দ্বিতীয় শ্রেণীর অবস্থানে থাকে। নারী কন্যা, জায়া, জননী হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। কখনও বা দেখা যায় যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে নারীকে মিসেস 'ক' বা মিসেস 'খ' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। অনেক সময় পারিবারিক অনুশাসন নারীকে নানা রকমে নিগৃহীত করে থাকে। কখনও বা নারীকে নানা রকম নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়। কেউ প্রতিবাদী হলে অনেক সময় তাকে প্রান পর্যন্ত দিতে হয়। কেউবা অনুশাসনের বেড়াজাল থেকে মুক্তি কিংবা অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যার পথ ও বেছে নেয়। আবার অনেক পরিবারেই নারীকে যৌতুকের বলি হতে হয়। কোথাও বা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সমান শিক্ষার সুযোগ নারী পায়না। সম্পত্তি, বিয়ে, তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান মর্যাদা পায় না। এইসব বাস্তবতার মধ্যদিয়ে নারী সমাজকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অতিবাহিত করতে হয় যার মাধ্যমে এদেশের নারীদের অধস্তনতার প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে পুরুষের সম-সহযোগী বিবেচনা না করে বরং এমনভাবে নারীর ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয় যাতে নারী হয়ে ওঠে নির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী, চরম সহনশীল এবং ত্যাগের প্রতিমূর্তি। নারীকে হতে হয় সর্বংসহা ধরিত্রীর মত।

নারীর গার্হস্থ্য কাজকে কর্মের স্বীকৃতি না দিয়ে বরং পারিবারিক সনাতন মূল্যবোধের চর্চা হিসেবে দেখা হয় এবং একে নারীর স্বভাবজাত ধর্ম হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় নারী হয়ে ও একসময় নিজেকে এভাবে ভাবতে শিখে এবং পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসেবে নারী হয়ে জন্মানোর কারণে হীনমন্যতায় ভুগে থাকে। নারীর অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল থাকায় দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতর হয় নারী। অধস্তন হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী বৈষম্যের

Dhaka University Institutional Repository

শিকার। 'শিক্ষায়, পুষ্টিতে, সম্পত্তিতে, আইন, সামাজিক ও সংস্কৃতিগতভাবে দেশের মহিলা জনগোষ্ঠি পিছিয়ে আছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশের পরিবারে চিকিৎসা খরচ পুরুষের জন্য ২৪ টাকা, নারীর জন্য ১৮ টাকা। সরকারী হিসাব অনুযায়ী মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি ঘন্টায় ৩ জন। শিক্ষা খাতে নারীর জন্য ব্যয় করা হয় শতকরা মাত্র ৩১ ভাগ, পুরুষের জন্য বরাদ্ধ ৬৯ ভাগ।[৪]

এ ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য সংবিধানের ১৯ নং ধারা 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন' (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান) এর সুস্পষ্ট লংঘন হলেও এসব ক্ষেত্রে কখনও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।

সাংবিধানিকভাবে নারীর জন্য পুরুষের সমতা স্বীকৃত হওয়া স্বত্ত্বেও সামাজিক ভাবে নারীরা বঞ্চনার শিকার। তারাই শুধু বাল্য বিবাহ, দ্রুত ও বারবার সন্তান ধারন এবং উচ্চমাত্রার মাতৃমৃত্যুর শিকার। তারা নিরক্ষরতা ক্ষুধা ও অপুষ্টির দায় বহন করে। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পর্দা, বিবাহ ও ধর্মীয় বিভিন্ন নিয়মাচারের মাধ্যমে নারীদের অসম ও অনগ্রসর অবস্থানে রাখা হয়। নারীর প্রতি এই নেতিবাচক আচরণ ক্রমাগত নির্ভরশীলতা ও অবদমন করার চক্রে নারীদের আবদ্ধ করে রাখে। নারীর প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণের ফলশ্রুতিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী পিছিয়ে পড়ে সার্বিকভাবে। উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও কার্যক্রমে সম্পদের নিয়ন্ত্রণে নারী-পুরুষের অসম প্রবেশাধিকার রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রায়শই তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ ব্যর্থ হয়। কারণ শ্রমশক্তিতে নারীদের অবদানের প্রকল্পে ও গৃহে নিয়োজিত শ্রম অংশ এড়িয়ে যাওয়া হয়। সনাতন শ্রম বিভাজন অনুযায়ী নারীরা বেশীরভাগই অর্থনীতির অ-স্থিতিশীল ও স্বল্প মজুরীর খাতে নিয়োজিত হয়। পরিবারের অসম ক্ষমতার সম্পর্ক এবং নারীর গতিশীলতার উপর নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন নির্ভর দারিদ্র দূরীকরণ নীতি ও কার্যক্রমের প্রভাবকে দূর্বল করে।[৫]

উপরোক্ত আলোচনায় একথা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ হয় যে নারী সামাজিক ভাবে অধস্তণ অবস্থানে রয়েছে। আর এ অধস্তনতার মূল কারণ হচ্ছে নারীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া।

---

[৪] বাংলাদেশের নারী প্রগতি সংঘ কর্তৃক প্রকাশনা, বাংলাদেশে নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান।

[৫] Dr. Sayeda Rowshan Qadir, Women Leaders in Development Organizations and Institutions, P-22.

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.১ নারীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, নির্মাণ প্রক্রিয়া ঃ

বিশ্ব পরিসরে নারীর অধস্তনতা বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যেই নারীর অধস্তনতার বীজ লুকিয়ে আছে। ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, অশিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি প্রক্রিয়া নারীকে তিলে তিলে কিভাবে শোষণ করে আসছে সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার মত অনেক নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথাই তার ইতিহাস বহন করছে। ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং আইন পাশ করে সতিদাহ প্রথা বিলুপ্ত করলেও নারী নির্যাতন ও অবমূল্যায়ন আজও অব্যাহত রয়েছে।

পিতৃতান্ত্রিকতায় সামাজিক আদর্শগুলি যেহেতু পুরুষ নিয়ন্ত্রিত এবং এ প্রক্রিয়ার মধ্যে অবস্থান করে নারীর যত অসুবিধাই হোক না কেন এ আদর্শ (?) পুরুষের পক্ষেই রায় দেয়। ফলে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত একটি পক্ষপাত দুষ্ট জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া চক্রাকারে আর্বতন করেছে যা নারীকে একটি সীমিত গন্ডীর চক্রে আবদ্ধ রেখে উন্নয়নের পথকে আরও প্রলম্বিত করেছে। যদিও একবিংশ শতাব্দীতে নারীর অগ্রসরতা আমাদের আশান্বিত করে তবু মুদ্রার অপর পিঠে অনেক নারীই আজও নির্যাতিত, অবহেলিত এবং জীবন যাতনায় কাতর প্রান্তিকতার খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে আছে। আর এর কারণ নারীর, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বা Socialization Process. নারীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে এ প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার প্রয়োজন। সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে সামাজিকীকরণ এর অর্থ হল কিভাবে সামাজিক প্রক্রিয়া বা সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক প্রকৃতির সম্যক বিকাশ হয় তার অনুশীলন। Metta Sencer তাঁর Foundations of Modern Sociology গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৮৫) বলেন -Socialization is the process of learning the rules of behavior for a given social group as well as acquiring the motivation to perform properly তিনি আরও বলেন, They acquire language knowledge and skills commitment to particaular norms and values, and the ability to perform the many role relatonships. তিনি তাঁর 'Foundation of Modern Sociology ' গ্রন্থের ৮৭

পৃষ্ঠায় উল্লেখ্য করেন, Socialization is the process through which people come to want to do what they must do.[৬]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক মু. ইয়াহ্ ইয়া আখতার তাঁর রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ-গ্রন্থে উল্লেখ করেন সামাজিকীকরণকে সেই পদ্ধতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যার দ্বারা একজন ব্যক্তিকে সমাজ কাঠামোতে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হয় এবং তার জন্য নির্দিষ্টকৃত ভূমিকা পালনে প্রবৃত্ত করানো যায়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একটি আচরণ বিধি বা মূল্যবোধ আছে। ব্যক্তি এ মূল্যবোধ গ্রহণ করলে এই সঙ্গতি স্থাপিত হয়। এ্যারিষ্টটল মানুষকে by born social being হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের জীবন শুরু হয় তার পরিবার থেকে। আর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় পরিবার থেকেই। শিশুপালন পদ্ধতি, দৈনন্দিন জীবনাচরণ, পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, আলাপ আলোচনা জীবন ধারণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ একটি আলাদা ব্যক্তিত্ব নিয়ে ‘মানুষ’ রূপে বেড়ে ওঠে। মায়ের ঘুম পাড়ানি গান, ছড়া, কবিতা, প্রবাদ-প্রবচন, দৈনন্দিন জীবন গাঁথা, নিজেদের সম্পর্কে নারীর নেতিবাচক উক্তি এবং কাব্য-সাহিত্যের অধিকাংশ আচরণের মধ্যেই নারীর অধস্তনতাও আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। এই অবস্থা নারীকে মন ও মগজে সার্বক্ষনিকভাবে দুর্বল করে রাখে। এছাড়া ধর্মীয় গোড়ামী, কু-সংস্কার তো রয়েছেই-যা নারীকে পরনির্ভরশীলতা, নিরাপত্তহীনতা, হীনমন্যতাবোধ ইত্যাদিতে নিপতিত করে প্রবল ভাবে। ‘অবলা’ ‘অপয়া’ ‘আপদ’ ‘দাসী’ ‘চরনদাসী’ ‘শয়তানের দড়ি’ ‘নরকের কীট’ ‘বুদ্ধিহীনা’ ইত্যাদি নানা নামে বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচনে নারীকে অভিহিত করা হয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। সামাজিক স্তর বিণ্যাস যুগের পরিবর্তনে যেমনই হোক না কেন নারী পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সার্বক্ষনিকভাবে অবমূল্যায়নের স্বীকার হয়েছে। ফলে সে ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রবল প্রান্তিকতায় উপনীত হয়ে স্বীয় মর্যাদাবোধ ও আত্মসচেতনতাবোধ হারিয়ে ফেলে পরনির্ভরশীল, অর্থাৎ পুরুষ নির্ভর হয়ে পড়েছে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাবে পুরুষকে বটবৃক্ষের ন্যায় মানসজগতে স্থাপন করে তার ছায়াতলে আশ্রিতা হিসাবে নিজেকে অনুমান করে নারী নিজেকে পরম নিরাপদ বোধ করে। আদীম যুগে জ্যান্ত কন্যা সন্তান কবর দেয়া, বিক্রয় কিংবা যুদ্ধের পর অপহরণ, কিংবা পিতার হাতে মাতাকে অপমানিত

---

[৬] Metta Sencer, Foundation of Modern Sociology , P,87.

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতিত, শারীরিকভাবে আক্রান্ত হতে দেখা ইত্যাদি দীর্ঘ সামাজিকীকরণ এর ইতিহাস নারীর অধস্তনতার মনবৃত্তি তৈরী করেছে। এছাড়া বাল্য বিবাহ নারীকে আরও এক ধাপ পিছিয়ে দিয়েছে। যখন একটি মেয়ে শিশুকে তার চেয়ে দ্বিগুন, চারগুন, ছয়গুন কিংবা আরও অধিক বয়সের একটি পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হত তখন শিশুটির মধ্যে তার বরটি সম্বন্ধে একটি ভীতি, কিংবা সম্মান কিংবা দূরত্ব তৈরী হয়ে যেত। সে স্বামীকে গুরুজন ভাবতে শুরু করত এবং স্বামীটিকে চরম জ্ঞানী এবং নিজেকে কম জানা মানুষ হিসাবে ভাবতে শুরু করত ; এবং কখনও কখনও তার মুরব্বী স্বামীকে ভক্তির আতিশয্যে নিজেকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করত। এভাবেই নারীর মধ্যে হীনমন্যতার বোধ জাগ্রত হতে শুরু করে। যখন তার ছোটছুটি, দৌড়ঝাপ দিয়ে খেলাধুলা করে মুক্ত জগতে ঘুরে ফিরে দেখা বা শেখার বয়স, সেই বয়সের একটি বালিকা বধূকে এনে বয়োজেষ্ঠ্য, স্বামী, আত্মীয়, পরিজনের কঠোর অনুশাসনের মধ্যে পড়তে হত। তাই পুরুষ সম্পর্কে তার প্রথম দেখাই প্রবল কিংবা ভীতিকর হিসাবে। সে কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার অপরিণত দেহমনে সংসারের নাগাল ধরতে হত। নানা রকম প্রশ্ন করে শিশু সুলভ আচরণ করে সবকিছু জানতে চাইত। স্বামী বা পরিজন সদাশয় হলে সে তার প্রশ্নের জবাব পেত-তবে অবশ্যই তা তার সম্পর্কে নেতিবাচকতার জন্ম দিত, বলা হত মেয়ে মানুষের বুদ্ধি কম অথবা নারী জড়বুদ্ধি সম্পন্ন। আবার কখন ও নারী শিশুটিকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়া হত, কখনও বা তাকে কঠোর হস্তে নিবৃত্ত করা হত। বয়সের দূরত্বের কারণে স্বামীভীতি, প্রবল শ্রদ্ধাবোধ, হীনমন্যতাবোধ, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি নারীর মধ্যে তৈরী হয়ে যেতে নিজের অজান্তেই।

তাছাড়া অপরিণত বয়স থেকে ঘন ঘন সন্তান প্রসব নারীকে শারীরিক ভাবে দুর্বল করে দিত, পঁচিশ বছরের তারুন্যকে অনুভব করার আগেই নারী 'কুড়িতে বুড়ি' হয়ে যেত। এ সব বহুবিধ বিরোধীতা, প্রতিকূলতা ও জটিলতার মধ্য দিয়ে নারীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া আবর্তিত হওয়ায় নারীকে সমাজ জ্ঞান-বুদ্ধিহীনা, অবলা, অবিবেচক, দুর্বল ইত্যাদি নানা রকম মিথ্যা অপবাদে ভূষিত করল; অথচ নারীর এই অবস্থার জন্য গোটা সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী। বালিকা বধূটি তার বালিকা মাতাকে দেখত তার বাবা কিংবা পরিবারে অন্যান্য পুরুষ সদস্যের উপর নির্ভরশীল বুদ্ধির দিক থেকে বাবা অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় অপূর্ন। তাই কন্যা শিশুটি ও মাতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে নিজেকে ভাবতে শিখে। মায়ের মত সেও পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দেখানো পথেচলতে শুরু করল তাদের চোখে পৃথিবীটাকে অনুভব করল, দেখল, সে একবার

Dhaka University Institutional Repository

ও ভাবার সুযোগ কিংবা অবকাশ পেলনা যে তার নিজস্ব দৃষ্টিতে পৃথিবীটা দেখা সম্ভব, স্বীয় বিবেচনা বোধ, বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে সমাজে স্বীয় আসন গড়ে নিতে হবে। এভাবে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে নারীর মুক্ত চিন্তার বিকাশ, মৌলিক ও মানবিক অধিকার সম্পর্কে ধারণা এবং প্রতিবাদের ভাষা তৈরী হয়নি। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া নারীকে বিভিন্ন ভাবে অধস্তন করে রেখেছে এবং রাখছে যার কারণ ও উপাদান সমূহ একটি অপরটির সাথে এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে এদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা খুবই কঠিন। তবু আমাদের সচেতন প্রয়াস বিশেষ ভাবে কাজে লাগিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হতে পারে।

"প্রবল পদসোপান মূলক লিঙ্গীয় সম্পর্কের ভেতর বাংলাদেশের নারীগণ রয়েছেন অধস্তন। এ ব্যবস্থায় সামাজিক ক্ষমতা এবং নিজস্ব জীবনের উপর নারীর স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ অস্বীকার করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ার চাবিকাঠি হিসেবে অনেকগুলো বিষয় চিহ্নিত করা যায় যার মাধ্যমে নারীদের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যায় এবং তাদের পুনরুৎপাদিত করা যায়, পরিবার, জাতিত্ব ও বৈবাহিক সংগঠনের সাথে উত্তরাধিকারের ধরণের সাথে লিঙ্গীয় পৃথকীকরনের সাথে এবং এ সব চর্চার মতাদর্শের সাথে তাদের সম্পর্কিত করা হয়।[৭] আর পরিবার হল এই প্রক্রিয়ার বাহক এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলাধুলা, কর্ম ক্ষেত্রে ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে নারী অধস্তনতার স্বীকার। তাই গবেষণার এ পর্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

পারিবারিক অবস্থান ঃ

নারী পুরুষ উভয়কে নিয়ে পরিবার-যাকে সমাজের ক্ষুদ্র একক বলা হয়; যেখানে ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকেই অসহায় শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে, আর এখান থেকেই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে পরিবারে নারীর অবস্থান কী এখানে পর্যায়ক্রমে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

[৭] Cited in Mahmuda Islam, Social Norms, Institutions and Status of Women, in 'The Situation of Women in Bangladesh" ed, by Women for Women Research and Study Group, Dhaka 1979, P-227.

Dhaka University Institutional Repository

শিশুর আগমন (নবজাতিকা) ঃ

কোন কোন পরিবারে পুত্র সন্তান এতই কাঙ্খিত থাকে যে গর্ভবতী নারীর ঘরে অনেক ছেলে শিশুর পোষ্টার বা ছবি বাঁধিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখা হয়। নবজাতক যদি পুত্র সন্তান হয় 'আজান' দিয়ে তাকে পৃথিবীতে স্বাগত জানানো হয় যা কন্যা সন্তানের বেলায় হয় না। গবেষণার প্রয়োজনে ২০ জন গর্ভবতী মহিলার সাথে কথা বলে এবং তাদের বাসগৃহে বা শয়ন কক্ষে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে ১৯ জনের ঘরের দেয়ালের পোষ্টারেই ছেলে শিশুর ছবি শোভা পাচ্ছে, মাত্র একজনের ঘরে দুটি মেয়ে শিশুর ছবির সাথে একটি ছেলে শিশুর ছবি ঝুলছে। অর্থাৎ অধিকাংশ সন্তান সম্ভবা মাতা ও তার পরিবার পুত্র সন্তান আশা করেন। সাক্ষাৎকার দানকারী ২০ জন মাতার মধ্যে ১২ জন পুত্র সন্তান আশা করেন, ৫জন কন্যা সন্তান আশা করেন বাকী তিন জন ছেলে মেয়ে যাই হয় সুস্থ্য সন্তান আশা করেন। উল্লেখ্য সাক্ষাৎকার দানকারী ২০ জনই এবার প্রথম মা হতে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে ১০ জনের স্বামীই পুত্র সন্তান আশা করেন, ৬ জনের স্বামী কন্যা সন্তান আশা করেন এবং বাকী ৪জনের স্বামীরা ছেলে মেয়ে যা হয় তাতেই খুশি। তবে নারীর সন্তান আশা করা ক্ষেত্রে ও স্বামীর আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখা যায়। অনেক গর্ভবতী মা আবার মেয়ে সন্তান আশা করেন। উল্লেখ্য সাক্ষাৎকার দান কারী নারীদের মধ্যে ২০ জনই মালিবাগ ও খিলগাঁও এলাকার বাসিন্দা। মূলত এলাকাটি নিম্ন মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত অধ্যুসিত। এদের মধ্যে তিনজন শিক্ষক, ২ জন গার্মেন্টস কর্মী, একজন আইনজীবি, একজন পিঠা ব্যবসায়ী, একজন ডিম বিক্রেতা ৬ জন গৃহিনী, একজন অধ্যাপিকা, একজন ব্যাংকার, একজন ডাক্তার, একজনের স্বামী প্রবাসে থাকেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আর একজন গৃহ পরিচারিকা আবার এদের মধ্যে ৬ জন স্নাতকোত্তর, ৬ জন স্নাতক, ২ জন এইচ, এস, সি ১ জন এস, এস, সি ১ জন অষ্টম শ্রেণী পাশ এবং ৪ জন অশিক্ষিত এতে বুঝা যায় একটি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও এখনো পুত্র সন্তানই অধিক কাম্য, ভূমিষ্ট সন্তান ছেলে হলে চারিদিকে হাসি আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। পাড়া- প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাইকে সঙ্গতি অনুযায়ী মিষ্টি বিতরণ বা পানাহারে আপ্যায়িত করা হয়। কোন কোন পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মালে মাকে শুনতে হয় নানা রকম অপ্রীতিকর ও আপত্তিকর কথা বা খোঁটা, কেউ বা মুখ গোমরা করে, কেউ বা কষ্টের হাসি দিয়ে কন্যাকে পৃথিবীতে আমন্ত্রণ জানায়। আবার কোথাওবা পুত্র সন্তানের আশায় পর পর অনেকগুলো কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে দেশের জনসংখ্যা বাড়াতে থাকেন। আবার কোন নারী পর পর কয়েকটি কন্যা সন্তান জন্ম

Dhaka University Institutional Repository

দিলে তাকে অমঙ্গলের আধাঁর বলা হয় এবং কখনও কখনও তার গুরুজনকে "বংশের বাতি দেওয়ার কেউ রইল না" বলে আক্ষেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখা যায়।

শৈশবে নারী (ছেলেমেয়ে বৈষম্য) ঃ

ছেলে এবং মেয়েদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ শৈশবকাল থেকে শুরু হয়ে যায়। ধর্ম ভেদে ছেলে শিশুর নামকরণ উৎসব বেশ ঘটা করে উজ্জাপন করা হয়। ছেলের আকিকার জন্য দুটি খাসি এবং মেয়ের আকিকার জন্য একটি খাসি উৎসর্গ করার রেওয়াজ রয়েছে মুসলমানদের মধ্যে। এতে পুত্র সন্তানের গুরুত্ব কন্যার দ্বিগুন হিসেবে বিবেচনা করতে দেখা যায়। আবার কন্যা শিশুটির জন্য হাড়ি- পাতিল পুতুল ইত্যাদি মেয়েলি খেলনা দেওয়া হয় আর ছেলে শিশুটির জন্য ব্যাট, বল, বন্দুক গাড়ি, ঘোড়া, সাইকেল, ইত্যাদি খেলনা কিনে দিতে দেখা যায়। এখানেই বপিত হয় ছেলে মেয়ের বিভেদের বীজ। ছেলেকে সব সময় বুঝানো হয় তুমি ছেলে তোমাকে বড় হয়ে বাড়ি, গাড়ি, ধনসম্পত্তির মালিক হতে হবে, মা-বাবা বৌ ছেলেমেয়ের দায়িত্ব নিতে হবে, আর মেয়েকে বুঝানো হয় সবকিছুর পরে তুমি মেয়ে এবং তোমাকে বড় হয়ে ঘর সংসার রান্না-বান্না সন্তান লালন পালন ইত্যাদি করতে হবে। বর আসবে এখনি নিয়ে যাবে তখনি ইত্যাদি গান গাইয়ে বোঝানো হয় তুমি এ সংসারের কেউ নও, তোমাকে অন্যত্র প্রতিস্থাপন করা হবে। আবার সোনা নাচে কোনা বলদ বাজায় ঢোল, সোনার বউ রেধে রেখেছে ইলিশ মাছের ঝোল" জাতীয় ছড়া কবিতার মাধ্যমে শিশুকে এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে 'সোনা' অর্থাৎ ছেলে শিশুটির জীবন সব সময় নাচ-গান অর্থাৎ আনন্দ উৎসবে আরাম আয়েশে পূর্ণ থাকবে এবং এ পূর্ণতা আনার ক্ষেত্রে তার জন্য বউ আনা হবে যে কিনা তার জন্য ইলিশ মাছের ঝোল অর্থাৎ মজার মজার রান্না-বান্না করে রাখবে এবং সেক্ষেত্রে পুরুষের রসনা পূর্তির জন্য নারী সামগ্রীক ভাবে নিজেকে নিবেদিত করবে এবং এ কাজকেই তার কর্তব্য হিসেবে বোঝান হয়। কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত এবং আধা শিক্ষিত মা এবং বাবাদের সাথে কথা বলেছি গবেষণার প্রয়োজনে। তাদের রিপোর্ট হল এই যে দুজনকে একই খেলনা কিনে দেওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি হাড়ি, পাতিল পুতুল এসব খেলনা নিয়ে খেলতে বেশী ভালবাসে আর ছেলেটি ব্যাট বল, গাড়ি, ঘোড়া নিয়ে খেলতে বেশী ভালবাসে। এর মূল কারণ হচ্ছে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। মেয়ে শিশুটি তার নিজের সাথে মায়ের মিল খুঁজে পায় এবং সে তার মাকে কিংবা অন্যান্য নারীকেই শুধু দেখে রান্না-বান্না, সন্তান পালন, ঘর-গোছান, পরিস্কার করা ইত্যাদি গৃহস্থালী কর্মে নিবেদিত। তাই সে মেয়ে হিসেবে মাকে অনুকরণ করতে

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করে এবং খেলনা গুলির সাথে মায়ের গৃহস্থালী কর্মের সামঞ্জস্য খুঁজে নিয়ে নিজেকে মায়ের প্রতিভূ রূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় মগ্ন করে। আবার টিভি দেখার ক্ষেত্রে ও ভিন্নতা দেখা যায়। ছেলেটি কুস্তি, মারামারি ইত্যাদি এ্যাকশন ধর্মী অনুষ্ঠান উপভোগে আগ্রহী আর মেয়েটি নাচ-গান সিরিয়াল সিনেমা ইত্যাদি দেখতে পছন্দ করে- যা সে তার মায়ের সঙ্গে উপভোগ করে। কিন্তু কার্টুন ছবি উপভোগের বেলায় এদের একই ধরণের রুচি পরিলক্ষিত হয়। আবার কম্পিউটার গেম খেলার ক্ষেত্রে ও একই রকম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কারণ এসব বিষয়গুলি নারী-পুরুষ নিরপেক্ষ। স্বচ্ছল চাকুরিজীবি মায়ের মেয়েরা শাড়ী পড়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে অফিসে যাওয়ার খেলা খেলে। আবার উচ্চবিত্ত, বা নিম্নবিত্তের মেয়েরা শাড়ী পড়ে বউ সাজে, লিপষ্টিক টিপ দিয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে, বা চুল সাজিয়ে বেড়াতে যাওয়ার খেলা খেলে। আজকাল শহুরে মধ্যবিত্ত গৃহিনীদের মেয়েরা হিন্দি কিংবা বাংলা সিনেমার নায়িকাদের অনুকরণে নাচ গান করে বউ সাজে, ঘর সাজায়, কেনা-কাটায় যায়, পুতুল বিয়ে খেলে কিংবা অভিনয় করে। মোট কথা একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি তবে ভিন্ন আঙ্গিকে।

আর ছেলে শিশু তার বাবার অনুকরণে প্যান্ট সার্ট, টাইস্যুট, জুতা পরে, গাড়ি চড়ে হাতে ডামি সিগারেট নিয়ে কিংবা মুখে পুরে অফিসে-বাজারে কিংবা বাইরে বেড়াতে যাওয়ার খেলা খেলে। আবার অন্যকে আদেশ উপদেশ দেয়, কুস্তি মারামারি, যুদ্ধ ইত্যাদি শক্তি প্রয়োগকারী খেলা খেলে। খেলার মাঠে কিংবা ভাই বোনদের মাঝে ছেলেটি বেশী আক্রমনাত্নক, শক্তি প্রয়োগকারী, জিনিসপত্র বিনষ্টকারী। এগুলিকে আমাদের সমাজের স্বাভাবিক চিত্র হিসেবে দেখে বলে শিশুর অবচেতন মনে তা গভীর রেখাপাত করে এবং শিশুর নিজের অজান্তেই নারী-পুরুষ বৈষম্য বোধ চলে আসে। ছেলে শিশুটির মধ্যে সুবিধাভোগী এবং শ্রেষ্ঠত্বের বোধ জন্ম নেয় এবং মেয়েটির মধ্যে দুর্বল নারী সুলভ চিন্তা ভর করে।

একই পরিবারের ভাইকে যত্ন করার এবং নিজের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়ার শিক্ষা বোনকে দেয়া হয় (বোনটি ছোট হলে ও)। ভাইটি শারীরিক ভাবে শক্তিশালী এবং বয়সে বড় হলেও ভাইয়ের কাজকর্মে সাহায্য সহযোগিতা করাকে বোনের কর্তব্য হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ভাইয়ের কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখা, ভাইদের পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখা, ভাইকে দুধের গ্লাসটি এগিয়ে দেয়া ইত্যাদি শিক্ষা দানের মাধ্যমে পরিবারে ছেলেকে শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসেবে তৈরী করা হয়। আর অপেক্ষাকৃত কম শক্তির অধিকারী মেয়েটিকে কঠোর পরিশ্রম করা, সেবিকা হিসেবে ভাইয়ের বা পিতার অর্থাৎ পুরুষের মঙ্গল সাধনের জন্য নিজেকে

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদন করার শিক্ষা দেয়া হয়। একই বয়সের দশ-বারো বছরের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে(গ্রাম-গঞ্জে) ছেলেটিকে চুল আছরে জুতা জামা পরিয়ে মাঠে খেলতে পাঠানো হয়। আর মেয়েটিকে মায়ের গৃহস্থালী কাজে সাহায্য করা, সেলাই শেখা, কিংবা পরিবারের সবার জন্য বৈকালিক নাস্তা বানানোর শিক্ষা দেওয়া হয় কিংবা চুল বেঁধে হাতে মেহেদী দিয়ে কপালে টিপ দিয়ে নিজেকে রমনীয়, কমনীয়, মোহনীয় করে তোলার দীক্ষা দেওয়া হয়।

কৈশরে নারী (আচরণ গত শিক্ষা) ঃ

পরিবারে নারী ও পুরুষের আচরণ গত শিক্ষায় রয়েছে প্রবল বৈপরীত্য। "নারী ও পুরুষের অঙ্গভঙ্গির ও রয়েছে আলাদা ব্যাকরণ। নারী হাঁটবে মাথা নিচু করে, পুরুষ হাঁটবে সদর্পে। ধীর পদক্ষেপে হাঁটা, দেহ সংকুচিত করে রাখা, অবনত মস্তক ও মৃদু হাসি ইত্যাদি অঙ্গভঙ্গিকে মনে করা হয় নারী সুলভ; যা দুর্বল ভিতু, লাজুক, নির্ভরশীল হিসেবে নারীর সামাজিক নির্মাণের প্রকাশ। পক্ষান্তরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, স্পষ্ট স্বরে কথা বলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ছেলে শিশুর পুরুষ চরিত্র নির্মাণ করা হয় যাতে তার কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, সাহস প্রকাশ পায়। পুরুষের জন্য নির্ধারিত অঙ্গভঙ্গি নারী করলে তাকে বেহায়া বা মর্দানি, কিংবা পুরুষ নারীর জন্য নির্ধারিত অঙ্গভঙ্গি করলে তাকে হাফ-লেডি বা মেনিমুখো আখ্যায়িত করে সামাজিক অবমাননার শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে অঙ্গভঙ্গির জেন্ডার ভিন্নতা নিশ্চিত করা হয়।[৮]

এক্ষেত্রে কৈশরে পরিবার থেকে লব্ধ আচরণ গত শিক্ষা নারীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় অধস্তনতার ভিত রচিত হয়। মানুষ হিসেবে ছেলে মেয়েদের কোন সর্বসম্মত বৈষম্যহীন আচরণ আজও আমাদের সমাজ অনুমোদন করে না।

খাদ্য ঃ

আমাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ছেলে মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক বন্টণ প্রথা প্রচলিত। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন বিত্তদের মধ্যে দেখা যায় দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ছেলের জন্য বরাদ্দ মেয়ে শিশুর দ্বিগুন। ছেলে ও পিতা যদি একটি করে ডিম পায় কন্যা শিশু ও মাতা পাবে অর্ধেকটা। এক্ষেত্রে কন্যা শিশু প্রতিবাদ করলে তাকে আদরে বা ধমকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় এটাই নিয়ম। কন্যাটি খুব কষ্টের সাথে এ প্রক্রিয়া মেনে নিতে বাধ্য

---

[৮] গীতি আরা নাসরীন, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা, " অলিখিত জেন্ডার ব্যাকরণ নিয়ে পুর্ণভাবনা, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট এয়োদশবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মার্চ- ২০০৭, পৃঃ ২৯

Dhaka University Institutional Repository

হয়। আবার কোন কোন পরিবার পিতা পুত্রের আহার শেষে মা-মেয়ে বাকী টুকু খাবে, না থাকলে উপোষ করবে। নারী পরিশ্রম করবে বেশি অথচ খাদ্য গ্রহণ করবে কম। এভাবে একটি মেয়ে শিশু দুর্বল দেহ শৈশ্চব নিয়ে বড় হয়ে উঠে যার ফলে অনেক মেয়ে অপরিণত বয়সেই নানা রকম রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। দেখা যায় উচ্চ হারে মাতৃমুত্যু। "পরিবারের খাদ্য বন্টনের উপর পরিচালিত অনেক গবেষণাতেই দেখা গেছে যে, নারী দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালোরীতে প্রায়ই ঘাটতি থাকে। এবং তারা মারাত্মক অপুষ্ঠিতে ভোগে। পুরুষ এবং নারী সদস্যদের স্বার্থের জন্যে গৃহীত ব্যবস্থাদিতে ও এমনতর অসমতা পরিলক্ষিত হয়।"[৯]

অথচ এই বৈষম্য দূর হলে সমাজ নারীর নিকট থেকে আরও বেশী সেবা পেতে পারত। তবে সামাজিকীকরণের ফলে নারীর মধ্যে যে অধস্তন মনোভাব জন্ম হয় তাকে এ সমাজ 'মূল্যবোধ'বলে ধরে নেয়। এই মূল্যবোধই তাদের সার্বক্ষণিক পুরুষের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত করে। তাই পরিবারের খাদ্য তৈরী ও বন্টনের ভার যেহেতু তার হাতে, সেহেতু সবার খাদ্য বন্টনের পর অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করে এক ধরণের স্ব-আরোপিত বঞ্চনার ভাগীদার হয় সে বা পরবর্তীতে তার মেয়ে শিশুটির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এটা সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসের দ্বারা স্থিরকৃত। এ বিশ্বাসের মূল বক্তব্য হল পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দীর্ঘজীবন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। " আবার না খেয়ে থাকে সে, সবসময় শুধু খাবার কম পেয়েছে বলে নয়, আধুনিক সমাজের সৌন্দর্য পরিমাপক অনুযায়ী 'স্লিম' হওয়ার জন্য।[১০]

পোশাক ঃ

"..... নারীদের জন্য আবরণ ও আভরণ অত্যন্ত দরকারি। তার অবস্থান চিহ্নিত করার উপায়। সে কুমারী, এয়োতি না বিধবা এটি তাকে সর্বক্ষণ বলে দিতে হয় ভূষণ দিয়ে। স্বামী বা আশ্রয় থাকলে তার জীবন রঙ্গিন-সালংকার, না থাকলে রংহীন-নিরাভরণ। স্বামী বা পিতার বিত্ত পদমর্যাদার স্বাক্ষর বহন করে নারী নানা ভাবে নিজের শরীরে। নিজেকে তার নানা ভাবে সাজাতে হয় আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য। পুরুষের পোশাক সাধারণত হয় অনেক কেজো ও ঢিলে ঢালা, সহজে চলাফেরার উপযোগী, পেশাকেই পকেট-জেব থাকে জিনিসপত্র সহজে বহনের জন্য। নারীর পোশাক তার কমনীয় ধীর পদক্ষেপে হাঁটা, দেহ সংকুচিত রাখা, পোশাক নিয়ে

---

[৯] লায়লা কবির, অধস্তনতা এবং সংগ্রাম : বাংলাদেশের নারী, বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ, হাসিনা আহমেদ অনুদিত, পৃ:-১৩

[১০] গীতি আরা নাসরিন, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা: 'অলিখিত জেন্ডার ব্যাকরণ নিয়ে পুর্নভাবনা" উন্নয়ন পদক্ষেপ, এয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চ-২০০৭, পৃঃ ২৯।

ব্যতিব্যস্ত করে রাখার মতো করেই বানানো। মূলত নারীর পোশাক তার দৈহিক আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি অথবা অন্যের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য তৈরী।"[১১]

পোশাক হল শারীরিক আচ্ছাদন যা মানুষকে লজ্জা নিবারণ তথা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার হাত থেকে মুক্তি বা স্বাচ্ছন্দ দিতে পারে। কিন্তু নারীর পোশাক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার স্বাচ্ছন্দের জন্য তৈরী নয়। এটি ও নির্ধারিত হয় পুরুষতান্ত্রিকার ভিত্তিতে। আর্দ্র ও উষ্ণ দেশের নারীরা আপাদমস্তক মুড়ে রাখে, আমাদের দেশে প্রচন্ড গরমে গলধ ঘর্ম হয়েও পারিবারিক মর্যাদা রক্ষায়, কিংবা পুরুষের কুনজর থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য নারীকে হয় হেজাব পড়তে হয় না হয় ঘোমটা দিতে হয়, না হয় পোশাকের আতিশয্যে নিজেকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়, আবার শীতের দেশের নারীদের স্বল্প আবরণের পোশাকের প্রচলন দেখা যায়। পুরুষতান্ত্রিকতার আবর্তে "নারী যে পোশাক পরে নিজের স্বাচ্ছন্দের জন্য নয়, যৌন বস্তু হিসেবে, তখনো বুঝিনি। এখন জানি, কেন নারীকে নাকে-কানে ছ্যাঁদা করতে হয়। কোঁকড়ানো চুল সোজা, আর সোজা চুল কোঁকড়াতে হয়; টেনে তুলতে হয় বাড়তি লোম, স্বাভাবিক রঙকে অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় করে তুলতে হয় ফ্যাকাশে। কেননা নারীর মূল্য নির্ধারিত হয় প্রধানত সে দেখতে কেমন তা দিয়ে।

পুরুষের শারীরিক নির্মাণ ও শক্তিমত্তার ছাঁচে বন্দি। পেশিবহুল এমনকি লম্বা হওয়ার প্রচেষ্টায়, না হতে পারায় গ্লানিতে নিজেকে খাটো ভেবে ব্যথিত জীবন কাটায় অনেক পুরুষ। আমাদের অজ্ঞাত সারে অবাচনিক আচরণ শেখানো হয় শৈশব থেকেই। বাচনিক যোগাযোগের মতোই অবাচনিক আচরণ আমাদের ছেলে বা মেয়ে হিসেবে গড়ে তোলে। "ছেলেরা আবার কাঁদে নাকি" মেয়েদের এতো লাফালাফি করতে হয় না, 'ছেলে হয়ে রান্না ঘরে ঘুর ঘুর করছো কেন', 'চোখে নামিয়ে কথা বলো-সঠিক অবাচনিক আচরণের এই পাঠ আমাদের দেয়া হয়েছে অবিরত। ছেলে শিশুটিকে কল্পিত মাসল্ দেখাতে বলে জোর দেওয়া হয়েছে পেশিশক্তিকে, আর মেয়ে 'শিশুটিকে লক্ষ্মী মেয়েরা দুষ্টুমি করে না' বলে শেখানো হয়েছে সংযত আচরণ।"[১২]

---

[১১] প্রাগুক্ত।
[১২] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আবার 'রেশম কোমল' 'ভ্রমর কালো' 'দীঘল কালো চুল' 'মেঘ বরণ কেশ' ইত্যাদি উপমার মাধ্যমে নারীকে ঘন লম্বা কালো কেশ রাখার জন্য উৎসাহিত করা হয়। যাতে নারীর অবসর সময়টুকু ও চুলের যত্নে নিয়োজিত করতে হয়।

সে দীঘল কালো চুল পাওয়ার আশায় চুলে তেল মাখাবে, অনেক সময় ধরে চুল আছড়াবে, খোপা কিংবা বেনী বাঁধবে, এক কথায় এক্ষেত্রে তাকে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। এছাড়া আধুনিক শহুরে মেয়েরা তাদের চুল রাঙ্গাতে, মেহেদী মাখাতে, চুল সোজা কিংবা কোঁকড়াতে পার্লারে যেয়ে প্রচুর সময় নষ্ট করে থাকে। এতে সময় ও অর্থ উভয়েরই প্রচুর অপচয় হয়। আর এসব কর্মকান্ডের মূলে আছে পুরুষ তান্ত্রিকতার প্রভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রয়াস। এই সময়টা তারা বিদ্যা শিক্ষা কিংবা অন্য কোন সৃষ্টিশীল কাজে ব্যয় করলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এমননি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের পথেও সমাজ আর একধাপ এগিয়ে যেতে পারত। এই আবর্ত থেকে নারীকে মুক্ত হতে হলে প্রকৃত সুশিক্ষার প্রয়োজন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ঃ

উন্নয়নের সবচেয়ে বড় মাধ্যম শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্তি, যুক্তি ও বাস্তব জীবন বোধ দান করে। তাই বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন জীবন ভর। কিন্তু আজও সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে দরিদ্র জন গোষ্ঠীর মধ্যে নারী শিক্ষার ব্যাপারে প্রচন্ড অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। ছেলে শিশুটি বড় হয়ে সংসারে হাল ধরবে এই আশায় অনেক কষ্ট করে হলেও ছেলেটিকে স্কুল-কলেজে পড়ানো হয়। এজন্য মা-বাবা-বোন তার জন্য প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করে টাকা পয়সা রোজগার করে। আর অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ থাকলে ও মেয়ে শিশুকে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে পিতা-মাতার আগ্রহ কম দেখা যায়। গৃহকর্ম শিক্ষা এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধু কোরান শিক্ষা, মাদ্রাসা কিংবা হাফেজী পড়ানোর ক্ষেত্রে পিতা মাতার আগ্রহ দেখা যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা কিংবা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পাড়ানোকেই অনেকে যথেষ্ট মনে করেন। কারণ মেয়ে বড় হয়ে পরের ঘরে চলে যাবে- আর পিতা মাতাকে উপার্জন করে ও খাওয়াবে না। সুতরাং তার জন্য এত 'পয়সা নষ্ট' করে কোন লাভ নাই। আবার মধ্যবিত্ত পরিবার গুলিতে মেয়েকে স্কুল-কলেজে শিক্ষা দান করা হয় তার বিয়ে হওয়া পর্যন্ত যতটা শিক্ষার প্রয়োজন ততটাই । বিয়ের পর অনেক মেধাবী মেয়েরই পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায় স্বামী সংসারের যত্ন নেওয়ার অজুহাতে। আর সংসারের আয় ব্যয়ের

Dhaka University Institutional Repository

হিসাব রাখা, সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে যতুটুকু বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন ততটুকু শিক্ষা হলেই নারীর জন্য যথেষ্ট বলে অনেকে মনে করেন। আবার অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছেলেটির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে গৃহশিক্ষক রাখা হয় ভাল ফলাফলের প্রত্যাশায়। কারণ বড় হয়ে সে তো জজ-ব্যারিষ্টার, ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু মেধাবী মেয়েটিকে অনেক সময় গৃহস্থালী কিংবা সাংসারিক কাজের কারণে ঠিক মত পড়তে বসার সুযোগও দেওয়া হয় না। কারণ সে তো আর বড় হয়ে বাবা-মা এর দেখা শুনা করবে না, বা বড় চাকরী করবেনা যাবে তো সেই পরের ঘরে হাড়ি ঠেলতে। তাই নানা রকমের সেলাই, রান্না বান্না ও বিভিন্ন স্বাদের আচার চাটনি বানানোর দক্ষতাই তার জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হিসাবে দেখা হয়। আবার এও দেখা যায় যে-ছেলেটিকে স্কুলে পাঠানোর সময় তার ব্যাগে অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু টিফিন দিয়ে দেওয়া হয় যা মেয়েটির ভাগে জুটে না। আবার শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে দেখা যায় ছেলেটিকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ানো হয় এবং মেয়েটিকে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ানো হয়। এর কারণ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ানো খরচ বেশী এবং সে খরচ মেয়ের জন্য করতে অনেকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকেন না। বাংলা মাধ্যম কিংবা সরকারী স্কুলে পড়ানোর খরচ কম। নাগরীর কয়েকটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ঘুরে দেখা গেছে গড়ে একটি শ্রেণীতে ছাত্রের সংখ্যা ছাত্রীদের প্রায় দ্বিগুণ-কিংবা তিনগুণ। অনেক পিতা-মাতার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে জানা গেছে এ যুগে ইংরেজী না জানলে তার কোন মূল্য নাই-তাই ছেলেটিকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো হয় আর মেয়েটিকে ভিখারুননেসার মত কয়েকটি ভাল স্কুলে ভর্তি করাণোর জন্য বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ানো হচ্ছে। ছেলেকে বড় হলে বিদেশে পাঠানোর উদ্দেশ্যও অনেক পরিবারে এই প্রবণতা দেখা যায়। মেয়ে বড় হলে দেখে শুনে একটি ভাল ঘরে বিয়ে দিলেই তারা সন্তুষ্টির শেষ পর্যায়ে পৌছে যাবেন এমনই তাদের ধারণা। কিন্তু বিয়ের পর মেয়েটির জীবনে সর্বাঙ্গীন সুখ আসবে কিনা সে ব্যাপারে তাদের ততটা চিন্তা যুক্ত দেখা যায় না। বিয়ের পর মেয়েটিকে স্বামী পড়তে দিলে পড়বে, চাকুরী করতে দিলে সে চাকুরী করবে-না দিলে ঘর সংসার করবে। এক কথায় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সবসময় নারীকে অধস্তন রাখার কাজেই নিয়োজিত।

"শিশুকাল থেকেই পুত্রের লেখাপড়া, খেলাধুলা, স্বাস্থ্যোন্নতির চিন্তাভাবনার কর্মসূচী ভিন্ন। মেয়েরা লেখা-পড়া করে তো চাকরী করবে না অথবা ইমারত তৈরীও করে দেবে না। কিংবা বংশের বাতিতে তেলও ঢালবে না। সমাজের বিধান অনুযায়ী নারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র সংসার,

Dhaka University Institutional Repository

রান্নাঘর, সন্তান পালন, পতিসেবা, আতিথেয়তা ইত্যাদি। Ashley Montagu তাঁর The Natural Superiority of Women গ্রন্থে এ সম্পর্কে পরিস্কার বক্তব্য রেখেছেন:

"Women have been encoruaged in the development and preservation of womanly virtues, to know their place which is in the home and not to aspire to be anyting other than what by nature they were intended to be. (fifth printing, Page-161)

অনেকের মন্তব্যে বর্তমান যুগে এসব কথা খাটেনা। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে পুরুষের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে নারীর শিক্ষা, চাকুরী, ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সুবিধে ইত্যাদির ক্ষেত্র অতীব সীমিত।[১৩]

শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বৈষম্য গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে বেশ কিছুটপা হ্রাস পেয়েছে। "সাক্ষারতার ক্ষেত্রে ১৯৭০ সালে সাক্ষর নারীর অনুপাত যেখানে ছিল ৩৩ শতাংশ ১৯৯৪ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশে। কিন্তু এখনও বাংলাদেশে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক নারী নিরক্ষর । পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ৫২ শতাংশ। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মেয়েদের অন্তর্ভূক্তির হার ছেলেদের ৫৪ শতাংশ, প্রাথমিক স্তরে এই হার যদিও ৮৮ শতাংশ।[১৪]

ব্যাপক প্রচারণা ও জনসচেতনার ফলে "প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির ব্যাপারে লিঙ্গ বৈষম্য দূর হলেও স্কুলে উপস্থিতির ব্যাপারে এবং শিক্ষা সমাপনের ব্যাপারে লিঙ্গ বৈষম্য দূর হয়নি। শতকরা প্রায় অর্ধেক ছাত্রীই শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে না। দেখা গেছে S. S. C পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৫ জন হচ্ছে ছাত্রী। অথচ মাধ্যমিক স্কুল ভর্তিকৃতদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৫৪ জন হচ্ছে ছাত্রী। আর ও যে একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে তা হলো- পাশের ক্রম হ্রাসমান হার। দেখা গেছে ১৯৯৯ সালে পাশের হার ছিল প্রায় ৫৫ শতাংশ। ২০০৩ সালে তা কমে দাড়ায় প্রায় ৩৬ শতাংশে।[১৫]

---

[১৩] আখতার ইমাম, পুরুষের মূল্য, বাছাই রচনা, প্রসঙ্গ নারী: প্রকাশক আখতার ইমাম, পরিবেশনা-জাতক, জানুয়ারী-১৯৯২, পৃ: ১০।

[১৪] এস, এ, মান্নান রিভিউ প্রবন্ধ, মানব উন্নয়ন সূচক উন্নয়ন সূচক এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, পঞ্চদশ, খন্ড, ফাল্গুন ১৪০৪, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, পৃঃ ১২৩।

[১৫] ডঃ প্রতিমাপাল মজুমদার বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা বাজেট ও নারীর ক্ষমতায়ন, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ইনস্টিটিউটর ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যাড ডেভেলমেন্ট, জুন, ২০০৫, পৃ: ১৫

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার ফলে ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থবিরতা দেখে যায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়েও ছেলের অনুপাত যে সব দেশে ০.৭৫ এর ও কম সেসব দেশের জিএনপি (মোট জাতীয় উৎপাদন)-যে কোন দেশের চেয়ে প্রায় ২৫ শতাংশ কম।[১৬]

৪.২.২ বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি ঃ নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ

"বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭(ক) অনুচ্ছেদ- এর রাষ্ট্র পরিকল্পনার প্রাথমিক নীতি হিসেবে একটি অভিন্ন গণমুখী এবং সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা হবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। সংবিধানে সবার জন্য সমান শিক্ষা এবং জমিতিয়েন ঘোষনায় (১৯৯০) বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগের কথা থাকলে ও বাস্তবে তা পুরোপুরি কার্যকর হচ্ছে না। .... আন্তর্জাতিক সহযোগীতার জন্য জাপানী ব্যাংক-এর একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষার ফলাফল বলছে, বাংলাদেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর দুই তৃতীয়াংশই হচ্ছে নারী ও মেয়েশিশু। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ঝরে পড়া নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি। সাংসারিক কাজকর্ম, সন্তান লালন পালন উদ্বেগ ও পারিবারিক অশান্তির কারণে নারীরা পূর্ণাঙ্গভাবে শিক্ষা-কর্মসূচি সমাপ্ত করতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। দিনমজুর অথবা গৃহস্থালী মজুরের কাজ করতে গিয়ে অধিকাংশ মেয়ে শিশু নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে আসতে পারছে না।[১৭]

প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা অনগ্রসর বলে আজও সার্বিক ভাবে নারী উন্নয়ন সম্ভব পর হয়নি। পুরুষের পাশাপাশি তারা তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ডেন্ডার বৈষম্যের একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি-৪.১ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

---

[১৬] উন্নয়ন পদক্ষেপ, ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ত্রিশতম সংখ্যা, জুলাই- সেপ্টেম্বর-২০০৩।

[১৭] ফখরুল ইসলাম "শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা", বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, চতুর্বিংশতিতম খন্ড বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৩, ফেব্রুয়ারী, ২০০৭, পৃঃ ১৩০।

সারণি- ৪.১

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপাত

বছর	ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপাত
১৯৮০	৬০:৪০
১৯৮৫	৬০:৪০
১৯৯০	৫৫:৪৫
১৯৯৫	৫১:৪৯
২০০০	৫০:৫০

সূত্রঃ বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৩, UNDP Report 1999& 2003

"গত এক দশকে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করায় শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের কারণে দেশে প্রাথমকি স্তরে মোট ভর্তির হার এখন ৮৯ শতাংশ। উপরন্ত প্রাথমিক শিক্ষায় ডেন্ডার বৈষম্য কেবল হ্রাসই পায়নি, বরং মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদেরকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রী ভর্তি যথাক্রমে ৯৭ শতাংশ ও ৯৮ শতাংশ। .... বিশ্বব্যাংক এর তথ্যমতে ৬-১০ বছরের ৮০ শতাংশ বালিকা এখন প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালক ও বালিকার ভর্তি অনুপাত ২০০৩ সালে ছিল ৫০ঃ ৫০। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা সফল হয়েছে। তবে এই নাটকীয় অর্জনের পাশাপাশি কতগুলো চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কেননা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার মাত্রাতিরিক্ত; ২৬ শতাংশের ও বেশী ছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার ক্ষেত্রেও ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা পিছিয়ে আছে। ঝরে পড়া ছেলেদের হার এক্ষেত্রে প্রায় ৬৩ শতাংশ, মেয়েদের হার ৫৭ শতাংশ। ব্যানবেইস সূত্রমতে, দেশের দেড়কোটি স্কুলগামী মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩৩ শতাংশই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পূর্বে ঝরে পড়ে। নারী উদ্যোগ কেন্দ্রর প্রতিবেদন অনুসারে দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয় না। অন্য একটি জরিপ থেকে জানা যায়, ১.৫

Dhaka University Institutional Repository

মিলিয়ন মেয়েশিশু স্কুলে যাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে ও ছেলের ভর্তির অনুপাত ২০০৪ এ ছিলো ৪৮ঃ৫২ (BANBEIS.2003)

ইউনিসেফের জরিপ অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রযোগী বয়সের প্রায় ১২ লাখ স্কুলে গমনপোযোগী যায় না, এদের মধ্যে ৫৩শতাংশই মেয়ে।[১৮]

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ

প্রচলিত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় জেন্ডার বৈষ্যম্যের কারণে সাংসারিক কাজের চাপ, উপার্জমূলক কাজে নিযুক্তি। সামাজিক নিরাপত্তহীনতা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বাধাবিপত্তি ডিঙ্গিয়ে মাধ্যমিক স্তরের পড়াশুনা চালানো কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যাওয়া অধিকাংশ মেয়ের ক্ষেত্রেই কষ্টকর ব্যাপার। ফলে এ স্তরে ছাত্রী ভর্তির হার তুলনামূলক ভাবে হ্রাস পেতে থাকে এবং একই সাথে ঝরে পড়ার হার ও বৃদ্ধি পায় উদ্বেগজনক ভাবে। ব্যাপক প্রচার প্রচারণা সরকারের বিশেষ উদ্যোগ ও বিনিয়োগের কারণে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী ভর্তির হার গত দুই দশকের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটা একটি আশাব্যঞ্জক ব্যাপার। "সম্প্রতি বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, উপবৃত্তি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কারণে মেয়েদের স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেলেও ছেলেদের হার কিন্তু হ্রাস পাচ্ছে। সেই সঙ্গে আবার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের ঝড়ে পড়ার বা ড্রপ আউটের হার ও কমছে না। উদাহরণ স্বরূপ-১৯৯৭ থেকে ২০০২ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুলে ভর্তির অনুপাত ছিল ছেলেদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৪৭ শতাংশ (ইউনিফেস ২০০৪)। একইভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ক্ষেত্রে খুব কম হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যানবেইস ২০০৩ অনুসারে ১৯৯৮ থেকে ২০০২সালের মধ্যে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৩৯.৪ শতাংশ, অন্যদিকে ছেলেদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল মাত্র ১১.২ শতাংশ। ফলে এক্ষেত্রেও এক ধরণের বৈষম্য থেকেই যাচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ঝরে পড়ার (drop out) হার বেশি।

স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রোফাইল ইন এডুকেশন ইন বাংলাদেশ ব্যানবেইস এর ২০০৩ সালের তথ্য অনুযায়ী দেশে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী অর্থাৎ নিম্নমাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ১৭.৭২ শতাংশ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার ৪৫.৮০ শতাংশ। বাংলাদেশ

[১৮] ফখরুল ইসলাম, শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্যঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, চতুর্বিংশতিতম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৩, পৃঃ ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বি বি এস) তথ্য মতে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার অধিক (সারনি ৪.২)

সারনি ৪.২

মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার

গ্রেড	পুরুষ	মহিলা	সর্বমোট
ষষ্ঠ	৩.১	২.৯	৩.০
সপ্তম	৭.৮	১৪.৮	১৫.৭
দশম	১৭.৮	২০.৫	১৯.০

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

গণমাধ্যমের কল্যাণে ও গণসচেতনার ফলে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির ব্যাপারে লিঙ্গ বৈষম্য অনেকাংশে দূর হলেও স্কুলে উপস্থিতির ব্যাপারে এবং শিক্ষা সমাপনের ব্যাপারে লিঙ্গ বৈষম্য দূর হয়নি। নারী শিক্ষায় বিনিয়োগকে অর্থনৈতিক ভাবে কম লাভজনক বলে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা যেহেতু এখনো এ সমাজে অনেকের কাছে সুযোগ লাভের বিষয়; তাই ছেলে সন্তানরাই এ সুযোগ পায় অধিক। কারণ ছেলে হলো বংশের প্রদীপ তাই তাকে প্রজ্জ্বলিত রাখার রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষার তেল ঢালতেই হবে।

উচ্চ শিক্ষার নারী ঃ

শিক্ষার স্তর যতই উর্ধ্বে উঠেছে ততই লিঙ্গ বৈষম্য প্রকটতর হয়েছে। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্য দেখা যায় টারশিয়ারী (Tertiary level) বা তৃতীয় স্তরে "যেখানে মেয়ে ও ছেলের অনুপাত ২০০৫ এ ছিল ৩৬: ৬৪। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের অবস্থান প্রায় কাছাকাছি। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০ হাজারের ও বেশি। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৪৫ শতাংশ। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তথ্য (ইউজিসি রিপোর্ট ২০০৫) অনুযায়ী, দেশের সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ লাখ ৬ হাজার ৫৬৪ জন। এর মধ্যে ৯ লাখ ৩ হাজার ৮৭৯ জন ছেলে এবং মাত্র ৩ লাখ ২ হাজার ৬৮৫ জন মেয়ে অর্থাৎ মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ২৫.৮ শতাংশ মেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থীর ৬৫.৮৬ শতাংশ ছেলে ও ৩৪.১৪

Dhaka University Institutional Repository

শতাংশ মেয়ে। কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে মেয়েদের সংখ্যা বাড়লেও বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০০৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে বাণিজ্য বিভাগে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ২৪.৮ শতাংশ, মেয়ে। ২০০৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এর তথ্য অনুযায়ী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর ২৪.৩৮ শতাংশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮.২০ শতাংশ চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২৫.২২ শতাংশ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৩৩.৮ শতাংশ এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ১৪.৪৯ শতাংশ শিক্ষার্থী মেয়ে। দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর হার ১১ থেকে ২২ শতাংশ। ২০০৫ সাল পর্যন্ত দেশের ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার ৮০জন। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল প্রায় ১১ হাজার। এসব জরিপে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার জন্য বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক কারণকে দায়ী করা হয়েছে। এছাড়া ও মেয়েদের চলাফেরার সমস্যা, থাকার উপযুক্ত জায়গার অভাব, আর্থিক অসঙ্গতি, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি উচ্চ শিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯]

৪.২.৩ School Curriculum এর লিঙ্গ সংবেদনশীলতা ঃ

School Curriculum এ লিঙ্গ সংবেদনশীলতা সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রভাব রাখে কিন্তু আমাদের School Curriculum এ যথেষ্ট লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে যা নারীর অধস্ত নতাকে পৌনপুনিকতা দান করে। "শিক্ষানীতি ২০০০ এ জোরালো ভাবে উল্লেখ থাকলে ও এখন পর্যন্ত School Curriculum ঢেলে সাজানোর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। .... প্রথম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য সমাজ বিজ্ঞান এবং বাংলা বই পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এই বইগুলিতে নারীকে তার সনাতনী রূপেই (যেমন, মা বোন, কন্যা, গৃহিনী) চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বইগুলিতে যে ছবিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে ছেলেদের দেখানো হয়েছে কম্পিউটার ব্যবহার করছে দুরবীন ব্যবহার করছে, মসজিদে নামাজ পড়ছে এবং পরস্পর কোলাকুলি করছে, কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করছে ইত্যাদি রূপে। আর মেয়েদের দেখান হয়েছে রান্না করছে, ঘরের আঙ্গিনা পরিস্কার করছে, বাসন ধুচ্ছে, ইত্যাদি রূপে। যদিও স্কুলে যাওয়ার ছবিতে ছেলেমেয়ে উভয়কে একইভাবে দেখানো হয়েছে। স্বাধীনতার কথা তুলে ধরতে গিয়ে বীর শ্রেষ্ঠ পুরুষদের কথা বলা হয়েছে জোরালো ভাবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত স্কুলের কোন পাঠ্য

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩-১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

পুস্তকে বীর শ্রেষ্ঠ তারমন বিবির কথা তুলে ধরা হয়নি। সপ্তম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বইয়ের একেবারে শেষ অধ্যায় সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ সম্বন্ধীয় মতামত গুলি যে সত্যি নয় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে। বইয়ের সর্বশেষে অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এই অধ্যায়টি প্রায় পাঠ থেকে বাদ পড়ে যায়। আর বইয়ের সর্বশেষ অধ্যায়ে এই বিষয়টি তুরে ধরায় ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এটি একটি প্রান্তিক বিষয়।"[২০] এভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় ও অসচেতন ভাবে বৈষম্যমূলক সামাজিকীকরণের পুনরাবৃত্তি দেখা যা নারীর অধস্ত নতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে।

তারুন্যে এবং বিয়ের কনে হিসেবে নারী ঃ

সামাজিকীকরণের যে কঠোর আবর্তে একটি কন্যা শিশু বড় হতে থাকে তাতে সে ধীরে ধীরে মনে মগজে "অধস্তন নারী" রূপে তৈরি হতে থাকে। পিতৃতন্ত্রের দ্বারা তারুন্যে নারীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত থাকে। .. "নারীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর যৌনতা ও পনুরুৎপাদনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। পরিবারের সম্মান নারীদের সতীত্বের উপর নির্ভশীল বলে বিশ্বাস করা হয় এবং পুরুষগণ অভিভাবক এবং রক্ষকের ভূমিকা প্রাপ্ত বলে ধরা হয়। নারীদের সতীত্ব বিবাহপূর্ব সতীত্ব এবং বিবাহোত্তর বিশ্বস্ততা রক্ষায় জটিল সামাজিক ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থান করে পর্দা বা নারী নিঃসঙ্গতা। যৌনতার ভিত্তিতে 'বিশ্বকে' পৃথকায়িত করে এবং পর্দার মাধ্যমে নারীদেরকে বাড়ীর একান্ত ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখে। তাদেরকে বিনয়ী এবং বাধ্য হতে হবে যাতে অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টি আর্কষিত না হয়; নারীর কণ্ঠস্বর পরিবারের বাইরের কোন পুরুষের কানে পৌছাবে না। অবশ্যই নীচু সুরে সে কথা বলবে।"[২১]

মেয়ে সাবালিকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার গতি বিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। "কনের যৌন পবিত্রতা একটি সার্বক্ষনিক উদ্বেগ ও এ ব্যাপারে সতর্ক নজর রাখার প্রয়োজনীয়তা তৈরী করে এবং সাবালিকা হবার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। কাকে বিয়ে করবে তা নির্ধারণ করার খুব কম সুযোগই নারীদের রয়েছে। উপযোগী সঙ্গী মেলানো নিশ্চিত করতে

[২০] ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা বাজেট ও নারীর ক্ষমতায়ন, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ও ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, পৃঃ -১৭।

[২১] Cited in Mahmuda Islam, Social Norms, Institutions and Status of Women, in The situation of Women in Bangladesh ed. by Women for Women Research and Study Group Dhaka- 1979,P 227

Dhaka University Institutional Repository

অনানুষ্ঠানিক ভাবে মহিলা আত্মীয় ও সংবাদ সরবরাহকারীর একটি গোষ্ঠী কাজ করলে ও বিবাহ পুরুষ অভিভাবক গনের দ্বারাই সংঘটিত হয়।"[২২]

বর পক্ষ নানাভাবে প্রশ্ন করে, হাটিয়ে, বসিয়ে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে কনে কে পছন্দ করলে তবেই মেয়ের বিয়ে হবে। আর কনে দেখা ব্যাপারটি অনেকটা কোরবানীর হাটে গরু কেনার মত যা একটি মেয়ের জীবনের চরম অবমাননার পর্যায়। কিন্তু একটি যুবতী মেয়ের জন্য যাঁচাই বাছাই করে বর পছন্দ করার সুযোগ আমাদের দেশে নাই বললেই চলে। অপর পক্ষে পুরুষ কৈশর পেরিয়ে যৌবনে পর্দাপন করলে রোজগারী হওয়ার পথ বেছে নেয়। "কালক্রমে বিবাহযোগ্য পুত্রের জন্যে পরিবারের ও পুত্রের মনোমতো স্ত্রী সন্ধান চলতে থাকে। এখানে মনোমতো শব্দটি বিশেষ অর্থপূর্ণ। যে নারী সংসার চক্রের নিস্পেষণে স্বামীর আত্মীয় বন্ধুর মনোরঞ্জনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করে আপন ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিতে প্রফুল্ল চিত্তে প্রস্তুত শুধু সে নারীরই হবে সাধারণ মতে মনোমতো'।[২৩]

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া মেয়েটিকে এমনভাবে অপদস্থ করলেও নারীর এখানে কিছু হারাবার আছে বলে মনে করা হয় না-কারণ এ সমাজ মনে করে স্বামীই হল একটি নারীর জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয় সে হোক অকর্মন্য অপ্রকৃতিস্থ কিংবা শারীরিক প্রতিবন্ধী। আবার পাত্র পক্ষ মেয়েকে 'পছন্দ' না করে চলে গেলে মেয়েটির জীবনে অশান্তির আর সীমা থাকে না। তাকে নানা রকম অপবাদ ও অবমাননাকর কথা শুনতে হয় বিনা বাক্য ব্যয়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিরাট অঙ্কের যৌতুকের দাবীতে বিয়ে ভেঙে যায়। অনেকে এ দাবী মিটিয়ে ও কন্যা সমর্পন করেন।

স্বামী গৃহে নারী ঃ

আমাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া একটি মেয়েকে তৈরী করে এমনভাবে যেন সে চিরপরিচিতি পরিবারও পিতামাতাকে ছেড়ে স্বামী গৃহে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। একজন নারী বিয়ের পর পরিচিত হয় রহিমের বউ, বড়বাড়ীর ছোট বউ, করিমের মা, রজবের বোন, সেলিমের ভাবী ইত্যাদি নামে। বিয়ের পরপরই সে পিতামাতার দেয়া নামটিও পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। শহুরে শিক্ষিত ঘরে মিসেস রহিম, মিসেস আফজাল ইত্যাদি নামে পরিচিত হন। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর

---

[২২] লায়লা কবির, অধস্তনতা এবং সংগ্রামঃ বাংলাদেশের নারী, বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ, হাসিনা আহমেদ অনুদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ৯।
[২৩] আখতার ইমাম, বাছাই রচনাঃ প্রসঙ্গ নারী, জাতক, জানুয়ারী ১৯৯২, পৃঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

নামের সাথে স্বামীর পদবী জুড়ে দেওয়া হয়। Maria Mies তাঁর Indian Women and Partiarchy' গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বলেন "According to the cultural norm, the relationship between husband and wife is characterized by formal respect and distance. The wife owed the husband respect and obedience, but not love" এখানে মানবিক প্রীতির কোন সম্পর্ক নাই। বিয়ের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক ব্যবস্থাদি, নিজ বংশ এবং নিজ গ্রামের বাইরের মেয়েকে বিয়ে করার ব্যবস্থা এবং বিয়ের পরে স্বামীর পৈত্রিক পরিবারের সঙ্গে নারীর বাস করার ব্যবস্থা কার্যতঃ নারীর স্বকীয়তা ধ্বংস করায় বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে পিতৃগৃহের সার্বিক বন্ধন পরিহার করে স্বামী গৃহের নতুন পরিবেশে নতুন বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। আর এ বন্ধন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতায় আবদ্ধ যা শুধু স্বামী নামের মানুষটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে এবং স্বামী ও অন্যান্য পরিজনদের মনরঞ্জনের জন্য গৃহ বধূকে নিয়োজিত হতে হয় যেখানে নারীর পছন্দ অপছন্দকে মোটেই বরদাস্ত করা হয় না। অগাষ্ট বেবেলের মতে, মেয়েদের মানতেই হয় এখন বহুসীমাবদ্ধতা থেকে পুরুষরা মুক্ত। পুরুষ যেহেতু প্রভু, সেইজন্য প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে ও সে ই তার পছন্দ জাহির করতে পারে। সেটা অবশ্যই সামাজিক পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। মেয়েদের সংখ্যাধিক্য এবং বিবাহ জীবন যাত্রার মূল অবলম্বন হওয়ায় মেয়েরা তাদের পছন্দ অপছন্দ জানাতে পারে না। তাদের অপেক্ষা করতে হয় অন্যের চাওয়ার জন্য। আর সেই পাওয়াকেই ভাগ্য বলে মেনে নিতে হয়। বয়স্ক অবিবাহিতার দুর্ভাগ্য জনক ভবিষ্যৎ এড়ানোর জন্য মেয়েরা প্রথম সুযোগেই একজন রক্ষকের অধীনে চলে যায় সেই কাজ করে বলেই সে সমাজের মধ্যে কোনো মেয়ে যদি মাথা উঁচু করে চলতে চায়, সে যদি প্রথম আহ্বানেই বিবাহনামক দেহ ব্যবসায় আত্নসমর্পণ না করে জীবনের কন্টকিত পথে একা চলার সাহস দেখায় তাহলে তাকে এরা উপেক্ষা এবং ঘৃণা করে।[২৪]

একটি নতুন সংসারে এসেই সমস্ত গৃহকর্মের দায় দায়িত্ব একটি অপরিণত বয়সী অনভিজ্ঞ দেহ মনের উপর বর্তায়। তার কর্মকান্ডে কোন রূপ খুঁত ধরা পড়লে নারীকে নানা রকম অপদস্থ হতে হয়। দৈনন্দিন কর্মকান্ডের মধ্যে এভাবে ধীরে ধীরে নারী একসময় নিজের মধ্যে মাতৃত্বের

---

[২৪] বিখ্যাত পুরুষদের দৃষ্টিতে মেয়েরা, উন্নয়ন পদক্ষেপ, আটত্রিশতম সংখ্যা, সৌজন্যে বেলা বন্দোপাধ্যায়, কালান্তর, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬, পৃঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

আভাস পায়। আর একজন সন্তান সম্ভবা মায়ের যে পরিচর্যা প্রয়োজন এ দেশে অধিকাংশ মা-ই তা পায়না। বরঞ্চ তার সংসারের সুস্থ-অসুস্থ সকলের পরিচর্যা তাকেই করতে হয়। "বাংলাদেশে বংশ নির্ধারিত হয়ে পৈত্রিক পরিচয়ের ভিত্তিতে। পুরুষ জাতকের মাধ্যমে বংশ সম্পত্তি বিচার করা হয়। ফলে শিশুর জৈবিক পিতৃত্ব একটি গুরুত্বপুর্ণ সামাজিক ইস্যু হিসেবে নারীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর যৌনতা ও পুনরুৎপাদনের ওপর কাঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, ... একজন নারী ততদিন পর্যন্ত তার স্বামীর ভরণপোষনের আশা করতে পারে যতদিন পর্যন্ত সে বাধ্য, বিশ্বস্ত, এবং সন্তান জন্মদানে সক্ষম থাকে।[২৫]

আবার আধুনিক যুগে যেসব শিক্ষিত নারী বহির্জগত তথা অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের সাথে জড়িত তাদের প্রতিনিয়ত সতীত্বের (যৌনবিশ্বস্ততা) প্রমাণ দিতে হয় স্বামী-সংসারের অন্যান্যের কাছে। তাদের এও প্রমাণ দিতে হয় যে তারা শুধু অর্থউপার্জনই করে না- তারা অবশ্যই আদর্শ মা, সুগৃহিনী ও বিশ্বস্ত স্ত্রী। এজন্য তাকে দৈনন্দিন রান্না-বান্না, ঘর কন্যার কাজে সম্পন্ন করে, সকালের নাস্তা , দিবাকালীন খাবার, বিকালের নাস্তার যোগান দিয়ে সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর সব রকম ব্যবস্থা করে স্বামী নামক অধিক শক্তিশালী পুরুষটির অফিস বা কর্মক্ষেত্রে যাত্রার সার্বিক সুব্যবস্থা নিশ্চিত করে অতপর স্বীয় কর্মক্ষেত্রে গমন করতে হয়। আবার কর্মক্ষেত্রে থেকেও তার সাংসারিক কাজের খোঁজ খবর রাখতে হয়। আবার কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে নিজের পানাহারের ভ্রূক্ষেপ না করেই সংসারের খোঁজ খবর নিতে হয়। অফিস ফেরত স্বামীর নিখুঁত যত্ন করা, সন্তানের পড়ালেখার তদারকী করা, স্বামী ও সন্তানের রাতের খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশন করা, আগামীদিনের সারাদিনের অগ্রীম কর্মকান্ড সম্পন্ন করা, নিজস্ব অফিসিয়াল কর্মকান্ড সম্পন্ন করা, কাপড় চোপড়ের পরিচ্ছন্নতা তদারকী করা, পরবর্তী দিনের কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য নিজের তথা স্বামী সন্তানের পোশাক রেডি করে রাখা, রাতের খাবার পরিবেশন করা এবং খাওয়া শেষে সেগুলি গুছিয়ে রাখা, বাসন-প্লেট পরিস্কার করা, খাবার ফ্রিজে রাখা আর তা না থাকলে অবশিষ্ট খাবার সতেজ রাখার জন্য জ্বাল দিয়ে রাখা ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হয় যান্ত্রিক দ্রুততায়। এত কর্মকান্ডের মধ্যেও তাকে কর্মক্ষেত্রের কাজ কর্মের মধ্যে স্বীয় চরিত্রগত সূচিতা অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে স্বামী কিংবা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের কাছে জবাবদিহি কিংবা প্রমাণ দানের জন্য মানসিকভাবে সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। এতে দেখা যায় নারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ফলে কিছুটা আর্থিক সক্ষমতার মুখ দেখেছে কিন্তু সার্বিকভাবে

---

[২৫] নায়লা কবির, অধস্তনতা এবং সংগ্রামঃ বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ, হাসিনা আহমেদ অনূদিত, পৃঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

আরও কষ্টকর জীবনে নিপতিত হয়েছে। এ যেন নদী থেকে বিশাল সমুদ্রে ঝাপ দেওয়া। "পুরুষতন্ত্রই নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, নারী গৃহের যাবতীয় কাজ করবে এবং পুরুষ বহির্জগতে কাজ করবে। কারণ নারীর বিচারক্ষমতা কম বলে বহির্জগতে সে কাজ করতে অপারগ, সে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এই ধারণা গ্রামাঞ্চলে এমনকি শহরের অনেক রক্ষনশীল পরিবারের নারীদের মধ্যেও বদ্ধমূল হয়ে আছে। গৃহকর্ম কম পরিশ্রমের নয়, তদুপরি নারী পারিশ্রমিক বিহীন শ্রম দিচ্ছে ঘরে বাইরে সর্বত্র। যে নারী পেশাজীবি সেও কিন্তু গৃহিনী এবং তার পরিশ্রম দ্বিগুন। কিন্তু পরিবার বা সমাজ তার পরিশ্রমের মূল্যায়ন করছে না বরং পরিশ্রমকে তার (নারীর) দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে গন্য করছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দবোধ নারী পুরুষের সমান অধিকার। কিন্তু আমাদের দেশের নারীরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত"।[২৬]

পরিবারে নারীর অবমূল্যায়ন এবং পুরুষের পৌরুষ ও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রাখার আর একটি প্রক্রিয়া হল যৌতুক। বিয়ের সময় নারীকে নানা অঙ্কের টাকা, গয়না গাটি, মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রি ইত্যাদি পিতৃগৃহ থেকে দান করা হয় স্বামীর মূল্য অক্ষুন্ন ও অম্লান রাখার জন্য। আর যে পুরুষ যৌতুক নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে তাকে এ সমাজ মহান হিসাবে মূল্যায়ন করে। পিতৃতন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার এই কুফল থেকে পুরুষ ও মুক্ত নয়-যখন সে কন্যা দায়গ্রস্থ পিতা কিংবা বড় ভাই বা মুরব্বী। কন্যার যৌতুকের ভার তাদেরই বহন করতে হয়। তবে এ যৌতুকের প্রভাব নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র ঘরে অধিক লক্ষনীয়। যৌতুকের চাহিদা মেটাতে না পায়লে তাদের নানা রকম নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়। কখনও অত্যাচারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নারী আত্মহত্যার পথ ও বেছে নেয়। আবার কখনও বা স্বামী বা শ্বশুর বাড়ীর অন্যদের হাতে যৌতুকের দায়ে জীবন দিতে হয় নারীকে, এই একবিংশ শতাব্দীতেও যা অহরহ দেখা যাচ্ছে।

আবার উচ্চ বিত্ত পরিবারে উপহারের নামে যৌতুকের উপস্থিতি দেখা যায় ভিন্ন রূপে। এই উপহারের পরিমান টাকার অঙ্কে যত বেশী হয় কনের মূল্যায়নও ততবেশী হয়। তবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংসারের উচ্চ শিক্ষিত বিবেক সম্পন্ন মেয়েদের এসব কারণে প্রচুর মানসিক যন্ত্রনা পোহাতে হয়।

---

[২৬] রাজিয়া খানম, "পরিবেশ নারী ও পিতৃতন্ত্রঃ একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ, ক্ষমতায়ন, ২০০৪, সংখ্যা-৬, পৃঃ ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী গৃহে নারীর অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা যায় একজন নারী পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী কাজ করে আর কর্মজীবি মহিলাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি আরও ব্যাপক। অন্যক্ষেত্রে একই পদমর্যাদা কিংবা পুরুষের চেয়ে অধিক অর্থউপার্জনে সক্ষম হলেও অফিস থেকে ফিরে পুরুষ সদস্য ঘরে এসে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আরাম আয়েশে শরীর এলিয়ে দেয়। (স্ত্রী পরিবেশিত) চা-নাস্তা গ্রহণ করে কিংবা টেলিভিশন দেখে অথবা সংবাদ পত্রে চোখ বুলিয়ে শান্তিপূর্ন অবসর যাপন করে। ঘর পুরুষের জন্য আয়েশের ও অবসর গ্রহনের স্থান অন্য দিকে নারীর কঠোর পরিশ্রম ও স্বীয় জীবনের সার্বিক আশা আকাঙ্খা আরাম আয়েশ বিসর্জন দেওয়ার স্থান। তবে উচ্চ বিত্ত নারীদের ক্ষেত্রে এ ধরণের মন্তব্য অবান্তর। কারণ তারা দাসী বাদীদের সেবা পরিবেষ্টিত হয়ে অনেকটা অলস ও কর্মহীন জীবন যাপন করে এবং স্বামীর মনোরঞ্জনও সুখের জন্য নিজেকে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখে এবং তাদের আবরণ ও আভরণ তাদের স্বামীর বিত্ত বৈভবের স্বাক্ষর বহন করে। উচ্চ বিত্ত নারীর এই আভরণ পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণেরই রীতি বহন করে তা নয় তারা যে অধস্তন এবং সোনার খাঁচায় বন্দী তার প্রমাণও বহন করে।

শিশুকাল থেকেই নারীকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়-তা নারীর স্বার্বভৌম ক্ষমতা হরণ করতে সহায়তা করে। ফলে নারী তার জীবনের সব সার্থকতা, আনন্দ অনুভব করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সে পুরুষের চেয়ে নিজেকে হীন মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

<u>**বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ঃ**</u> বিয়ে নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি নর-নারীর জীবনের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে পারে যদি সেখানে থাকে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা বিশ্বস্ততা, সহমর্মিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর সমন্বয়। কিন্তু আমাদের দেশের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে 'বিয়ে' প্রতিষ্ঠানটি নর-নারীর সম্পর্কটিকে নারীর উপর অধস্তনতার বোঝা চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে পুরুষের সুযোগ-সুবিধা, সুখও স্বাচ্ছন্দের জীবন নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াকে জোরদার করার সব রকম কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এখানে নারীকে শৈশব কাল থেকে স্বামীর (পুরুষের) সেবা দাসী হিসেবে তৈরী করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। পুরুষের যোগ্যতা যা-ই হোক না কেন সে সব সময় নিজেকে সুবিধাভোগী, প্রভুত্বকারী, উৎপীড়ক হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এখানে নারীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, মানসিক সার্বিক ভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল ও অধস্তন রাখা হয়। তাই এখানে 'বিয়ে যা স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীন মত প্রকাশের তেমন সুযোগ নেই। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা স্বামীকে প্রথম দেখার সুযোগ পায় বিয়ের রাত্রিতে। একটি কুৎসিত ছেলের ও পছন্দ থাকতে পারে কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

একজন সুন্দরী মেয়েকেও তার পিতামাতা বা অভিবাবকের পছন্দ সই যে কোন ছেলেকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। বিয়ের পর স্বামীর সংসারে যাওয়ার পরপরই সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে থাকে। পারিবারিক বেষ্টনীর মধ্যেই নারীরা সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় নারীর জীবনে পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে গুণগত পদ্ধতিতে গবেষণা করা হয়েছে। দেখা গেছে, নারীর প্রতি বিভিন্নমুখী সহিংসতা ঘটে স্বামীর আচরনের মাধ্যমে অবহেলা থেকে শুরু করে মৌখিক উৎপীড়ন, কঠিন শারীরিক নির্যাতন এবং হত্যা। সে সব সহিংসতা নারীর জন্য সবচেয়ে বেশী অসহনীয় সেগুলো হচ্ছে-তাদের অস্তিত্ব একেবারেই উপেক্ষা করা, অশালীন ভাষা ব্যবহার এবং শারীরিক প্রহার,যার ফলে মারাত্মক জখম হতে পারে। অপরদিকে জানা গেছে মেয়ে বা বউরা ঘর সংসারের কাজ ঠিকমত না করলে কিংবা অন্য কোন ভাবে স্বামীকে অসন্তুষ্ট করলে স্বামীর হাতের চড় থাপ্পড়ের শাসন অনায়াসেই (গর্ভাবস্থার সময় ছাড়া) মেনে নেয়। সংসারের কোন কাজ করতে ভুলে গেলে অথবা খাবার গরম করে পরিবেশন না করলে কিংবা খাবারের স্বাদ কম হলে এ ধরণের শাসন তাদের মাথা পেতে নিতে হয়। (এ,আই. এন. এস. রিসার্চ-ইন্ডিয়া, ১৯৯৯)। অন্য একটি গবেষনায় দেখা যায়, বিবাহিত কিশোরীরা মনে করে তারা অন্যায় করলে স্বামীর অধিকার রয়েছে মারার; স্ত্রী অন্যায় করলে অবশ্যই স্বামীর শাসনের অধিকার রয়েছে; যাতে মার খেতে না হয় সে জন্য সকল বিষয়ে নিজেদেরকে নিখুত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের (ইউনিসেফ, ১৯৯৮)[২৭]

এদেশে স্বামীর ঘরকে নারীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় বলে মৌখিক প্রচার প্রচারণা থাকলেও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে এখানেই নারীর অধীনতা অপমান, নির্যাতন ও সহিংসতার স্বীকার হতে হয় সবচেয়ে বেশী। যখন এই প্রক্রিয়া একটি নারীর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং যখন তা নারীর জীবনের নিরাপত্তাহীনতার চুড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌছে তখনই তার মুরব্বীরা বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা ভাবেন। আর এই বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া ও এদেশে নারীর জন্য সহজ সাধ্য নয়। তার বিয়ের 'কাবিন' এর মধ্যে তালাক চাওয়ার অধিকারের কথা উল্লেখ থাকলে নারী তালাক চাইতে পারে। তবে আজকাল পারিবারিক আইন নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে বলে নারী বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আদালতের দারস্থ হতে পারে।

---

[২৭] মোঃ ইসমাইল হোসেন, পারিপারিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও এনজিও উদ্যোগঃ একটি পর্যালোচনা, ক্ষমতায়ন, ২০০৪, সংখ্যা-৬, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

কখনও কখনও পুরুষের 'বউ পছন্দ' না হলে কিংবা অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হলেও স্ত্রী তালাক দেওয়ার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া ও যৌতুকের দাবী, স্বামীটির পরকীয়ায় আসক্তি অথবা নারী অধিকার সচেতন হয়ে নির্যাতনের প্রতিবাদ করলেও বিবাহ বিচ্ছেদের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয় আমাদের সমাজে। এ সমাজে কোন অবস্থায়ই নারীকে অতিরিক্ত অধিকার সচেতন বা আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে পছন্দ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে অধিকার সচেতন নারীকে উশৃংখল, স্বামীকে মান্য করে না ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে তালাক দেওয়ার অজুহাত তৈরী করা হয়।

তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে নারীকে এ সমাজের অনেক অপদস্থ হতে হয়, তার সামাজিক মর্যাদা কমে যায়। "তালাকের ব্যাপারে ও পুরুষের মূল্যেয় মান করে না। যে পুরুষ তালাক দেয় বা প্রাপ্ত হয় তার মূল্যহানির প্রশ্ন ওঠে না, যেহেতু বিয়ের সঙ্গে পুরুষের মূল্য সম্পর্কিত নয়, যেমন নারীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। নারী স্বামী লাভে আবশ্যিক ভাবে বিশেষ মূল্যে মূল্যায়িত হয়। এ কারণেই তালাক হওয়া মাত্র নারীর সেই মূল্যটি হারিয়ে যায়।

আরো উল্লেখ্য যে, পুরুষ শাসিত সমাজ বলেই একটি নারী তালাকের প্রসেসের মধ্যে থাকাকালীন যে যাতনা ভোগ করে তা পুরুষের জন্যে নেই বললেই চলে। .... তালাক প্রাপ্ত পুরুষ দ্বিতীয়বার দার গ্রহণে বিশেষ বেগ পায় না। এমনকি অবিবাহিত অল্প বয়স্ক কন্যা বধূরূপে পেতেও তালাকপ্রাপ্ত পুরুষের বিশেষ অসুবিধে হয় না। কিন্তু এমন অবস্থায় নারীর সমস্যার অন্ত নেই। তার কাছে দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহনের চিন্তা স্বপ্ন না হলেও সহজ বাস্তব নয়।[২৮]

অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহে নিজের অবস্থান থেকে অনেক নীচু স্তরের অথবা অধিক বয়স কিংবা কোন না কোন বিশেষ সমস্যাগ্রস্থ পুরুষকে বর হিসেবে পেতে হয়। আবার বার্ধক্যে ও কোন কোন পুরুষ তার বিগত যৌবনা স্ত্রীর সান্নিধ্যে বা সেবায় অসন্তুষ্ট থাকার কারণে প্রথম স্ত্রী হীনমন্যতায় ভোগে, অনেক সময় স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে মত দিতে বাধ্য হয়। এ ভাবে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া নারীকে প্রতিনিয়ত অধস্তন করে রাখে।

---

[২৮] আখতার ইমাম, পুরুষের মূল্য, বাছাই রচনাঃ প্রসঙ্গ নারী, জাতক, জানুয়ারী, ১৯৯২, পৃঃ ১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

বৈধব্যে নারী ঃ নারীর অধস্তনতার সবচেয়ে কষ্টকর ও নিষ্ঠুর রূপটি দেখতে পাওয়া যায় একজন বিধবা নারীর জীবনে। একজন নারীর স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে তার সকল প্রকার আভরণ খুলে নেওয়া হয়। স্বামীর কাফনের সাথে স্বামী হারা স্ত্রীটির জন্য একটি সাদা সুতি শাড়ী কিনে আনা হয় এবং যার প্রতীকি অর্থ-হল স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীর জীবনের সব রঙ মুছে ফেলতে হয়। স্ত্রীর জীবনের আর কোন মূল্য রইল না। তার জীবনের সমস্ত কামনা বাসনা বিসর্জন দিতে হয় স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। অতীতের সতীদাহ বা সহমরন প্রথা বিধবা নারীর জীবনের মূল্যহীনতা প্রমাণ করে। বিধবার জীবন এ সমাজে খুবই অবাঞ্ছিত ও অর্থহীন। পুরুষ যেহেতু সমাজের কর্নধার তাই এই শ্রী হারা শক্তিহারা নারীর জন্য সহমর্মিতা স্বরূপ প্রদেয় বিধি ব্যবস্থা তারই দেয়া। ধর্মও রাষ্ট্রীয় আইনেও বিধবাদের জন্য কিছু সুব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু পুরুষের অদৃশ্য হাতের পর্শ্বে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তা বিধবার দুর্গতি নাশে খুব কমই ভূমিকা রাখে। ভারতবর্ষে সমাজের বিধিতে হিন্দু বিধবার জন্যে সতীদাহ ধর্মের রীতি বলে গণ্য হয়েছিলো। কারণ হল "বিবাহিতা নারীর রূপ যৌবন, কামনা-বাসনা, চিন্তা-ভাবনা, কর্মজীবন যে একমাত্র স্বামীরই জন্য উৎসর্গিত। অতএব স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর জীবনে করনীয় কিছু আর থাকতে পারে না। হিন্দু শাস্ত্রে আছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। পুত্রের জন্যেই তো স্ত্রীর প্রয়োজন। .... যেহেতু বিধবার জীবনে সন্তান জন্মে দেয়াটা ফুরিয়ে যায়, সেহেতু তার জীবনের প্রয়োজন আর থাকে না। সুতরাং সমাজপতিরা সতীদাহ প্রথার মাধ্যমে শাস্ত্র মতে স্ত্রীর সহমরণ ঘটিয়ে নারীকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করলো। পুরুষের প্রভাবে সেচছায় বা অনিচ্ছায় নারী নিজের জীবন নিজে ত্যাগ করে অধর্মকে ধর্মের স্বীকৃতি দিলো।[২৯]

সমাজে বিধবাদের জন্য কিছু অলিখিত অথচ জীবন যাপনের অবশ্য পালনীয় পদ্ধতি চালু রয়েছে। এর কারণ অনেক "নারী নরকের দ্বার '(শঙ্করাচার্য), বাইবেল বলেছে, "নারী root of all evils অর্থাৎ নারী সকল অহিতের মূল। 'নারীর মূল্য'-এ শরৎচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, লাটিন ধর্মযাজক টারটুলিয়ান নারী সম্বন্ধে লিখেছেন Thou art the devils gate, the betrayer of the true, the first deserter of the divine law (শরৎচন্দ্র রচনা সমগ্র, ঝিনুক পুস্তিকা সংস্করণ, ঢাকা, ৭ম খন্ড, পৃ-৩৩১)

---

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

এসব চিন্তা করেই পুরুষ বিধবার জীবনধারার পদ্ধতি সমাজের কল্যানার্থে প্রবর্তন করেছে।

...... পুরুষের ইচ্ছায় যে ধর্ম নারীর জন্য তৈরী হলো, সে ধর্ম বিনা বাক্য ব্যয়ে অম্লান বদনে নারী পালন করেছে যুগযুগ ধরে। ....

বিধবার বস্ত্রে থাকতে হবে সৌন্দর্য লাঘবের ক্ষমতা। বিধবার জন্যে আরো রীতি আছে, তা একমাত্র পুরুষেরই কল্যাণ কামনায়। পুত্র সন্তানের মাতা বিধবা হলেও তাকে নাকি হাতে অলঙ্কার পরতে হয়। অন্যথায় পুত্রের অকল্যানের আশঙ্কা থাকে।[৩০]

স্বামী হারাবার সঙ্গে সঙ্গে বিধবাকে সমাজের অনেক কিছু হারাতে হয়। স্ত্রীর কাছে স্বামী দুঃশ্চরিত্র, পাপিষ্ঠ, পাষন্ড বা দেবতা যাই হোক না কেন মৃত্যুর পর সে থাকে অমর অক্ষয়। সে সমাজের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অপাংক্তেয়। সামাজিক শুভ কর্মে, আচার-অনুষ্ঠানে বিধবা হয় বিবর্জিতা তার একমাত্র কারণ তার স্বামী মৃত। সুতরাং তার স্পর্শ শুভকে করে অশুভ। অনেক ক্ষেত্রে বিধবাকে শুধু নিরামিষ খেতে হয়। এ ভাবে বিধবা নারীটির কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়া হয় সর্বক্ষন। সে দারুন একাকিত্বের বেদনায় বিষন্ন হয়ে পড়ে। সে পর্যাপ্ত প্রোটিন ও খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীন জরাজীর্ন শরীর ও মন নিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেয় যা তার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে।

কুমারী নারী ঃ আবার যে নারী পুরুষ তান্ত্রিকতার এই বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটির বাইরে থাকে সে নারী ও ল্ড মেইড বা আইবুড়ো নামে আখ্যায়িত হয়। সমাজ তাকে হেয় চোখে দেখে কেউ কেউ তার জীবনকে অর্থহীন মনে করে। কিন্তু অবিবাহিত পুরুষের সমাজে শ্রদ্ধার হানি হয় না মোটেই । সমাজে তার নাম হয় 'চিরকুমার' যা তাকে দেবতুল্য মর্যাদা দান করে যদিও মোটেই সে তা না ও হয়।

এতক্ষন প্রচলিত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারে জন্ম থেকে শৈশবে, কৈশরে, যৌবনে নারীর বিভিন্ন পর্যায়ে অধস্তন অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় একটি মেয়ের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পিতার বাড়ীর বা আত্মীয় স্বজনের সম্ভাব্য সব সমর্থন হারায় এবং বধু হিসেবে একটি নতুন পরিবারের দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্যের মর্যাদা লাভ করে।

---

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

"পরিবারের পদ সোপানে তার অবস্থান শ্বাশুড়ী এবং জ্যেষ্ঠ ননদদের নীচে এবং পারিবারিক কাজের বেশীর ভাগ তাকেই করতে হয়। শুধু মাত্র সন্তান, বিশেষ করে বংশ রক্ষায় পুরুষ সন্তানদের গুরুত্ব বিবেচনা সাপেক্ষে, পুরুষ সন্তান জন্ম দেবার পরেই কোন পরিবারে তার মর্যদা বাড়বে। শেষত ঃ তার ছেলেরা বিয়ে করলে সে অধিকাংশ নারীদের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের একমাত্র যে মর্যাদাটি বিদ্যামান রয়েছে তা পাবে; অর্থাৎ লাভ করবে শ্বাশুড়ীর মর্যাদা" ।[৩১]

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া নারী জীবনে যে প্রান্তিকতা এনে দিয়েছে সে অবস্থান প্রতিনিয়ত লালন করছে আমাদের নারী সমাজ। নিজের অজান্তে অধস্তন অবস্থান তার ব্যক্তিত্ব আত্মমর্যাদা বোধ ও মুক্ত চিন্তাকে খর্ব করেছে। অধস্তনাতাকে নারী তার ভাগ্য এবং এটাকেই প্রকৃতির নিয়ম বলে ধরে নেয়। নারীর অধস্তনতার কারণ হিসেবে জন মিল যা সনাক্ত করেছেন তা হলো নারী সেচ্ছায় পুরুষের শাসন মেনে নিয়েছে, তাদের এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই। এটাই সাধারণ নিয়ম, এটাই তাদের ভাগ্য-এই মনোভাবই নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যের ভিতকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে। জন মিলের মতে The family is a school of despotism, in which the virtues of despotism, but also its vices, are largely nourished.... অর্থাৎ পরিবার হলো স্বেচ্ছাচারিতা শেখার স্কুল, যেখানে শুধু স্বেচ্ছাচারিতার গুনাবলী নয় তার সাথে তার অনৈতিকতাকে পুষ্টি জোগানো হয়।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে। সে কোন ও একজন মেয়ের নয়। স্ত্রীকে নিরূপায়ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রনার সৃষ্টি হয়েছে অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্য কোন আবশ্যিক পন্থা রাখা হয়নি। সতীত্ব গরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা নিরাময়ের চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে সারাবার একটুও চেষ্টা নেই। স্ত্রী লোক এত সস্তা, এত অকিঞ্চিৎকর..... ।[৩২]

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে পুরুষ সবসময় এক তরফা সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছে- নারীকে প্রান্তিকতায় ঠেলে দিয়ে। এঙ্গেলস তাই বলেছেন-"ইতিহাসে এক বিবাহ নির্ভর পরিবার প্রথা এসেছে কিন্তু নরনারী সম্পর্কের দ্বৈততা বা বিরোধের সমাধান হিসেবে নয়-নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের ভিত্তিতে। প্রাগৈতিহাসিক সমগ্র কালেই কিন্তু লিঙ্গ সম্পর্কে বিরোধ জারি ছিল। মার্কস এবং আমি ১৮৪৬ সালে একটা অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে

[৩১] নায়লা কবির, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

[৩২] রবীন্দ্রনাথ-যোগাযোগ, বিচিত্রা-১৩৩৪-৩৫, আশ্বিন-চৈত্র, ১৯২৮।

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছিলাম "মানব সমাজে শ্রমবিভাগ প্রথম হল পুরুষ এবং নারীর মধ্যে সন্তান উৎপাদনের জন্য।" আজ আমিতার সঙ্গে যোগ করতে পারি যে এক বিবাহ নির্ভর পরিবারের সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসের প্রথম শ্রেণীদ্বন্দ্বও দেখা দিল। শ্রেনী শোষনের ইতিহাসে ও পুরুষের দ্বারা নারীর ওপর শোষন বোধ হয় প্রথম।" আজও সেই শ্রেণী শোষনের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে-আজও নারী সমমর্যাদা প্রাপ্তির বদলে পুরুষের অধস্তন হয়ে রয়েছে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে যার মুল সুত্র গ্রথিত রয়েছে।

৪.৩ সামাজিক অবস্থান ঃ

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় আমাদের মধ্যে আধুনিকতার বোধ তৈরী হয়েছে। আমরা সেই সাথে জাতি ধর্ম-বর্ন শ্রেণী নির্বিশেষে সমঅধিকারের চেতনায় ও জাগ্রত হয়েছি। কিন্তু আজও বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা অধস্তন এবং পরজীবির মত পুরুষের উপর নির্ভরশীল -একথা সম্পূর্নভাবে অস্বীকার করার উপায় নেই। এ পর্যায়ে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা রয়েছে।

৪.৩.১ আইনগত অধিকার (Legel Status) ঃ

উন্নয়নের একটি বড় শর্ত হল মানুষের মৌলিক অধিকার গুলি নিশ্চিত করা -যার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন সমঅধিকার ভিত্তিক আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন। বাংলাদেশ সংবিধানে এবং আইনের চোখে নারী পুরুষ সমান স্বীকৃত হলেও বাস্তবে দেখা যায় বিস্তর ব্যবধান। নারীর আইনগত অধিকার সমূহ লিখিত আছে এবং তা সুস্পষ্ট ও। তবে আইন প্রণয়নের অর্থ যেহেতু আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নয়, এবং মেনে চলার কোন বাধ্যবাধকতা নাই, কিংবা জোর প্রয়োগের ব্যাপার নাই সেহেতু এদেশের নারীর। শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের দ্বারা উপকৃত হয়নি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এসব আইনের দ্বারা নারীদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের অবস্থানটির লিখিত প্রতিফলন হয়েছে। এর বাস্তব প্রয়োগের সময় বাধাগ্রস্থ হচ্ছে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং সামাজিক সংস্কার এর কারণে।

৪.৩.২ বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ঃ উন্নয়নে নারী

অবস্থান পর্যালোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলাদেশের নারীদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবস্থান দ্বি-মুখী। এক্ষেত্রে প্রথমে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল সংবিধানে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। সংবিধানে নারীর সাধারণ অধিকার সম্পর্কে অনেকগুলো ধারা সংযোজন করা

হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান সম্মানজনক। সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় স্পষ্টভাবে নারীর সমানাধিকারের কথা উল্লেখ আছে। সংবিধানের ৭ নং ধারায় স্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে লিঙ্গ ভিত্তিতে মেয়েদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্য প্রদর্শণ করা চলবে না এবং সকল নাগরিক যাতে সমান সুযোগ পায় সেজন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। সংবিধানের ভাষায় "The state shall endeavour to ensure equal opportunity to all its citizens."

জাতিসংঘভুক্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে ও নারীর মানবাধিকার আন্তর্জাতিক সনদ/চুক্তিসমূহ অনুমোদন করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ২৭ নং ধারায় বলা হয় সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। এই সমাজের উন্নয়নের জন্য নারীদের কিছু কিছু অধিকারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিৎ বিবেচনায় সংবিধানের ২৮ ও ২৯ ধারায় এই অধিকার বর্নিত হয়েছে।

ধারা ঃ ২৮ (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ন, নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।

(২) রাষ্ট্র ও গণ জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারনের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্য বাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীনে করা যাবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকুল কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদে এর কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

ধারা ঃ ২৯ (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই

(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূল বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হতে,
(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায় ভূক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হতে,
(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষন করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না। নারী সমাজ সংসদ নির্বাচনে সরাসরি প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তদুপরি সংবিধানের পঞ্চশ ভাগে ১ (৩) ধারায় সংসদে মহিলাদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষনের কথা বলা হয়েছে। সংসদ যে দিন প্রথম বসবে সেদিন থেকে ১০ বৎসর পর্যন্ত ৩০ টি আসনে মহিলারা নির্বাচিত সদস্যদের মনোনয়নের মাধ্যমে আসতে পারবেন।

মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ ও নারী উন্নয়ন ঃ

সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার সমূহ বলবৎ করার ক্ষেত্রে কেউ বাধা প্রাপ্ত হলে ১০২ অনুচ্ছেদের ১ দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে।

দেশের উন্নয়নের প্রচেষ্টায় গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মহিলাদেরকে যদিও পুরুষের সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে তথাপি মুসলিম পারিবারিক আইন সমূহে (Personal laus) তাদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়।[৩৩]

এই বৈষম্য মূলক বিধিগুলো তিন ধরণের আইনে বিদ্যমান । এগুলো হলঃ বিবাহ সংক্রান্ত আইন, তালাক সংক্রান্ত আইন এবং এবং সম্পত্তি আইন । ইসলামিক শরীয়া আইন আইন, অনুযায়ী নারীর উল্লেখযোগ্য তিনটি আইনগত অধিকার রয়েছে। বিয়ে, তালাক এবং সম্পত্তির উত্তারাধিকার । ইসলামিক আইন অনুযায়ী কনে সম্পত্তি ছাড়া কোন বিয়েকে বৈধ বলে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু বাংলাদেশে অধিকাংশ বা প্রায় সব ক্ষেত্রেই কন্যা তার পিতা বা মুরব্বীদের মতামত মেনে নিতেই বাধ্য থাকে। অনেক সময় কন্যার সম্পূর্ণ অমতে জোর করে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ও রয়েছে এদেশে ।'Rounaq Jahan তাঁর Women for women.

---

[৩৩] Salma Sobhan, 'The Legal Status of Women in Bangladesh', Bangladesh Institute of Law and Parliamentary Affairs, Dhaka, 1978, P.5.

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh 1975'গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন ' In Islam marriage is a contract and the consent of both partners in front of witness is required.[৩৪]

১৯৬১ সালের বিবাহ আইনে অবশ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রথম বিবাহ বহাল থাকার সময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সালিসি পরিষদের অনুমতি না নিয়ে কেউ যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তবে তাকে অবিলম্বে প্রথম স্ত্রীর সমুদয় 'দেন মোহর' পরিশোধ করতে হবে এবং এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রমে কারাদন্ড পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। ১৯৬১ সাল মুসলিম পারিবারিক আইনে যদিও মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তবু বাস্তবের এই আইনে প্রয়োগ খুবই কঠিন এবং বিরল।

তালাক সংক্রান্ত আইন ঃ

Marriage contract অনুযায়ী বর কনে উভয়ের মধ্যে মতের অমিল বা অন্য কোন সমস্যা হলে উভয়ে প্রয়োজনে 'তালাক এর মালমা করতে পারে।'তালাক' হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর একটি উপায়। মুসলিম আইনে যে কোন সাবালক বা সুস্থমনা স্বামী কোন প্রকার কারন বা দর্শিয়ে যে কোন সময় তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। তালাক তিন প্রকার স্বামী কর্তৃক, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে এবং স্বামী বা স্ত্রীর আবেদনক্রমে আদালত মারফত। পুরুষের ক্ষেত্রে তালাক (Divorce)যত সহজ নারীর পক্ষে ততই কঠিন । পুরুষ শুধু রাগ বা উত্তেজনা বশতঃ অথবা মৌখিকভাবে তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারন করলেই তালাক হয়ে যায় এবং সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে। কিন্তু মুসলিম নারীরা একইভাবে পুরুষকে তালাক প্রদান করতে পারে না। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে বলা হয়েছে যে, কোন স্বামী যে কোন সময়ে তালাক ঘোষনা করা হয়েছে বলে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে একটি নোটিশ এবং তার একটি অনুলিপি তার স্ত্রীকে পাঠানো পর নব্বই দিন অতিবাহিত হলে তালাক বলবৎ হয়।

---

[৩৪] Rounaq Jahan-Women in Bangladesh, Women for Women, Bangladesh, 1975, UPL, p. 14.

Dhaka University Institutional Repository

অপরপক্ষে, এদেশে একজন স্ত্রীকে তার স্বামীকে তালাক প্রদান করতে হলে বিভিন্ন নিয়মের মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং অধিকাংশ সময়েই এসব জটিল নিয়মের গন্ডী অতিক্রম করার চেয়ে অনেক মহিলার কাছে কষ্টের জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয় বিবেচ্য হয়। অবশ্য স্ত্রী যাতে সহজে স্বামীকে তালাক প্রদানের প্রদানের ব্যাপারে আইনের আশ্রয় নিতে পারে সেজন্য বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে বিবাহ সংক্রান্ত এক অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে চাইলে স্থানীয় কোর্টেই ২৫ টাক ফি জমা দিয়ে দরখাস্ত করতে পারে (The Family Courts Ordinance,1985) এই আইনে বলা হয়েছে যে পারিবারিক কোর্টে প্রধানতঃ মুসলিমগনই বিচারকমন্ডলী হবেন। এই ধরণের কোর্টে বিয়ে, তালাক, মেয়েদের স্ত্রী হিসাবে অধিকার, সন্তান প্রতিপালন প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের জন্য প্রধানত করা হয়েছে।[৩৫]

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটাকেও নারীকেও নারীর পক্ষে কোন পরিবর্তন বলা যায় না। কারণ- ১৯৩৯ সালের বিবাহ আইন অনুযায়ী (যা এখনও বলবৎ আছে) একজন নারী কেবলমাত্র নিম্নলিখিত কোন একটি শর্ত সাপেক্ষেই তার স্বামীকে তালাক প্রদানের চেষ্টা করতে পারে। এগুলো হল : ১। স্বামী চার বছরকাল অজ্ঞাত থাকলে, ২। দুই বছরকাল স্ত্রীর-ভরন পোষনে নির্লিপ্ত থাকলে, ৩। মুসলিম পারিবারিক আইন লংঘন করে স্বামী বিয়ে করলে, ৪। স্বামীর সাত বছরকাল বা ততোধিক সময়ের জন্য কারাদন্ড হয়ে থাকলে, ৫। স্বামী তিনবছরকাল যাবৎ বৈবাহিক সম্পর্ক পালনে ব্যর্থ হলে। ৬। স্বামী নপুংসক বলে ৭। স্বামী দুই বছর কাল উন্মাদ বা কুষ্ট রোগ গ্রস্থ হলে, ৮। অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় বিয়ে হলে পাপ্ত বয়স্ক হযে স্ত্রী বিবাহ প্রত্যাখ্যান, ৯। স্বামী নিষ্ঠুর হলে যেমন ধর্মে কর্মে বাধা দিলে, নৈতিকতা বিরোধী কাজে প্ররোচনা দিলে এবং স্ত্রীকে ক্রমাগত প্রত্যাহার করলে ইত্যাদি এবং (১০) মুসলিম আইনে বৈধ বলে স্বীকৃত এরূপ যে কোন কারণে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ দাবী করে মামলা করতে পারে।[৩৬]

স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হলে সন্তানের উপর তার আর কোন দাবী থাকেনা যদিও সন্তানটিকে জন্মদিতে তার শারীরিক মানসিক সব রকম কষ্ট করতে হয়েছে। পুরুষ জাতকের মাধ্যমে বংশ এবং সম্পতি বিচার করা হয়। পিতৃতান্ত্রিকতায় শিশুর উপর আইনগত অভিভাবকত্ব সবসময়ই পিতার, তবে শৈশবকালে অর্থাৎ পুরুষ শিশুর বেলায় সাত বছর পর্যন্ত এবং মেয়ে সন্তানের

---

[35] আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, রাবেয়া ভুইয়া, লিগাল স্ট্যাটাস অব ওমেন, পৃঃ ২৪৫।
[৩৬] Dissolution of Muslim marriages Act of 1939 and Muslim Family Laws Ordinance of 1961.

Dhaka University Institutional Repository

বেলায় যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত মায়ের তত্ত্বাবধানে রাখার বিধান আছে। প্রকৃত পিতা যাতে সন্তানের দাবী করতে পারে সেজন্য তালাকের ক্ষেত্রে গর্ভধারনের সম্ভবনা বাঁচাইয়ে ইদ্দত বা নি:সঙ্গতা মানা হয় যা তিনটি মাসিক কালচক্র সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং সে সময় সেই তালাক প্রাপ্তা নারী বিয়ে করতে পারে না। অর্থাৎ সবসময় দায়িত্ব, কষ্ট ও কর্তব্য সেবা বা ত্যাগ করার জন্যেই যেন নারীর জন্ম।

সামাজিক ভাবে একজন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে অবহেলার চোখে দেখা হয়। তাছাড়া আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা আইনের আশ্রয় চাইবার আর্থিক সংগতি এবং মানসিকতার অভাব মেয়েদের বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত নির্যাতন সহ্য করতে বাধ্য করে। অনেক পিতামাতা ও মেয়ের তালাককে সমর্থন করে না। তারা তাকে কষ্ট সহ্য করে হলে ও স্বামী গৃহে অবস্থান করতে বলেন। আমাদের সমাজে একটি বহুল প্রচলিত কথা আছে মেয়েরা 'শ্বশুর বাড়ী যায় লাল বেনারসী পরে আর বের হয় সাদা কাফন পরে।' এর মধ্যে যত নির্যাতন বা কষ্টই নারী সহ্য করুক না কেন, শ্বশুর বাড়ী বা স্বামীকেই তার সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল বলা হয়-যদিও বা অধিকাংশ নারীই স্বামী গৃহেই বেশী নিগৃহীত, নির্যাতিতও অরক্ষিত। কোন কোন লোকাচার স্বামীর পায়ের স্ত্রীর বেহেশত খুঁজে ফেরে। প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধে তালাকের প্রচেষ্টা একজন নারীর জন্য লজ্জাজনক,তার পিতা-পরিবার ও নিজের মর্যাদা হানিরই নামান্তর। তাছাড়া তার বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে তার ছোট ভাই বোনদের বা তার কন্যার বিবাহ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এরূপ পরিবারের সাথে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন আগ্রহী থাকে না এবং বাঞ্ছিত পাত্র পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। আর যেহুত তালাক প্রাপ্তা মা শিশুর অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তাই মাতৃস্নেহ ও শিশুর কথা চিন্তা করে কোন মা-ই সহজে বিবাহ বিচ্ছেদের পথে না যেয়ে বরং স্বীয় জীবনে সব অবমাননা ও নির্যাতন সহ্য করে যায়।

সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন ঃ

মুসলিম আইনে পিতার সম্পত্তির কন্যা পায় পুত্রের অর্ধেক। অর্থাৎ পুত্র যদি পায় ২ভাগ তবে কন্যা পায় একভাগ। তবে খুব কম নারীই তার আইন সঙ্গত সম্পত্তির ভাগ পায় বা তার বৈধ উত্তরাধিকার গ্রহণ করে। নিজ গ্রাম বা এলাকার বাইরে বিয়ে দেওয়ার কারণে মেয়ে পিতার সম্পত্তি হতে অনেক দূরে বাস করে এবং তাদেরকে নিজস্ব স্বার্থ দেখাশুনা করার জন্য অবশ্যই

Dhaka University Institutional Repository

অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। অধিকন্তু অধিকাংশ নারীই তাদের পক্ষে স্বীয় অধিকার ত্যাগ করে পুরুষ প্রতিরক্ষার উপর নির্ভরশীল হবার কারণে সংকট কালে গোষ্ঠীর সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে জমির অধিকার বিনিময় করে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিধানে এমন সাহায্য সমর্থনের কথা আছে। কেবল বিধবা নারীই তার সম্পত্তি দাবী করে এবং তা সাধারণত ঐ বিধবা নারীর পুত্ররাই ভোগ করে থাকে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির ১/৮ অংশ পায় এবং যদি সে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে বিধবা-পত্নী পায় সম্পত্তির ১/৪ ভাগ। কিন্তু হিন্দু সম্পত্তি আইন অনুসারে কন্যা পিতার জমির উত্তরাধিকারী নয়।

মুসলিম আইন অনুসারে স্ত্রীর সম্মাতিক্রমে পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে পারে এমনকি চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার বিধি আছে। এই বিধি পুরুষকে স্বেচ্চাচারী, অত্যাচারী হতে সহায়তা করে। নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার বেড়ে যায়। তারা নারীকে তালাকের ভয় দেখিয়ে, বিভিন্নভাবে মানসিক অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় বা বহু বিবাহের জন্য জোর করেও স্ত্রীর সম্মতি আদায় করে। (Muslim Family Ordinance-1961) মুসলিম পরিবার অধ্যাদেশ ১৯৬১-তে যদিও শরিয়ত অনুযায়ী পুরুষের 'তালাক' ও বহুবিবাহের উপর কিছু বিধি নিষেধ (কাড়াকড়ি) আরোপ করেছে, কিন্তু তবু সামাজিক মূল্যবোধগুলি বহুবিবাহ ও তালাকের ব্যাপারে পুরুষের সেই পূর্বের অত্যাধিক স্বাধীনতাকে ধরে রাখতে সহায়তা করছে। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেনীর মধ্যে তালাকের প্রবণতা বেশী দেখা যায়। কারণ দরিদ্র শ্রেনীর পুরুষেরা যে যতবার বিয়ে করবে ততবার কনে পক্ষ থেকে কিছু উপহার বা নগদে টাকা পয়সা যৌতুক হিসেবে পাবে। এতে তারা আর্থিকভাবে লাভবান তো হয়ই, এছাড়া নবযৌবনা স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করে। আবার বিয়ের সময় যে মহারানা পরিশোধের আইন রয়েছে বাস্তবে তা মান্য করার প্রবণতা খুবই বিরল ঘটনা। তবে কোন কোন দরিদ্র পরিবারে মেয়ের বিয়ের সময় অনেক পিতামাতা মোহরানা আদায় করে থাকেন যা তার পিতামাতা, ভাই বা পুরুষ অভিভাবকই ভোগ করে থাকে। এসব কারণে দরিদ্র শ্রেনীর মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা আজও চালু রয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেনীর নারীদের মধ্যে তালাক প্রদানের ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে। কারণ এতে মামলার সাথে জড়িয়ে পড়ে ঝামেলা পোহাতে এবং নারীকে বিভিন্ন অপবাদের সম্মুখীন হতে হয় যদিও এর পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ নিহিত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে যদিও সংবিধানে নারীকে সমান অধিকার দান এবং উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তবে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়নি। একবিংশ শতাব্দীতে ও নারীকে অসহায় ভাবে যৌতুকের বলি হতে হয়। নির্যাতিত হতে হয়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে নানা রকম অত্যাচার করা হয়, কখনও বা এসিড নিক্ষেপ করা হয়, কখনও বা হত্যা করা হয়। বিভিন্নভাবে নারীর অধিকার হরণ করার মাধ্যমে গোটা সমাজ ব্যবস্থা আজও পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারছে না।

৪.৪ নারী উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি ঃ

উন্নয়ন ও আধুনিকতার মূলে যে বিষয়টি প্রথমে কাজ করে সেটি হল চেতনা/ বোধ বা সচেতনতা। বিরাজমান পরস্থিতি মানুষের মধ্যে অতৃপ্তির বোধ তৈরী করেছে বলেই তাদের মনে নানা রকম প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। এবং সেই প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান খুঁজতে গিয়েই মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধশালী হয়েছে। তাই সচেতন সমাজই পারে একটি ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করতে। তবে এই সচেতনতা কয়েকজন বোদ্ধা, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই হবে না, এটি জন সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে সেই সমাজ হবে সচেতন সমাজ। আর একটি সচেতন সমাজের পক্ষেই সার্বিকভাবে নারীর উন্নয়ন সম্ভব। নারীর পশ্চাৎ পদতা, অজ্ঞতা, অসহায়তা, হীনমন্যতাবোধ, পরাধীনতা, পরনির্ভরশীলতা, আত্মসচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে উন্নয়ন ধারা বেগবান হবে। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে দুই ভাবে, দু'টি শ্রেণীর মধ্যে।

১) নারীর নিজস্ব সচেতনতা।

২) পুরুষের সচেতনতা।

১) নারীর নিজস্ব সচেতনতা ঃ

শতাব্দীর পর শতাব্দী নারী পুরুষতান্ত্রিকতার নিস্পেষণে বঞ্চিত, নিপীড়িত, শাসিত, এবং শোষিত হয়ে আসছে। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরণের হীনমন্যতা বোধ তৈরী হয়েছে। এর কারণ নিহিত রয়েছে তার নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থাৎ নারীর সামাজিকীরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে যা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে নারী হারিয়ে ফেলেছে তার মানবিক

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার গুলি, খুঁজে পেয়েছে শুধু শাসন আর শোষন- ফলে তার আত্মপলব্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে। নারীর এই অবস্থা ও অবস্থান তৈরির প্রকৃত কারণগুলি আসলে কি কি - সে বিষয়গুলি সম্পর্কে নারীকে সচেতন করে তুলতে হবে। নারী শুধু দৈহিক গঠনের কারণে পুরুষের চেয়ে আলাদা, তার প্রকৃত পরিচয় সে মানুষ। আর এই মনুষ্য সমাজের বংশগতি ক্রিয়াশীল অব্যাহত রাখার জন্যই নারী পুরুষের এই অবয়ব পার্থক্য - যা মানব সভ্যতার জন্য একান্ত অপরিহার্য। এই দৈহিক পার্থক্য বা বৈচিত্র কারুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বা কারুর অবমাননার জন্য সৃষ্ট নয়- এ সৃষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে এক পারস্পরিক সৌহার্দ, সহমর্মিতা, সহাবস্থান আর বন্ধুত্ব সুলভ সমাজ সৃষ্টির এক অদৃশ্য প্রয়াস। কিন্তু সেই সুন্দর সৃষ্টিকে মানুষ তার স্বীয় স্বার্থে কাজে লাগাতে গিয়ে তার অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি ঘটিয়েছে। জন্মলগ্নে প্রতিটি শিশুই একই মগজ, একই রক্তমাংস এবং একই মানবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রথম কান্নার মাধ্যমে পৃথিবীতে তার আগমন বার্তা ঘোষণা করে। অথচ সমাজ সৃষ্টির এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে অস্বাভাবিক পথে পরিচালিত করে, পৃথিবীর বুকে নারীকে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর' অন্তর্গত করে প্রান্তিকতায় নিপতিত করে, এবং এই অস্বাভাবিক নির্মাণ প্রক্রিয়াকেই এতদিন এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবে সমাজের পথে পরিচালিত করেছে। পুরুষ সমাজে তার প্রভাব ধরে রাখার জন্য সন্তান উৎপাদনের এবং বংশ রক্ষার সবটুকু কৃতিত্ব নিজের দিকে টেনে নিয়েছে। অথচ একটি বিশেষ মুহূর্তের শারীরিক প্রবৃত্তির (যা নারীর অংশ গ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়) ফসল হল মানব সন্তানের ভ্রূনের জন্ম এবং পরবর্তীতে সন্তান ধারন লালন-পালন ইত্যাদি সার্বিক প্রক্রিয়াটি নারীর উপর নির্ভরশীল প্রচন্ড ভাবে। এতবড় একটি দায়িত্ব পূর্ণ এবং সম্মান জনক কাজ নারী অনায়াসে নিজের শরীরের সার্বিক কষ্টস্বীকারের মধ্যে দিয়ে সন্তানকে পৃথিবীতে আনার মাধ্যমে সম্পন্ন করেও নিজের সম্মানকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষমতার বদলে হীনমন্যতাবোধে ভোগে।

অপরপক্ষে সন্তান উৎপাদনের বা মাতৃত্বের মত এতবড় একটি কাজ করার মত শারীরিক স্বক্ষমতা পুরুষের নেই। এতবড় গর্বের বিষয়টি পুরুষতান্ত্রিকতার অপব্যাখ্যার কারণে সমাজে অনেক নারী প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। যদিও সমাজে বিভিন্ন ভাবে মায়ের স্থান সবার উপরে- এই মতবাদ প্রচলিত। এই মর্যাদা পুরুষ পেলে গোটা সমাজের চিত্র ভিন্ন রকম হত-সন্দেহ নেই। তাই নারীকে তার মধ্যে লুকায়িত চরম সক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে হবে। একজন মায়ের আর্দশেই শিশু গড়ে ওঠে। তার এই মাতৃত্বের অহংকার সবার উপরে।

Dhaka University Institutional Repository

আবার জন্মলগ্নে একই মেধা নিয়ে (নারী-পুরুষ) মানব সন্তান পৃথিবীতে আসে। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা নারী ও পুরুষকে ভিন্নতা দান করে। নারী মেধায় মননে সুযোগ পেলে যে পুরুষের সমান কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে আরও বেশি দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে সে ব্যাপারে নারীকে সচেতন করে তুলতে হবে। তাই নারীকে স্বীয় অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। তাছাড়া তার মধ্যে যে শৈল্পিক বোধ ও সুকুমার বৃত্তি রেয়েছে তাকে জাগ্রত করতে হবে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সবক্ষেত্রেই তার রয়েছে পুরুষের সমান অধিকার। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আইনগত সবদিক থেকে সে পুরুষের সমান এবং 'নারী' নয়-'মানুষ' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রত্যয় তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পুর্ণবিন্যাস ও পাঠ্য পুস্তকে জেন্ডার সচেতনতা সমৃদ্ধ বিষয়াবলী সংযুক্ত করতে হবে। নারীকে নিজেকে প্রথমে সচেতন হতে হবে এবং স্বীয় অধিকার আদায়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করার পদক্ষেপ নিতে হবে। অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত নারীদের মধ্যে সচেতনতা বোধ জাগ্রত করতে হবে। আর এ জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে বিভিন্ন গণ মাধ্যমগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে।

১৯৭৯ সালের ১৮ ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা সিডও নামেই বেশি পরিচিত। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে নারী পুরুষ সমান মর্যাদা , অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি মেলে। সিডও চুক্তি যে তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলো হচ্ছে-বৈষম্য বিলোপ, প্রকৃত সমতা এবং সেই সমতা অর্জনের লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং সুযোগ ব্যবহারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে রাষ্ট্রের বাধ্য-বাধকতা। "সিডওতে একদিকে যেমন নারীর সমান অধিকার, মর্যাদার পরিপন্থি সব ধরণের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নিরসনের রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতার উল্লেখ আছে, তেমনি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে নারীর সমঅধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ অংশগ্রহণের নিশ্চয়তায় রাষ্ট্র কর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের বাধ্য বাধকতা ও রয়েছে। বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন, সন্তানের অভিভাকত্ব, সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদি) নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা বিধানে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। নারীর অধস্তনতা ও পশ্চাদপদতার

Dhaka University Institutional Repository

অনুঘটক হিসেবে সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন প্রথা, অভ্যাস, কুসংস্কার দূরীকরণে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে।"[৩৭]

১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশে সিডও চুক্তিটিতে অনুসমথনের মাধ্যমে এ চুক্তি অনুসারে নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ ও নারী-পুরুষ সমঅধিকাররের নিশ্চয়তায় উপযুক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মেনে নেয়। সংবিধান, সিডও চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির বাধ্যবাধকতার অনুসরনে নারীর সমঅধিকার অর্জনে বিভিন্ন আইন, নীতিগত প্রতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপও নেয়া হয়। ফলে আমাদের আছে নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সরকারী প্রতিষ্ঠান। নারী অধিকার ও নিরপত্তার নিশ্চয়তায় প্রনীত হয়েছে বিভিন্ন আইন, ক্ষেত্রবিশেষে আনা হয়েছে বলবৎ আইনের সংশোধনী, যেমন-যৌতুক নিরোধ আইন, নারী নির্যাতন দমন আইন, এসিড অপরাধ দমন আইন, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আদালত ব্যবস্থায় আনা হয়েছে পরিবর্তন। যেমন নারী শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইবুনাল, পারিবারিক বিষয়ের মীমাংসায় পারিবারিক আদালত, এসিড অপরাধ বিচারে এসিড অপরাধ দমন আদালত।"[৩৮]

নারী প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধি নির্বাচনে স্থানীয় সরকার আইনের সংশোধনী আনা হয়েছে । দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতানিক উপবৃত্তিসহ নারী শিক্ষার ব্যবস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠানে চার মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা, সহিংস ঘটনার শিকার নারীর আইনগত, সামাজিক ও চিকিৎসার সহযোগিতায় ঢাকা ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন, ভোটার নিবন্ধন ফরমসহ সব ধরণের সরকারী দলিলপত্রে বাবার নামে পাশাপাশি মায়ের নাম অন্তর্ভূক্তি ইত্যাদি সরকারের তরফ থেকে নারী অধিকার নিশ্চয়তার প্রশ্নে ইতিবাচক পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। এসব ইতিবাচক পদক্ষেপ বাস্ত বায়নের ক্ষেত্রে নারীদের সচেতন প্রয়াস উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

২. পুরুষের সচেতনতা ঃ

নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমঅধিকার অর্জনে বিধিবদ্ধ এসব কাঠামোর বাইরে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতায় নারীর নাজুক অবস্থানের চিত্র খুবই স্পষ্ট। এর কারণ আজও নারী পুরুষ উভয়েই পুরুষ তান্ত্রিকতার আবর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি সম্পূর্ণরূপে। ব্যক্তিক,

[৩৭] কামরুন্নেসা নাজলী, সিডও এবং বাংলাদেশে নারী অধিকার বুলেটিন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক, সেপ্টেম্বর ২০০৭)।
[৩৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ওরাষ্ট্রীয় জীবনে ক্ষমতা, অধিকার, অংশগ্রহণ সব ক্ষেত্রেই আছে নারী পুরুষের মধ্যে বিস্তর বৈষম্য। এক্ষেত্রে সচেতন পুরুষ সমাজ পারে তাদের নেতিবাচক অবস্থান থেকে সরে এসে নারী উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নকে তরান্বিত করতে। রাজ রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা সাগর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, মধুসুদন দত্ত, রাধানাথ শিকদার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বেথুন প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ পুরুষ হলেও নারী কল্যানের জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তারা বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষিত, কুসংস্কার মুক্ত, বুদ্দিমত্তা সম্পন্ন, উন্নতচিত্ত যুক্তিবোধ সম্পন্ন নারীই পারে পুরুষের যোগ্য সঙ্গী হতে। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ পুরুষ আজও পুরুষ তান্ত্রিকতার জালে আবদ্ধ। তারা নিজের সুবিধা জনক অবস্থানকে পাকাপোক্ত করার জন্য প্রতিনিয়ত নারীর প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা, অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন ইত্যাদি চালিয়ে আসছে। অথচ এই পুরুষই ভাই বা পিতা হিসাবে অন্য পুরুষের অন্যায় আচরনের কাছে অসহায়। কন্যা দায় গ্রস্থ পিতা যৌতুকের দাবী মেটাতে না পারলে (তারই চোখের সামনে) মুখ বুজে মেয়ের উপর অন্য পুরুষের (মেয়ে জামাই) নির্যাতন সহ্য করতে হয়। কখনও বা তারা চোখের সামনে অসহায় সন্তানের আত্মহত্যা প্রত্যক্ষ করে, আবার কখনও বা নিষ্ঠুর স্বামীর হাতে কন্যার হত্যার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। তখন সেই পিতা বা ভাই-এর হাহাকার মানসিক যন্ত্রনা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার গালে কঠিন ভাবে চপেটাঘাত করে। সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পুরুষকে নির্দয়-নিষ্ঠুর বানানোর যে প্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে তা পুরুষেরই সৃষ্টি এবং এই ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার দায়িত্ব তাই পুরুষকেই নিতে হবে। কারণ পুরুষ শাসিত সমাজে এ পর্যন্ত গৃহীত সকল আইন কানুন শাসন ব্যবস্থা রীতিনীতি পুরুষেরই তৈরী। পুরুষই নিজের ভোগের বা সুবিধার জন্য সজ্ঞানে অথবা অসতর্কভাবে নারীর প্রতি বৈষম্যপূর্ণ সব রীতিনীতি তৈরি করে নারীকেই তার ধারক এবং বাহক হিসাবে নিয়োজিত করেছে। তাদের মগজে পরাধীনতার বীজ বপন করে দাপটের সাথে শাসন করেছে নারীকে। কিন্তু এ প্রক্রিয়াক পুরুষের অজ্ঞাতেই পুরুষের অনেক বড় ক্ষতি করেছে, উন্নয়নকে করেছে বাঁধাগ্রস্থ।

পুরুষই নারীকে নিজস্ব সম্পত্তি আর ভোগের সামগ্রি হিসেবে তৈরি করেছে বিভিন্ন রীতি তারা সতি দাহ প্রথা চালু করেছে, আবার কিছু বিবেকবান পুরুষই এই নিষ্ঠুর প্রথা বিলোপ করেছেন সংগ্রাম করে এবং আইন করে। এসব অমানবিক প্রথা চালু করে পুরুষ নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, হিংস্রতা,অসাধুতার প্রতীক হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নাম লিপিবদ্ধ করে রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে অন্ধকারে নিপতিত করেছে। নারীকে নিগৃহীত আর নির্যাতন করতে গিয়ে নিজেকে বর্বরতার প্রতীক হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যৌতুকের নামে পাত্রী পক্ষের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে নিজেকে টাকার কাছে বিক্রি করে দিয়ে-নিজেকে অবমূল্যায়িত করেছে। প্রকৃত পক্ষে মানুষের মনুষ্যত্ব ও বিবেকের কোন অর্থনৈতিক মূল্য হয় না। তাই এ ক্ষেত্রে পুরুষ নিজেকে অবমূল্যায়িত করেছে। নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপ করে হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। আবার স্ত্রীকে নির্যাতন করে সবচেয়ে কাছের মানুষটির কাছে নিজেকে ভয়ঙ্কর করে তুলে নিজের সম্মান ও ভালবাসা হারিয়েছে, প্রিয়জনের কাছে নিজেকে ঘৃনার পাত্র করে তুলেছে। তাই সকল প্রকার নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলার প্রতি পুরুষকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। তাদের এ ব্যাপারে সচেতন করতে হবে যে- 'ভোগে নয় ত্যাগে' নির্যাতনে নয় ভালবাসায়, 'আগ্রাসনে নয় সহযোগিতায়'-একটি মানুষের পূর্ণতা আসে। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা সহাব্যস্থান একটি দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। আর এজন্য পুরুষের সচেতনা জাগ্রত করতে হবে, শিক্ষা ব্যবস্থা, জাতীয় নীতি নির্ধারণ, সরকারি ভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে, সমাজের অর্ধাংশ নারীকে সাথে নিয়ে অগ্রগতির পথে পা বাড়াতে হবে। এ জন্য গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা হতে পারে সবচেয়ে বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ উন্নয়ন যোগাযোগ ও গণমাধ্যম
৫.১.১ মানব উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা
৫.১.২ নারী উন্নয়নে গণমাধ্যম
৫.১.৩ নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমঃ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ
৫.১.৪ জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নির্মাণ প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যম
৫.২ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অবস্থান উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা
৫.৩ রাজনীতিতে নারী ও গণমাধ্যম

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের বিভিন্ন কৌশল পরিলক্ষিত হয়। এই আন্তঃযোগাযোগই মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তুলেছে, মানুষের জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটিয়েছে, তার বিজ্ঞান মনস্কতার বহিঃ প্রকাশ ঘটিয়েছে। জীবনমান উন্নয়নে রসদ যোগাতে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে গিয়েছে সে খুঁজে পেয়েছে সমুদ্রের তলদেশের অতুল বিস্ময়, সে হয়েছে মহাকাশচারী গ্রহ-গ্রহান্তরে ছুটে গিয়েছে; আর এসবই তার জীবনমান উন্নয়নের প্রচেষ্টার অংশ। আর এর সব কিছুই সম্ভব হয়েছে উন্নয়ন যোগাযোগের মাধ্যমে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী তাই 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টির সাথে উন্নয়ন যোগাযোগ ও গণমাধ্যমকে সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। উন্নয়নের সাথে গণমাধ্যমের যে শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে তা বিভিন্ন পন্ডিত বর্গের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। উন্নয়নের উপর গণমাধ্যমের ক্রিয়াশীলতা অত্যন্ত প্রকট। তাই এ অধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ে এ সংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে অবশ্যই গণমাধ্যম ও উন্নয়ন যোগাযোগ সংক্রান্ত ধারণার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে উন্নয়ন যোগাযোগ ও গণমাধ্যম, মানব উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা, নারী উন্নয়নে গণমাধ্যম ও এর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নির্মাণ প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যম, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অবস্থান, রাজনীতিতে নারী ও গণমাধ্যম ইত্যাদি বিষয়ে বিষদ ভাবে আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।

৫.১ উন্নয়ন যোগাযোগ ও গণমাধ্যমঃ

উন্নয়ন যোগাাযোগ বা সামাজিক যোগাযোগ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কার্যকরী অ্যাপ্রোচ। জেন্ডার সমতা, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পরিচালিত কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে এর প্রয়োগ দীর্ঘদিনের। উন্নয়ন ও সামাজিক যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের মাধ্যম

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান বা উপকরণ যেমন পোস্টার, লিফলেট, বই, নাটক, গান, ছবি, প্রামাণ্য চিত্র, স্লাইড, পেইন্টিং, আলোকচিত্র, কার্টুন পটচিত্র, প্রশিক্ষণ সহায়িকা ইত্যাদি। যোগাযোগের বিভিন্ন কৌশলগুলো যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা হলে তা উন্নয়ন কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনতে সহায়ক হয়। উন্নয়ন ধারণা সাম্প্রতিক কালের। যোগাযোগ মানব ইতিহাসের মত প্রাচীন বিষয় হলেও একে উন্নয়নে ব্যবহার, উন্নয়ন যোগাযোগের উপর গবেষণা, আনুষ্ঠানিক অধ্যয়ন শুরু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে। " পঞ্চাশের দশক থেকে ড্যানিয়েল লার্নার, পল, এফ, ল্যাজার্মফোল্ড, উইলবার শ্র্যাম, এবং পরবর্তী সময়ে এভারেট এম, রজার্স, কিনকেইড, পাই এবং রাও প্রভৃতি যোগাযোগ পন্ডিতগণ উন্নয়নে যোগাযোগের ভূমিকার উপর গবেষণা করেন। উন্নয়ন যোগাযোগের উপর গবেষণা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পঠন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক ভাবে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের পাশাপাশি গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রসঙ্গেও যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে।"[১]

৫.১.১ মানব উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকাঃ

যোগাযোগের সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক যে অবিচ্ছেদ্য তা বিভিন্ন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। লছমন রাও (১৯৬৬) ভারতের দুটি গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন যে যোগাযোগের সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অনুরূপভাবে ফেরি (১৯৬৬) তুরস্কে ৪৬০ জন গ্রামবাসীর উপর সমীক্ষা চালান। কেইথ, ইয়াভাব ও এসকর্পট (১৯৬৬) কলম্বিয়া, কেনিয়া ও ভারতে একটি সমীক্ষা চালান। লার্নার (১৯৫৭) ও আউটরাইট (১৯৬৩) বিশ্বের ৫০ থেকে ৭০টি দেশে সমীক্ষা চালান এঁদের প্রত্যেকের সমীক্ষাতে দেখা যায় উন্নয়নের সংগে যোগাযোগের প্রত্যক্ষ সাম্পর্ক আছে।"[২]

ড্যানিয়েল লার্নার উন্নয়নে গণমাধ্যমের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন গণমাধ্যমে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মানসিক গতিশীলতা বাড়ায়। এই মনস্তাত্ত্বিক গতিশীলতা

[১] মোঃ সফিকুল ইসলাম, উন্নয়ন যোগাযোগ ঃ সাম্প্রতিক ভাবনা সমাজ নিরীক্ষন-৬০ পৃঃ ১৮

[২] ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গণ-জ্ঞাপন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, কলিকাতা, ১৯৮২ পৃঃ ২৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের আবশ্যক উপাদান। এ কারণে গণমাধ্যমকে বলা হয়েছে মবিলিটি মালটিপ্লায়ার, এমনকি ম্যাজিকমাল্টি প্লায়ার।"[৩]

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়ায় দিকে উইলবার শ্র্যাম জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকায় প্রসংগে তাঁর "Mass Media and National Development" নামক গ্রন্থে উন্নয়নে গণমাধ্যমের সহায়ক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থে তিনি পরিবেশ পর্যবেক্ষণ নীতি নির্ধারণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের কার্যকারিতার ওপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থটি অনেক উন্নয়নশীল দেশের সরকারের গণমাধ্যম বিষয়ক নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করেছে।

অবাধ তথ্য প্রবাহ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উল্লেখ করে শ্র্যাম বলেন "The amount of information available and the wideness of its distribution is thus a key factor in the speed and smoothness of development.[৪]

ডঃ শ্র্যাম বলেন গণযোগাযোগের সাথে আন্তর ব্যক্তিক যোগাযোগ যুক্ত হয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক বিপ্লব অর্থাৎ বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে আমরা একথা বলছি না যে কেবলমাত্র গণযোগাযোগের মাধ্যমে একাজ করা সম্ভব।[৫]

ডঃ শ্র্যাম অন্যত্র আবার উন্ননের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ত্রিবিধ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ভূমিকা হল- ১) তথ্য জ্ঞাপন, ২) প্রশিক্ষণ ও ৩) অংশগ্রহণ ।[৬]

উন্নয়নের আধুনিক ধারায় জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। এছাড়া তথ্য ও প্রশিক্ষণ উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংগ।

---

[৩] D. Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, New york, Free Press. 1958.
[৪] Wilbur Schramm Mass Media and National Development, Stanford University Press, Stanford, California, 1964.Page-49.
[৫] প্রাগুক্ত page-91
[৬] ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত , পৃঃ ৩০১-৩০২

Dhaka University Institutional Repository

আবার এভারেট এম রজার্স উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, উন্নয়নের পুরাতন ধারানায় যোগাযোগের ভূমিকা ছিল ১) উন্নয়ন সংস্থাগুলো হতে নতুন প্রযুক্তির ধারনা সুবিধাভোগী শ্রেনীর মধ্যে পৌছনো এবং ২) সাধারণ জনগণের মধ্যে আধুনিকীকরণের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং পরিবর্তন আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলা। কিন্তু সত্তরের দশকে উন্নয়নের ধারণার পরিবর্তনের সাথে সাথে উন্নয়ন যোগাযোগের ভূমিকা কি হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এজন্য তিনি উন্নয়নের পরিবর্তিত ধারণায় যোগাযোগের ভূমিকার উপর গবেষণার প্রতি জোর দিয়েছেন।[৭]

আজ গোটা বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে যোগাযোগ মাধ্যম এমনকি একে যে কোন যুদ্ধাস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী বলা যায়। গণমাধ্যম মনস্তত্বিক চাপ সৃষ্টি করে সারা বিশ্বে সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মোট কথা যে কোন দিককে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

উন্নয়ন ধারনার অগ্রগতি ও পরিবর্তনের সাথে সাথে উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ষাটের দশকে যোগাযোগ পন্ডিতগণ গণমাধ্যমের যে সহায়ক ভূমিকার কথা বলেছেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা গ্রহনযোগ্য নয়।

উন্নয়নের তিনটি সূচক স্বক্ষমতা অর্জন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এর প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিন্দুতে যে মানুষ সেই মানব সম্পদ উন্নয়নে কেন্দ্র গণমাধ্যম প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে গণমাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার উপর তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ (আইইসি) বিষয়ক ব্যাপক প্রচার হচ্ছে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ গণমাধ্যম থেকে সরাসরি তথ্য পেয়ে স্বাস্থ্য সচেতন হচ্ছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তাছাড়া গণমাধ্যম বিশেষ করে টেলিভিশন, রেডিও এমনকি সংবাদ পত্রের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। বিবিসির ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেল কর্তৃক কম্পিউটার শিক্ষা, কৃষি বিষয়ক ও অন্যান্য সচেতনতা

[৭] Wilbur Schramm and Daniel Lerner, Communication and Change: The Last Ten-years- And the Next , East West center, Honolulu, 1976, Page 49-50

Dhaka University Institutional Repository

মূলক অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যায়। অন্যদিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে কি উৎপাদন করা হবে, কেন করা হবে, কোথায় করা হবে এবং কার জন্য উৎপাদন করা হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সামনে রেখে একজন এন্টারপ্রেইনার উৎপাদনের লক্ষ্যে অর্থ বিনিয়োগ করছে। শেয়ার বাজারের মূল্য বৃদ্ধি-হ্রাস, সূচক, ইত্যাদি অবস্থা দেখে ব্যবসায়ী তথা সাধারণ মানুষ শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে। আর এ সকল তথ্যের জন্য তাকে গণমাধ্যমের উপর প্রতিনিয়ত নির্ভর করতে হচ্ছে। গণমাধ্যম বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মানুষের মনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সুদূর প্রসারী ইমেজ তৈরী করে যা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মানে সহায়তা করে। "গণমাধ্যম কর্তৃক প্রচারিত তথ্যের প্রকৃতি এই অর্থে মতাদর্শগত যে এটা দর্শকদের (audience) মধ্যে কিছু ধারণা /আদর্শ তুলে ধরছে ও পৌঁছে দিচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধের নিরিখে এই তথ্য সমূহ নিয়ন্ত্রণ কারী সংস্থা /প্রযোজক দ্বারা এনকোড (encode) করা হয় এবং দর্শক /গ্রহণকারীদের দ্বারা একই অথবা ভিন্ন মূল্যবোধের নিরিখে ডিকোড (decode) করা হয়। এই অর্থে গণমাধ্যমের কোন বিষয় representation অবজেকটিভ অথবা 'প্রকৃত' বা 'স্বাভাবিক নয়' বরং তা হচ্ছে বাস্তব অবস্থার পূর্ণনির্মাণ যা সেই বিশেষ সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা নির্মিত। নাটক, উপন্যাস, ছোট, গল্প, মুদ্রিতাকারে বেতার বা দৃশ্যমান (visual) মাধ্যম যে কোন প্রকারেই হোক, এমন সব বার্তায় পূর্ণ যা সামাজিক সম্পর্কের একটি বিশেষ ধরণকে 'নির্দেশ' পুনরুৎপাদন করে।[৮]

এটা ঠিক যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে মানুষে মানুষে, দেশে যোগাযোগ সহজ ও সস্তা হয়েছে। ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, ফ্যাক্স-এটা সম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু বিশ্বায়ন সৃষ্ট নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই অমিত সম্ভাবনা সত্ত্বেও তা কাঙ্খিত মানব উন্নয়ন ঘটাচ্ছে না। বরং নতুন করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং দেশের অভ্যন্তরে মানুষে মানুষে বৈষম্য বেড়েই চলছে। আর এই বৈষম্য নানা মাত্রিক-ভৌগলিক, শ্রেণীগত, শিক্ষাগত, জেন্ডারপত্র ভাষাগত। ভৌগোলিক ভাবে এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি।

[৮] মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিরীক্ষনে লিঙ্গীয় বিশ্লেষণ, মেঘনা গুহ ঠাকুরতাও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী সংহতি কর্তৃক প্রকাশিত গণমাধ্যম ও নারী, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার অভাব নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক। কেননা এই উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সুফল পেতে হলে একজনকে অন্তত পক্ষে একটি নির্দিষ্ট স্তরের মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করতে হয়। অথচ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এখনো নিরক্ষর। দেখা গেছে যে, বিশ্বের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৩০ ভাগ অন্ততপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। তথ্য ও যোগাযোগের মহাসড়কে চলার জন্য আর্থিক খরচ ও কম নয়। যেখানে একজন বাংলাদেশীর পক্ষে একটি কম্পিউটার কিনতে হলে কয়েক বছরের সঞ্চয় দরকার, সেখানে মাত্র একমাসের বেতন দিয়েই একজন মার্কিন নাগরিক একটি কম্পিউটার কিনতে সক্ষম। বৈষম্যের অন্য দিকও রয়েছে। আর সেটা হলো নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পুরুষ ও তরুনদের একচেটিয়া প্রাধান্য। নারী ও বৃদ্ধরা এখানে পিছিয়ে আছে। যেমন জাপানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা মাত্র ১৭ ভাগ, চীনে ৭ ভাগ এবং যুক্তরাজ্যে ৩০ ভাগের নিচে। আবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভাষাগত প্রাধান্য অন্তরায় হয়ে দাড়াচ্ছে। কেননা দুনিয়ার সমস্ত ওয়েবসাইটের প্রায় ৮০ভাগ হলো ইংরেজী। অথচ সারা বিশ্বের প্রতি ১০ জনের মধ্যে মাত্র একজন এই ভাষায় কথা বলতে পারে। এসব কারণে তাই স্বাভাবিক ভাবে বিশ্বায়ন তাবৎ বিশ্ব জনগোষ্ঠীকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। একই বিশ্বে দুটি সমান্তরাল বিশ্ব জন্মলাভ করেছে। একদিকে বিশ্ববায়নের মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী আর অন্যদিকে বিপুল সংখক সুফল বঞ্চিত মানুষ। বিশ্বায়ন যাদের আরো প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্বায়ন সূচিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল কেবল তারাই পাচ্ছে যারা সচ্ছল, শিক্ষিত কেননা এরাই অর্থশালী হওয়ায় যোগযোগ প্রযুক্তির সুযোগ ও তথ্য লাভে সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে। বাদ বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য এই সুযোগ হয়ে উঠেছে ব্যয়বহুল। আর ধনীরা জ্ঞানসম্পদে ও হচেছ আরো ধণী ও ক্ষমতাশালী। অন্যদিকে অগনিত সাধারণ মানুষ বিশ্বায়নের তথ্যজ্ঞান থেকে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারছে না। এমনকি তাদের কণ্ঠস্বর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে দিন দিন। এই পরিস্থিতিতে নারীরা আরো বেশি পিছিয়ে পড়ছে।''[৯]

[৯] চিররঞ্জন সরকার, 'নারীর ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব', উন্নয়ন পদক্ষেপ ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, মার্চ ২০০৭ পৃ: ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন কালে মানুষ যখন লিখতে পড়তে জানত না তখন পরস্পর পরস্পরের মনের ভাব বিনিময়ের জন্য নানা রকম সংকেত, প্রতীক, চিহ্ন চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করত। তাই এগুলোকে গণমাধ্যমের অন্তর্ভূক্ত করা যায়। কারণ তারা বিভিন্ন রকম খরবা খরব, বিপদ সংকেত হিংস্র জানোয়ারদের হাত থেকে রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্যকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম সংকেত চিহ্ন ও প্রতীক ব্যবহার করত। পরবর্তীতে মানুষ যখন বিভিন্ন হাতিয়ারের ব্যবহার শিখল তখন খাদ্য সংগ্রহ পশুপালন, পশুশিকার, কৃষি উৎপাদন ইত্যাদি তার কাছে আরও সহজসাধ্য হয়ে উঠল। জীবন জাপনের মান উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত মানুষ বিভিন্ন রকম আবিস্কারে নিজেকে নিয়োজিত করল। মানুষের জ্ঞান তৃষ্ণা তাকে 'লিপি' বা অক্ষর আবিস্কারে সহায়তা করল। মানুষ পাহাড়ের গুহা, গাছের গুড়ি, শুকানো চামড়া, গাছের পাতা ইত্যাদি লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে লাগল। পরবর্তীতে কাগজ ও মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্কার মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করল। মানুষের মনের ভাব ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেতে লাগল। এভাবে ক্রমে গণমাধ্যমের বিকাশ ঘটতে লাগল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা, রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বৈজ্ঞানিক আবিস্কার, জনসচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই গণমাধ্যম উন্নয়নের অন্যতম বাহন হিসেবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। শাসকের অত্যাচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংবাদ পত্র, পুস্তক পুস্তিকা নীরব বিপ্লব চালিয়ে যেতে লাগল। ঘুনে ধরা সমাজের অবকাঠামো নির্মাণে প্রিন্ট মিডিয়া যে নীরব বিপ্লব সাধন করল তারই ফলশ্রুতিতে আমরা একটি উন্নত আধুনিক সমাজে বসবাস করতে পারছি। সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে বর্তমানে আমরা বিভিন্ন রকম গণমাধ্যমের সাথে পরিচিত হয়েছি যে গুলি ছাড়া আমাদের জীবন ধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের গণমাধ্যম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস রয়েছে।

তখনকার দিনে গণমাধ্যম বলতে মুদ্রিত মাধ্যম ও রেডিওকেই বিশেষভাবে বুঝত। কিন্তু বর্তমানে গণমাধ্যমের ধরণ বহু প্রকার। এগুলি হচ্ছে।

- **মুদ্রন শিল্পঃ**

  সংবাদ পত্র, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, ষান্মাসিক ইত্যাদি পিরিয়ডিকাল পত্রিকা, সাময়িকী, জার্নাল, পিরিয়ডিক্যাল বই, প্রচার পত্র ইত্যাদি। এগুলি গণমাধ্যমের বিকাশ লগ্ন থেকে আজও প্রচলিত এবং বিভিন্ন ভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

- **দর্শণ সম্বন্ধীয়ঃ**

ছবি, পোষ্টার, কার্টুন, শিল্পকলা, পেইন্টিং (ভাস্কর্য ইত্যাদি) নৃত্যকলা। এসব গণমাধ্যম গুলি মানুষের মানস লোকে স্থায়ী বা অস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী একটি ছাপ রেখে যায়- যা মানুষের সুকুমার বৃত্তি বিকাশের সহায়তা করে।

- **শ্রবণ সম্বন্ধীয়ঃ**

রেডিও ক্যাসেটস ওয়াকম্যান, মোবাইল ফোন ইত্যাদি।

- **শ্রবণ দর্শণ সম্বন্ধনীয়ঃ**

ছায়া-ছবি, টেলিভিশন, ভিডিও মঞ্চ (লোক ভিত্তিক, আধুনিক) এক্ষেত্রে বক্তৃতা, বিবৃতি রাজনৈতিক প্রচার প্রচারনা ইত্যাদিকেও ধরা যায়। মোইবাইল ফোন, কম্পিউটার। এগুলি দর্শন ও শ্রবণের মাধ্যমে মানুষ প্রতিনিয়ত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সারনি-৫.১

গন মাধ্যমের ধরণ

মূদ্রন শিল্প	শ্রবন সম্বন্ধীয়	দশন সম্বন্ধীয়	শ্রবন দশন সম্বন্ধীয়
সংবাদ পত্র	রেডিও	ছবি	ছায়া ছবি
পিরিয়াডিক্যাল	ক্যাসেটস্	পোস্টার	টেলিভিশন
বই	ওয়াকম্যান	কার্টুন	ভিডিও
জার্নাল	মোবাইল ফোন	শিল্পকলা	মঞ্চ
প্রচার পত্র		পেইন্টিং	(লোকভিত্তিক
ইত্যাদি		(ভাস্কর্য ইত্যাদি)	আধুনিক)
		নৃত্যকলা	মোবাইল ফোন
			কম্পিউটার

Dhaka University Institutional Repository

"উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ এর অবদান প্রত্যক্ষ। সমগ্র ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নের প্রধান সূত্র হলো এ সকল দেশের জনগণের নিকট উন্নয়নের সংবাদ ও সংযোগ অতি সহজ এবং দ্রুততার সাথে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।"[১০]

উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনার সাথে এ শতকে বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের যে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। গণমাধ্যমের বিবর্তনের একটি চিত্র সারনি-৫.২ এ তুলে ধরা হয়েছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য বলে আজকে আমরা বিশ্বের যে আঞ্চলটিকে চিনি সেই অঞ্চলে মুদ্রণ প্রযুক্তির প্রথম বিপ্লব সম্পূর্ণ হতে প্রায় ৪০০ বছর সময় লেগেছে অর্থাৎ গুটেনবার্গের সরিয়ে বসানোর উপযোগী টাইপ আবিস্কারের পর থেকে ১৮৩২ সাল নাগাদ সস্তা ধরণের অথবা বটতলার ছাপাখানার প্রকাশনা ইউরোপীয় জনসাধারণের জীবন যাত্রার অংগ হয়ে ওঠা পর্যন্ত প্রায় চার শতাব্দী চলে যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পর পর চারবার বিপ্লব ঘটে।

উন্নয়নশীল দেশগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্বাধীনতা অর্জন করলেও এ সকল দেশে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি পৌঁছে গেছে। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৭৫ সালেই যোগাযোগ উপগ্রহ টেলিভিশনের যুগে পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে দু'টি ভূ-উপগ্রহ স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ব নেটওয়র্কের আওতাধীন।"[১১]

সারনি-৫.২
পাঁচটি যোগাযোগ বিপ্লব

প্রযুক্তি উদ্ভাবন	যোগাযোগ চ্যানেল	আনুমানিক (বছরের হিসেবে) বয়স, ১৯৭৫ এ
স্থানান্তর যোগ্য টাইপ	মুদ্রণ	৫০০
ক্যামেরা	চলচ্চিত্র	১০০
ভাকুয়াম টিউব	বেতার	৫০
পিকচার টিউব	টেলিভিশন	২০
যোগাযোগ উপগ্রহ	বিশ্ব নেটওয়ার্ক	১০

[১০] ইসহাক বাড়ৈ, উন্নয়ন যোগাযোগ, দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, এপ্রিল ১১, ১৯৯৪।
[১১] মোঃ সফিকুল ইসলাম, উন্নয়ন যোগাযোগ : সাম্প্রতিক ভাবনা, সমাজ নিরীক্ষণ ৬০, পৃঃ ২০

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বাংলাদেশে উন্নয়ন যোগাযোগ ও গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে আর এক নতুন যুগের সূচনা করেছে সাবমেরিন কেবল এর আওতাভূক্তি। কম্পিউটার ফ্যাক্স, মোবইল ফোন, গণমাধ্যমের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছে। মাত্র দেড়/দুই দশকের মধ্যে এগুলি উন্নয়ন যোগাযোগের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

প্রতিটি সচেতন মানুষ মানব উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারেন। "উন্নয়ন যোগাযোগ হচ্ছে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য পরিচালিত কর্মকান্ডে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গণমাধ্যম ব্যবহারের একটি সুগঠিত প্রচেষ্টা। এ ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রচার, শিক্ষন ও সচেতনতা বৃদ্ধির পাশপাশি অংশগ্রহণ কারীদের আচরনগত পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। উন্নয়ন যোগাযোগ একটি গবেষণা লব্ধ এবং পরিকল্পিত প্রক্রিয়া যা এ্যাডভোকেসি, সোশাল মবিলাইজেশনসহ সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তন বা উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ও আজকের যুগে সফল ওটেকসই উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন যোগাযোগ খুবই কার্যকরী একটি উপায়। কেবল প্রচলিত আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া মাধ্যমগুলোই নয়, নানা আনুষ্ঠানিক লোকজ ও অন্যান্য মাধ্যমের সহায়তায় সৃজনশীল পন্থায় উন্নয়ন যোগাযোগ এখন আরো কার্যকর ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশে ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন যোগাযোগর ভূমিকা বাড়ছে।"[১২]

গ্লোবাল ইনফরমেশন এন্ড ওয়ার্ল্ড কম্যুনিকেশন শীর্ষক আলোচনায় একজন সমাজ বিজ্ঞানী আজকের জটিল জীবন কাঠামোর একটি ছক এঁকেছেন। ছকের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তথ্য এবং যোগাযোগ। তার চারিদিকে রয়েছে সমাজ, রাজনীতি, শিল্প অর্থনীতি। আর এসব কিছুকে ঘিরে সাংস্কৃতিক প্রতিবেশের বৃত্ত।"[১৩]

---

১২ শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী উন্নয়নে জেন্ডার সংবেদন শীল এবং কার্যকর যোগাযোগ উপকরণ , উন্নয়ন পদক্ষেপ, মার্চ-২০০৭ পৃ: ৯৬
১৩ আবুল আসাদ, তথ্য সাম্রাজ্য এবং উন্নয়ন শীল বিশ্ব, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, জানুয়ারী-১৭ , ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ আজকের আধুনিক সমাজ কাঠামোর কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে তথ্যও যোগাযোগ। অন্যভাবে বলা যায় তথ্য এবং যোগাযোগ মাধ্যম আজ আধুনিক মানুষের গোটা জীবন পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে ষাটের দশকে বুঝাত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি বা জাতীয় আয় বৃদ্ধিকে। কোন দেশে ভৌত অবকাঠামোর উন্নতি, শিল্প কারখানার সাম্প্রসারণ ঘটলেই উন্নয়ন ঘটেছে এমনটি ধরে নেওয়া হতো। নব্বইয়ের দশকে এসে উন্নয়নের এ ধারনার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন মানব উন্নয়নের ধারণা গুরুত্ব পাচ্ছে। "মানব উন্নয়নের দুটো প্রধান দিক হলো মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং মানুষের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ মানব উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের দ্বারা উন্নয়ন, মানুষের জন্য উন্নয়ন। এক্ষেত্রে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে মানুষ। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই তিনটি উপাদান মানব উন্নয়ন সূচক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।"[১৪]

যেহেতু মানব উন্নয়নে গণমাধ্যম প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে সেহেতু গণমাধ্যম বিষয়ক নীতি নির্ধারিকগণ যাতে উন্নয়নে গণমাধ্যমকে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারেন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে যারা কাজ করেছেন এ বিষয়ে তাঁদের যথার্থ ভূমিকা গ্রহন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আরও গবেষণা ও চিন্তাভাবনার প্রয়োজন।

আধুনিক বিশ্বে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তথ্যের গুরুত্ব পরিমাপ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে তথ্যই শক্তি। মার্ক পোরেট, ডঃ মেহেরু জুসওয়ালা তথ্যকে উৎপাদনের একটি উপাদান বলে স্বীকার করেছেন। মার্ক পোরেট তথ্য প্রবাহ জোরদার করার কথা বলেছেন বিন্দু থেকে বিন্দু মাধ্যমের সাহায্য। তাঁর মতে তথ্য প্রবাহ বৃদ্ধি করে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় খরচ কমানো যায়। মেহেরু জুসাওয়ালা সে সূত্রে তথ্য প্রবাহকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নিয়ে গিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন তথ্য প্রবাহের গুরুত্ব কতো অপরিসীম।"[১৫]

[১৪] Human Development Report 1993, UNDP, New york, Oxford University Press, 1993, P. 10

[১৫] মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার, উন্নয়ন যোগাযোগ গবেষণা , বাংলাদেশ প্রসংগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা, ঊনবিংশ সংখ্যা জুন১৯৮৪ পৃ: ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ তথা বাংলা দেশে বিভিন্ন সংগঠন/ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নয়ন ও সামাজিক যোগাযোগের এই ধারাটি পরিচালিত হচ্ছে। নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাস করে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার ও নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের মিডিয়া ও গণমাধ্যমের বহুল ব্যবহার আমরা এখন দেখছি। বিশেষ মিডিয়ায় বিশেষ শ্রেণীর লক্ষিত জনগোষ্ঠী অর্থাৎ টার্গেট অডিয়েন্সকে লক্ষ্য করে যোগাযোগ উপকারণ তৈরী করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের অজিয়েন্সের ধরন বুঝে তাদের উপযোগী করে এই উপকরণগুলো নিশ্চিত হয়।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তথা রেডিও টিভি চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমের কথা চিন্তা করে উন্নয়ন যোগাযোগের ধারণটির উদ্ভব হয়েছিলো। ইদানিং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কম্পিউটার, ইন্টারেনেট ইত্যাদি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের দ্বারা সার্থক যোগাযোগ বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অতীত থেকেই কিছু ইতিবাচক উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন জনস্বার্থে প্রচারিত বিভিন্ন টিভি, স্পট, বিজ্ঞাপন, জিঙ্গেল, নাটিকা জীবন্তিকা, কার্টুনসহ বিভিন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এর পাশাপাশি প্রিন্ট মিডিয়া যেমন সংবাদ পত্র, জানাল বুলেটিন, সহজ ভাষায় লেখা নানা ধরণের বই, সচিত্র পুস্তিকা, ফোল্ডার, পোস্টার, কার্ড, লিফলেট, স্টিকার, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে শিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিতদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজে এমনকি এখন বাস, সি এসজি অটোরিকশা, বা রিকশার গায়ে কিংবা বিলবোর্ডে সাল্যাইন, এইডস, ধুমপান ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনামূলক স্লেগান দেখা যাচ্ছে। জীবন্ত বা লাইভ মিডিয়া যেমন পথ নাটক, গান, যাত্রা পালাও যুক্ত হচেছ এ কাজে। এ ছাড়াও দেশের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন লোক-সংস্কৃতির উপাদান গুলো ও যেমন পটচিত্র , গম্ভীরা, পুতুল, নাচ, জারি-সারি বাউল গান, কবি গান ইত্যাদি উন্নয়ন যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর বলে বিবেচিত হচ্ছে। এসব জনপ্রিয় লোকজ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সাধারণ দর্শক শ্রোতার কাছে উন্নয়ন বার্তা সহজেই পৌছে দেয়া যায়।”[১৬]

---

[১৬] শামীম আখতার ৮মার্চ নারী দিবসের ভাবনা, উন্নয়ন পদক্ষেপ এয়োদশ বর্ষ , দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চ ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের উদ্দেশ্য হলো কোন মাধ্যম বা উপকরণের সাহায্যে তথ্যের আদান প্রদান, নতুন পুরাতন বিষয়, ধারণা তথা জ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তা সবার কাছে যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কর্মসূচিতে মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এই উপকরণগুলো উন্নয়ন যোগাযোগের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর মাধ্যমে সফল ও কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত হয়। টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানবাধিকার, প্রতিষ্ঠা, সুশাসন, শিশু অধিকার নারীর মানবাধিকার ক্ষমতায়ন ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।[১৭]

গণমাধ্যমের কল্যাণে মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে তাৎক্ষনিক ভাবে অবগত হচ্ছে। গণমাধ্যমের কল্যানে গোটা বিশ্ব 'গ্লোবাল ভিলেজ' এ পরিনত হয়েছে। মানুষ ঘরে বসে কম্পিউটারের বোতাম টিপে বিশ্বের যে কোন প্রান্তের মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেন হচ্ছে ঘরের মধ্যে অথবা অফিসের টেবিলে বসে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পন্য ক্রয় বিক্রয় অর্ডার গ্রহণ সর্বোপরি উৎপাদন পুনরুৎপাদন হচেছ। সমগ্র বিশ্ব এখন গণমাধ্যমের কল্যানে ধনতন্ত্রের বাজারে রূপান্তরিত হচ্ছে। এর ফলে কল্যাণ অকল্যাণ দু'টি দিকই বিশ্ব বাজারে কার্যকর হয়েছে।

ধনতান্ত্রিক উন্নত দেশ গুলি নিজেদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাত করণের জন্য গণমাধ্যমকে ব্যবহার করছে। বহুজাতিক কোম্পানী গুলি প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপন এর মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে নিজেদের পণ্যক্রয়ে উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদের মনের উপরে বৈদিশিক সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে। তাদের মানস জগতে নানা রকম 'ইমেজ' তৈরী ও বিভিন্ন রকম ইমেজ বর্জনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। এতে তৃতীয় বিশ্বের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলি তাদের বাজারে পরিনত হচ্ছে তারা দু'হাতে মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে সাথে সাথে ফেলে যাচ্ছে তাদের সমাজ সংস্কৃতির ছাপ। গণমাধ্যমের কল্যাণে মানুষ প্রতিযোগিতা মূলক বাজার অর্থনীতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য নিজেকে শিক্ষিত করে তুলছে, তথ্য প্রযুক্তির সাথে

---

[১৭] শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালিত হচ্ছে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুরূপ শিক্ষাদানে উৎসাহিত করছে। এতে সমাজ প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে উঠছে। সমাজের মধ্য থেকে বিরাজমান কুসংস্কার গুলি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। পাশাপাশি মানুষের আনবিক মূল্যাবোধকেও ও এখন বাজারভিত্তিক মুনাফার আওতায় আনা হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ মূল্যাবোধের অবক্ষয় মাদকাশক্তি, পর্নোগ্রাফির ব্যাপক বিস্তার বিজ্ঞাপনে নারীর অবমানার উপস্থিতি, যুব সমাজের মধ্যে হতাশা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধের অভাব এ বিষয়গুলি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং ধনী আরও ধনী হচ্ছে গরীব আরও গরীব হচ্ছে। দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না তৃতীয় বিশ্বের নিম্নবিত্ত জনসাধারন এখন সময় এসেছে এসব কার্যকর সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও গবেষনার মাধ্যমে গণমাধ্যকে জীবনমুখী, গনমুখী, ও মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার সঠিক পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণের।

৫.১.২ নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমঃ

মিডিয়া নিসর্গের অন্তর্গতঃ খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, টেলিভিশন, ফিল্ম, তথ্যউপাদন এবং বিস্তৃতিরকণের ইলেট্রনিক সক্ষমতা। দুনিয়াজোড়া বিভিন্ন প্রাইভেট এবং পাবলিক প্রতিষ্ঠান এই ইলেকট্রনিক সক্ষমতার ওপর অধিকার এবং কর্তৃত্ব বিস্তার করে আছে। এসব মিডিয়া থেকে তৈরী হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন ইমেজ।

এসব ইমেজে অন্তরিত বিভিন্ন ঝোঁক ডকুমেন্টারী কিংবা বিনোদন হার্ডওয়ার (ইলেকট্রনিক কিংবা ত্রি-ইলেকট্রনিক); স্রোতা (স্থানিক, জাতিক কিংবা জাতিক অতিক্রমী)এবং সর্বশেষে তাদের স্বার্থ, যারা এসব মিডিয়ার মালিক এবং নিয়ন্ত্রক।[১৮]

উন্নয়নের অন্যতম প্রাপ্তি আধুনিকতা আর এ আধুনিকতার কল্যাণে মানব সমাজ গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে বিভিন্নভাবে। ভাবনার নিসর্গ ও ইমেজ নির্মাতা এবং ইমেজ উদ্ভাবক; কিন্তু ভাবনার নিসর্গ প্রধানত রাজনৈতিক প্রায়শই রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এবং প্রতি মতাদর্শ নিয়ে ব্যপৃত;[১৯] জেন্ডার সংবেদনশীলতা ইদানিং উন্নয়ন যোগাযোগ তথা উন্নয়ন উপকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে যুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় মূলত দুটি।

---

[১৮] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতার অভিজ্ঞতা, পৃঃ ৪৭

[১৯] ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর- প্রাগুক্ত।

নারী উন্নয়নে গণমাধ্যম

এক উপকরণ গুলো আদৌ লক্ষিত জনগোষ্ঠী (টার্গেট অডিয়েন্স) অর্থাৎ শ্রোতা দর্শক পাঠকের মনে কোণো প্রভাব ফেলতে পারছে কিনা এবং পারলে তা ইতিবাচক না নেতিবাচক, দুইঃ উপকরণগুলো নারী পুরুষের প্রতি কতটা সংবেদনশীল অর্থাৎ তা নারী পুরুষের প্রতি বৈষম্যমূলক কি-না। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশ যেখানে মানসম্মত শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ লোকই অসচেতন, সেখানে নারীর মানবাধিকার বা জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই বাস্তবতাটি আরও প্রকট। একথা প্রায় নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত যে কার্যকর ও জেন্ডার সংবেদনশীল যোগাযোগ উপকরণ ছাড়া একটি বৈষম্যমুক্ত, নারী নির্যাতন মুক্ত, সুশাসিত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কেবল দীর্ঘয়িতই হবে। [২০]

গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসার ও প্রচারের ফলে ইদানিং মানুষ নারী উন্নয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে। মেয়েদের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণের কারণে সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের টার্গেট পূরণে বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। এ ছাড়া নারীর অবদানে স্বাস্থ্যখাতে, বিশেষ করে নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে এতোকিছু উন্নয়ন পারিবারিক কাজের ৮০% সম্পাদন করলেও নারীর অবদান কখনোই যথাযথ ভাবে পরিমাপ করা হয় না। সামাজিকীকরণের এই প্ররণতা গণমাধ্যমকেও আবিষ্ট করে রেখেছে। আর অন্য কথায় বলতে গেলে গণমাধ্যমের প্রচার প্রচারনার ধরণ পুরুষতান্ত্রিকতাকে প্রতিনিয়ত প্রতিনিধিত্ব করছে যা নারী উন্নয়নে সহায়তা না করে অনেক সময় নারীর অবমূল্যায়নে নিয়োজিত। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে নারী অগ্রগতির যে ধারাটি একুশ শতকে এসে ঠেকেছে তাকে গতিশীলতা দান করেছিল গণমাধ্যমই বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়া সংবাদপত্র, বিভিন্ন সাময়িকী, পুস্তক পুস্তিকা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রগতিশীল লেখক সাহিত্যিক তথা সমাজ সংস্কারকবৃন্দ জন সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নারীর প্রতি সামাজিক অবিচার ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, মানুষ বেড়িয়ে এসেছে কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে। সমাজ নারীশিক্ষার

---

[২০] শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছে। সামাজিক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে তাই সরকারী বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পর্যায়ে নারী শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এক্ষেত্রে আজ যুক্ত হয়েছে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সমূহ। মিডিয়াগুলি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম গল্প, নাটক, সিনেমা, নাচ, গান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান গণসচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারীর অধিকার রক্ষার ব্যাপারে নারী পুরুষের মধ্যে একটা চেতনার ইমেজ ছড়িয়ে দিচেছ। বিভিন্ন রকম নারীসংগঠন জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তথা জাতিসংঘ এব্যাপারে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। তারা গণমাধ্যমের সহায়তায় তাদের কর্মসূচী বাস্তাবায়নের পক্ষে জনসচেতনতা সৃষ্টি করছে। সমাজে আজ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরী হয়েছে, জীবনমান উন্নয়নের ধারনা জাগ্রত হয়েছে, জীবন বোধ তৈরী হয়েছে। এককালের নারী অসূর্যস্পনা আজ তার অধিকার রক্ষায় পথে নেমে এসেছে, আন্দোলন করছে, উচ্চশিক্ষিত হয়ে সমাজের সকল স্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে।

তবে উন্নয়নের এই পর্যায়ে এসে পৌছতে নারীকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। একজন কানাডীয় মহিলা কবির কথার বলা যায় সমানরূপে বিবেচিত হবার জন্য নারীকে অবশ্যই পুরুষের চাইতে দ্বিগুন ভাল হতে হবে। (In order to be considered equal/ women must be twice as good as men). তারপরই সেই আশাবাদী উচ্চারণ সৌভাগ্যেক্রমে এটি মোটেও কঠিন নয় (fortunately it is not difficult). যথা সম্ভব নারী ও চলচ্চিত্র নামক কোন একটি লেখনিতে পড়েছিলাম। তবে কথাটি মিথ্যে নয়। নারীকে তার যোগ্যতা প্রমাণে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, আর পুরুষের বেলায় হয় ঠিক তার উল্টোটি। অর্থাৎ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলস হিসেবে এটা ধরেই নেয়া হয় বে পুরুষ স্বাভাবিক ভাবেই সর্বদা যোগ্যতর আর নারী অযোগ্য। আর এই অপরাদের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করতেই নারীকে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী মূল্যদিতে হয়। মিডিয়া গুলিও পুরুষ তান্ত্রিকতার প্রতিনিধিত্ব করে আসছে প্রতিনিয়ত। তাই যদিও নারীর আজকের এই অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে মিডিয়া আবার নারীর অবমূল্যায়নও করছে মিডিয়া। তবে যেহেতু মিডিয়া ছাড়া উন্নয়ন কল্পনা করা যায় না তাই আমার গবেষাণার কেন্দ্র বিন্দু 'নারী উন্নয়ন'কে মিডিয়া কিভাবে প্রভাবিত করে তার একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীতা রয়েছে। সমাজিকীকরণ ও সমাজের দিক নির্দেশনায় গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী ভূমিকা আজ সকলের কাছে স্বীকৃত। গণমাধ্যম গণমানুষের কথা বলার চেষ্টা করে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চাওয়া পাওয়া বঞ্চনা ও অধিকারের কথা তুলে ধরে গণমাধ্যম। নীতিনির্ধারণী স্তরের ক্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করা থেকে শুরুকরে কোথায় কোন স্তরে অনিয়ম দুর্নীতি ঘটছে তার প্রতিফলন ঘটে গণমাধ্যমে। বহুবার এমন ঘটেছে যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত সংবাদের ফলে প্রশাসনের টনক নড়েছে।"[২১]

নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা /সুরক্ষার জন্য যে সব নীতিমালা ইতোমধ্যেই তৈরী হয়েছে। সে সব নীতিমালা (Public Policies) সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে এবং নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোকে আরো দায়িত্বশীল করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের বতমান প্রেক্ষিতের বিবেচনায় নারী উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সব বিষয়মূহকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন:

১। নারীর মানবাধিকার

২। কর্মক্ষেত্রে সম-সুযোগ

৩। শিক্ষায় সম-সুযোগ

৪। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সম অধিকার

৫। সম্পর্কে সম অধিকার

৬। নারীর রাজনৈতিক অধিকার

মাতৃত্ব সহ নারীর পুন: উৎপাদনমূলক ভূমিকাকে সামাজিক ও কাজ হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়টি পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে সরকারী কোনো উদ্যোগ এখানো পরিলক্ষিত হয়নি। এখানো গনমাধ্যমে নারীর সনাতনী ভূমিকা চিত্রিত করা হয়। বাণিজ্যিক সিনেমা ও বিজ্ঞাপনে এখনো নারীকে ভোগ্যপন্য বা যৌন সামগ্রীরূপে দেখানো হয়। সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পুরুষের অভিন্ন ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব ২০০৫ সালে প্রকাশিত বিশ্ব সংবাদ পরিবীক্ষণ ফলাফলের বাংলাদেশ রিপোর্ট অনুযায়ী গণমাধ্যমে সকল পেশার ক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিতি পুরুষের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের কম এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তা এক

---

[২১] শান্তা মারিয়া, আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য, জেন্ডার ইনমিডিয়া, বুলেটিন-৮, আগষ্ট-অক্টোবর-২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

দশ মাংশ হলেও বিনোদন ক্ষেত্রে নারীকে পেশাজীবি হিসেবে দেখানোর প্রবনতা অনেক বেশি এবং সে ক্ষেত্রে পুরুষের অবস্থান নারী তুলনায় প্রায় শূন্যের কোঠায়। কিন্তু নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যূ। এছাড়া একই রিপোর্ট অনুযায়ী ২২ শতাংশ সংবাদের ক্ষেত্রে যেখানে নারীর ছবি ছাপা হয়েছে, সেখানে পুরুষের ছবি ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। যেখানে সংবাদের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেপুরুষের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশি।

বর্তমানে টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের সরকার দারিদ্র বিমোচন ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারিন করেছে এবং তার জন্য নারীর সমঅধিকারকে নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে এবং তিনটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সকল ক্ষেত্রে নারীদের পুরোপুরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারীও পুরুষ উভয়কে সম্পদ হিসেবে তৈরি করার জন্য দক্ষতা বাড়ানো এবং টেকসই উন্নয়ন। শুধু সরকার এবং এনজিওদের দ্বারা টেকসই উন্নয়ন গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার এবং নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই গোটা সমাজ তথা সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন গণমাধ্যমের আরো জোরালো ভূমিকা ।

১। গণমাধ্যম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্যগুলোকে তুলে ধরতে পারে।

২। যে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখছে সেগুলো সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে পারে।

৩। বৈষম্যমূলক কাঠামোকে পরিবর্তন করার জন্য যে সকল নীতিমালা আছে সেগুলো গনমাধ্যমে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে সাধারন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া (কারণ অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ বৈষম্যের বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হলেও বৈষম্য দূর করতে যে সকল নীতিমালা আছে। সেগুলো সম্পর্কে জানে না)।

৪। নারী পুরুষের সমতার লক্ষ্যে নীতিমালা এবং উদ্যোগ থাকলেও এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতা আছে। গণমাধ্যম এই সকল নীতিমালা বাস্তাবায়নে জনগনের মতামতকে নীতি-নির্ধারকদের জন্য তুলে ধরতে পারে।

৫। নীতিমালা বাস্তাবায়নের জন্য যেসকল উদ্যোগ আছে এবং উদ্যোগগুলোর ফলে সমাজে যে ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে সেগুলো তুলে ধরা বিশেষ ভাবে পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের ভূমিকা এবং উদোগগুলো তুলে ধরা।"[২২]

সুতরাং বলা যায় যে, গণমাধ্যমের জেন্ডার সংবেদশীল প্রচার প্রচারনাই পারে একটি নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে, নারীর ইতিবাচক উপস্থাপন ও ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে। পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলোতে নারীর উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ অধ্যায়ের শুরুতে গণমাধ্যমের বিকাশ, উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং গণমাধ্যমের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে গবেষণার স্বার্থে নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং এর একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা তুলে ধরা হল। পরবর্তী পর্যায়ে গণমাধ্যমের বর্তমান ভূমিকা বিশ্লেষণ দেখানোর প্রয়াস রয়েছে।

৫.১.৩ নারী উন্নয়নে গণমাধ্যম : ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

অপ্রকাশ্য ও নারীর চিন্তা এবং বিবেক কোন অর্থ বহন করে না চিন্তা ও বিবেকের প্রকাশ ঘটাতে হয় গণমাধ্যম এর হাত ধরে। গণমাধ্যমের আদি বাহন লিখিত রূপের প্রকাশ প্রকরণ, তালপাতা পুঁথির যুগ পেরিয়ে যখন কাগজ আবিস্কার হয় তখন চিন্তা প্রকাশের পালে নতুন হাওয়া লাগে। এরপর মুদ্রন যন্ত্রের আবিস্কারে চিন্তাপ্রকাশে আসে নতুন যুগ। অধিক মানুষকে স্বীয় চিন্তা ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্য, অসঙ্গতি প্রকাশ করে প্রতিকার প্রার্থনার জন্যে এবং বিনোদন ভাবনায় সঙ্গী সংগ্রহে মানুষ সংবাদ পত্র নামক এক বিনোদন ভাবনায় সঙ্গী সংগ্রহে মানুষ সংবাদ পত্র নামক এক প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তাকে আবিস্কার করে। আবিস্কার করে চিন্তা ও মত প্রকাশের এক অনিবার্য উপায়। [২৩]

বিবেকবানের এ আবিস্কার অচিরেই স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে নিস্পেষণের বিরুদ্ধে অমানবিকাতার বিরুদ্ধে, আনিয়ম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে দেখা দেয়। রাষ্ট্রযন্ত্র, ক্ষমতাসীন পক্ষ, প্রভাবশালী মহল নানা নিয়ম কানুন আইনের বাঁধনে বাঁধতে চায় সংবাদপত্রের অগ্রযাত্রাকে কিন্তু মুক্ত বিবেক আর আর মুক্তচিন্তার মুক্তিকে দমানো সম্ভব হয়নি। বাধাপ্রাপ্ত

[২২] নাজনীন শিক্ষা, জেন্ডার অধিকার ও গনমাধ্যম প্রতিবেদন- সেমিনার জেন্ডার ইন মিডিয়া ফোরাম,
[২৩] আহমেদ ফারুক হাসান / বাংলাদেশের গণমাধ্যম

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে অভিজ্ঞতা ও শক্তি সঞ্চয় করে সংবাদপত্র আজকের জায়গায় এসেছে। নিষেধাজ্ঞা, নির্যাতন আর নিস্পেষনের পথ পরিক্রমায় সংবাদপত্র বর্তমানে এক শক্তিশালী গণমাধ্যম। এর সাথে সাথে এসে জুটেছে বেতার এবং টেলিভিশন। এখন চিন্তা ও বিবেকের প্রকাশবাহনের সীমানা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। স্কাই ইউ দি ওনলি লিমিট।" [২৪]

বর্তমানে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট যোগাযোগের ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে এক অভাবনীয় সাফল্য। মানুষের মুখ এক সময় গণমাধ্যমের কাজ করতো, একজনের কাছ থেকে অন্য জন এবং অন্য জনের কাছ থেকে আরেক জন এভাবে অনেকের কাছে পৌঁছে যেত সংবাদ। চারিদিকে গুজব চাউর হতো। ছড়াতো রটনার কথা। তিল থেকে তাল, এভাবে জ্যামিতিক হারে ডাল পালা বিস্তার করে অনেক সময় মূল ঘটনাকে আড়াল করে অন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করতো আর এ রটনা যদি হতো নারীর ক্ষেত্রে তাহলে তো কথাই নেই। 'বিশেষ করে নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন ঘটনা বাতাসের বেগে ছুটে যেতো মানুষের মুখে মুখে। জন্ম মৃত্যুর খবর পেত মানুষ। এমন কি অন্দর মহলে নারীদের আবদ্ধ করার পর ও বাইরে থেকে নানা অজুহাতে ভেতরে গমনকারী নারীরা অন্দর মহলে ঢুকে সংবাদ পাচারের কাজ করতো।

এভাবে সমাজ জীবনে নানা কিছু জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্রোতে টিকে গেছে। মুখে মুখে প্রচলিত থেকে একদিন ছাপার হরফে জায়গা পেয়েছে। জেন্ডার অর্থ নারী পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক তৈরিতে মানুষের মুখ নামক গণমাধ্যম একসময় বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁ ধাঁ ছড়া ইত্যাদি মানুষের অভিজ্ঞাতার আলোকে রচিত হতে হতে সমাজ জীবনে স্থায়ী হয়ে গেছে। এসব লোকজ উপাদানের নানা কিছু থেকে দেখা যায় নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কত তীব্রভাবে বিদ্বেষপূর্ণ ছিল।"[২৫]

নারী উন্নয়নর বা নারী কেন্দ্রিক আন্দোলনে গণমাধ্যম হিসেবে সাহিত্যের প্রতিফলন বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। কারণ বিভিন্ন লোক গাথা, উপকথা, গল্প প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, সাহিত্য, ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর মূল্যায়নের মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে আজকের নারী সমাজ যে সবদিক

---

[২৪] আহমেদ ফারুক হাসান প্রাগুক্ত।

[২৫] সেলিনা হোসেন , মানুষের মুখ যখন সংবাদ মাধ্যম ছিল, জেন্ডার ইন মিডিয়া, বুলেটিনি- ৫,১০ সেপ্টেম্বর ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে এগিয়ে চলেছে এর ইতিহাস জানতে হলে বিগত শতকের নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের পুঙ্খনুপুঙ্খ ইতিহাস ও সমকালীন সমাজ মনের পরিচয় জানা একান্ত প্রয়োজন কিন্তু গবেষণাকে এর বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক রাখার প্রয়োজনে অতিসংক্ষেপে নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকার ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রতিফলন তুলে ধরা হল।

ইতিহাস কেন্দ্রিক গবেষণার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা শেষ কথা বলে কিছু নেই। এক্ষেত্রে যেমন ঐতিহাসিক ও প্রচলিত অনেক সিদ্ধান্তকে খন্ডন করা হয়েছে- তেমনি নতুনতর তথ্যের ভিত্তিতে এর কোন কোন সিদ্ধান্ত যে ভবিষ্যতে খন্ডিত হবে না এমন অনড় দাবি ও এক্ষেত্রে আমরা করতে পারি না। যুক্তি তর্কের মাধ্যমেই নতুন তথ্য ও তন্ত্রের আবিস্কার হয়ে আসছে এ কথাটা যে সত্য তা স্বীকার করতেই হবে। আর এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রেখেছে প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ গণমাধ্যম।

নারী উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে বহু পূর্বে। ভারতীয় উপমহাদেশে নারী অধিকার আন্দোলন বা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউরোপের (ষোড়শ শতকের নবজাগরণ এবং অষ্টাদশ শতকের রুশ বিপ্লবের মত কোন ধারাবাহিকতা না থাকলেও ইউরোপের নারী জাগরণের প্রভাব ভারতীয় সমাজেও পড়তে দেখা যায় যার ফলশ্রুতিতে উনবিংশ শতকের শুরুতেই ভারতীয় সমাজে নারী অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বর্তমান সময়ে ও নারী উন্নয়নের পথে, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে ক্রমশ গভীরতর রূপদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোর ওলস্টোন ক্র্যাফট এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বেথুন, স্বামী বিবেকান্দ এবং বেগম রোকেয়ার যুগান্তকারী অবদান প্রানিধান যোগ্য। তাঁরা তাঁদের সমাজ সংস্কারমুলক কার্যক্রমগুলি চালিয়ে নেবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে যে বড় অবলম্বন বেছে নিয়েছিলেন তা হল গণমাধ্যম। তাঁরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বই পুস্তিকার মাধ্যমে নিজেদের মতামত গুলি গোড়া কুসংস্কার আচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজের মধ্যে প্রকাশ ও প্রচার করতে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯১ সালে মোর ওলস্টোন ক্রাফট সমাজে নারীর অধিকার সম্পর্কে সরাসরি জোরালো ভাবে তাঁর Avindication of the Rights of Women রচনা করেন। এগ্রন্থে তিনি নারী যে লৈঙ্গিক রাজনীতির স্বীকার সে প্রসঙ্গ তুলে ধরার সাথে সাথে গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে কিভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পশ্চাৎপদ করে দিচ্ছে, তাও সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং সমাজ ব্যবহার সার্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করেছেন। তাঁকে সেই নারীদের জননী বলা হয়। তাঁর এ অবদান বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে প্রিন্টমিডিয়া।

ভারতবর্ষে অষ্টাদেশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হলেন রাজা রামমোহন রায় দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আর্বির্ভূত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয় ইউরোপ থেকে এলেন আলেকজান্ডার ডাফ্ এলেন মেরি কার্পেন্টার, আর্বিভূত হলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় রামতনু লাহিড়ী, মধুসূদন দত্ত, রাধানাথ শিকদার, শিবনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ন বসু, কেশবচন্দ্র সেন , শিবনাথ শাস্ত্রী, উদার হৃদয় বেথুন প্রমুখ সংস্কারক। এঁরা সকলেই সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ক্ষেত্রে আত্মবিকশিত নারীর ভূমিকার অসামান্য গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এঁদের চেষ্টায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলাদেশে বইতে লাগল নারী কেন্দ্রিক নানা সামাজিক আন্দোলনের ঢেউ যথাঃ-

১। সতীদাহ নিবারণ

২। স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলন

৩। বিধবা বিবাহ আন্দোলন

৪। বহুবিবাহ আন্দোলন

৫। বাল্য বিবাহ আন্দোলন।

নারী কেন্দ্রিক এই মুখ্য আন্দোলন গুলির পাশাপাশি আরও কয়েকটি গৌন আন্দোলন উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা ঃ-

১। পৈতৃক সম্পতিতে নারীর অধিকার দাবির আন্দোলন,

২। পন প্রথার বিলোপ আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

৩। পর্দা প্রথার বিলোপ আন্দোল।"[২৬]

বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারক, চিন্তাবিদ, লেখক সাহিত্যিকগন তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের পক্ষে জনমত গড়ে তুলেছেন। রাজা রাম মোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম , বেগম সুফিয়া কামাল প্রমূখ সমাজ সংস্কারক , লেখক, কবি সাহিত্যিক তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে কলম নিয়ে রুদ্র কাঠোর ধর্মান্ধও কুসংস্কার আচ্ছন্ন সমাজ ব্যস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন; এবং এ যুদ্ধে তাঁরা জয়লাভ ও করেছেন। প্রতিনিয়ত তাই উন্নয়নের পক্ষের শক্তি গণমাধ্যমের জয় হয়েছে যুগে যুগে। বর্তমান অগ্রসরমান সমাজে নারীবাদীরা এগিয়ে এসেছেন। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নারীর অংশগ্রহণ অন্তর্ভূক্তি এবং কাজের স্বীকৃতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তথা নতুন নতুন মতবাদ।

বাঙ্গালি মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন খ্রিষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় ১৮১৪ তে চুটুরায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বাঙ্গালি মেয়েদের খ্রিষ্টানকরার উদ্দেশ্যে এটি ছড়াও ১৮১৭ প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি বা স্কুল সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান ও এ দেশীয়দের উদ্যোগে ১৮৪৭ সালে বারাসাতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ১৮৪৯ সালে বেলুনের উদ্যোগে দক্ষিণারঞ্জন বৈঠক খানা বাড়িতে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা সবই ছিল প্রচন্ড সাহসী উদ্যোগ। মদন মোহন তর্কালঙ্কার সর্বাগ্রে বেথুনের এই স্কুলে তাঁর কন্যাকে ভর্তি করে দেন, বিনা বেতনে বেশ কিছুদিন পড়ান এবং স্ত্রী পুরুষের একই শিক্ষা সমর্থন করে ১৭৭২ এ ভাদ্র সংখ্যায় সর্বশুভঙ্করী পত্রিকায় স্ত্রী শিক্ষা নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখন।

"সংবাদ প্রভাকর" সম্বাদ ভাস্কর, সমাচার দর্পন, সংবাদ রসরাজ; সংবাদ পূর্নচন্দ্রোদয়, এবং অধিকাংশ ইংরেজি পত্রিকা বেথুনের এ প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে কলম ধরে তবে বাংলা পত্রিকাগুলোর মধ্যে অধিকাংশই এর বিরোধিতা করে। পত্রিকান্তরে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে বিপক্ষে লেখা-লেখি বাদ প্রতিবাদ চলতে থাকে। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে দ্বারক নাথ রায় সুলভ

---

[২৬] রনজিৎ বন্দোপাধ্যায় উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৮৫০-১৯০০)

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকায় লেখেন "এ প্রশ্নে আমরা হাস্য সম্বরন করিতে পারি না। কারণ বিদ্যার কি মারাত্মক শক্তি আছে? বিদ্যা কি নরভোজী ব্যাঘ্র? যদি ও বিদ্যার মারাত্মক শক্তি থাকে তবে যে ব্যক্তি বিদ্যাবান হয়, বিদ্যা তাহাকেই সংহার করিতে পারে। কিন্তু পত্নী পন্ডিত হইলে যে পতির জানবিয়োগ হয় এ কথা অতি চমৎকার।"[২৭]

বেথুনের প্রয়াস হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ সমর্থন করেননি। আর নারীর বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে সমর্থনের জন্যও নানা রকম প্রবন্ধ পুস্তক পুস্তিকা লেখার কারণে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁদের উপর প্রচন্ড ক্ষুদ্ধ হয়। মদন মোহন তর্কালঙ্কার তাঁর মেয়েদের স্কুলে দেওয়ায় ও নিজে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ায় ব্রাহ্মন পন্ডিতরা তো ক্ষেপেই আগুন কোথাও পন্ডিতে পন্ডিতে দেখা হলেই কথা হয় ওরে মদনা করলে কি? ৮/৯ বছর তাঁকে সমাজচ্যুত থাকতে হয় ও আজীবন সামাজিক উপদ্রব সহ্য করতে হয়।"[২৮]

বেথুনের মহতি উদ্যোগ ও বিদ্যানুরাগী পত্রিকা গুলির ব্যাপক প্রচার প্রচারনার ফলে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে একটির পর একটি করে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। ঘোর সামাজিক বিরোধীতার মধ্যে দিয়ে কলম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিক গণ নারীশিক্ষার প্রসার ঘটাতে থাকেন। স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনের পক্ষে ব্রাহ্মদের সমর্থন এ সমাজের নারীদের মধ্যে আত্মউপলব্ধির বীজ বপনে সহায়তা করে। যদিও শিক্ষার রীতিপদ্ধতি বিষয়ে এঁরা একমত হতে পারেননি। একদল অত্যুৎ সাহী যুবক স্ত্রী ও পুরুষকে একই ধরণের শিক্ষা দিতে আগ্রহী। অপর একদল স্ত্রী পুরুষ উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থকের কথা চিন্তা করে শিক্ষার ক্ষেত্রে ও কিছু বৈষম্য রাখার পক্ষপাতিত্ব করলেন। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিরোধের সূত্রপাত হল। তবে এ বিরোধের ফল ভালই হল। সমাজের প্রবীণ নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) স্ত্রী পুরুষের শিক্ষার পক্ষে তাঁদের কর্ম প্রয়াস চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন। দেবেদ্রনাথ ঠাকুরের মহান প্রয়াসের সমর্থনে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের কথা ও লিখেছেন স্বর্নকুমারী দেবী 'পৃথিবী' (১৯৮৫) নামক বৈজ্ঞানিক পুস্তকে। নারীদের সাহিত্যচর্চা পছন্দ করতেন বলেই পুত্রবধু জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও

[২৭] সুলভ পত্রিকা (১-২ সংখ্যা), ১২৬১
[২৮] 'কবির মদন মোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্গ্রন্থ সমালোচনা ;' সং১৯২৮, পৃঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

কন্যা স্বর্নকুমারীর পক্ষে পত্রিকা পরিচালনা সম্ভব হয়েছিল হিরন্ময়ী দেবী, সরলাদেবী ও ইন্দিরা দেবী তাঁর জীবিতকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের প্রায় প্রথম সারিতেই আপনাদের স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। তিনি অন্তপুর শিক্ষার ও পক্ষপাতী ছিলেন, কন্যা স্বর্নকুমারী দেবী আমাদের গৃহে অন্তপুর শিক্ষা ও তার সংস্কার"[২৯] প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন।

এভাবে বিজ্ঞানের প্রয়াসে ভারত বর্ষে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় নারীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি, স্কুল গুলিতে সরকারী অনুদান মঞ্জুর। নারীর বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পরিচালনা , নারীদের সাহিত্য, বিজ্ঞান অঙ্ক, সেলাই বন্ধন ইত্যাদি সর্বপ্রকার শিক্ষার প্রতি ধীরে ধীরে সমাজের একটি অংশ সচেতন হয়ে ওঠে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-৯৮) শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের পার্থক্য থাকবে না। বিশ্বাসী হয়ে জনমত গড়ার চেষ্টায় লিপ্ত হন। নারীদের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, "নারীগণ চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষা না করিলে নারী জাতি সূলভ নানা প্রকার কঠিন পীড়ার সুচিকিৎসা হইতে পারে না এবং নারী জাতির স্বাধীন জীবিকা অর্জনের পথ উন্মুক্ত হইবে না। ১৮৭৩ এ বেনিয়া পুকুর লেনে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি তাঁর এ বিষয়ক চিন্তাধারার বাস্তব রূপ দেন।"[৩০]

স্ত্রী শিক্ষার আধুনিক অগ্রগতিতে রক্ষণশীল হিন্দুরাক্ষুব্ধ হলেন, 'বেদব্যাস,' জন্মভূমি অনুসন্ধান,' ধর্মপ্রচারক ইত্যাদি অধিকাংশ বাংলা পত্রিকা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। স্ত্রী পুরুষের একই ধরণের শিক্ষা দিলে নারী সমাজের যে চরম অবনতি ঘটবে, তার কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করে এবং পত্রিকায় তা প্রকাশ করে প্রগতির নামে নৈতিক অধঃ পতনের হাত থেকে নারী সমাজকে রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব পালনে উঠে পড়ে লাগলেন।

নারী কল্যানে নিয়োজিত 'তত্ত্ববোধিনী' ও এদের দলে ভিড়ে যায় এবং জোর গলায় বলে, "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন ক্রমেই উন্নতির ও শুভফলপ্রদ নহে। স্ত্রী ও পুরুষজাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য দুইয়ের পক্ষে একপ্রকার শিক্ষার উপযোগিতা

---

[২৯] 'প্রদীপ,' ভাদ্র ১৩০৬।

[৩০] Sir Aldniron Raikumar Banerjee, An Indian Path Finder' The Emancipation of Indian Women ,1971 Pag-82

Dhaka University Institutional Repository

অসম্ভব। বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি.এ. এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষা, হৃদয়প্রধান নহে, অতএব ঐপ্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত নহে।"[৩১]

সকলের গলা ছাড়িয়ে বেদব্যাস"[৩২] স্পষ্ট ভাষায় জানায়, কিন্তু প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষাও নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেননা ইহার দ্বারা পুত্র প্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। বিদুষী নারীগণের বক্ষাদেশ সমতল হইয়া যায় এবং তাঁহাদের স্তনে প্রায়ই স্তনের সঞ্চার হয় না। এতদ্ভিন্ন তাহাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়" স্বামী বিবেকানন্দের কালে ভারতবর্ষে শতকরা ১০-১২ জন মাত্র শিক্ষিত। বোধহয় মেয়েদের মধ্যে শতকরা একজন ও শিক্ষিত) হবে না।

অথচ সাধারণের মধ্যে ও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হওয়ার জো নেই। তিনি ভাবলেন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাই পাবে অগ্রাধিকার। তিনি লিখলেন, গণিতকে এমনভাবে শেখাতে হবে তা যেন মনের শৃঙ্খলার শিক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। নিখুঁত নির্ভুল ভাবে সত্যানুসন্ধানের প্রবণতা আনে। ইতিহাস এমনিভাবে শেখাতে হবে যাতে কার্যের সঙ্গে কারণের জ্ঞান আসে এবং তা অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে শতর্কবানীর মত হয়ে দাঁড়ায়।"[৩৩]

স্বামীজীর স্ত্রীশিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদানে এগিয়ে এলেন ভগিনী নিবেদিতা, তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন, এবং ছাত্রী সংগ্রহ, অর্থযোগান দাতা হিসাবে নিজেকে নিবেদন করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের পেছনে এসব ব্যক্তি গত প্রয়াস ছাড়া ষাটের দশক থেকে জনসাধারণের প্রচেষ্টায় কলকাতা ও এর আশপাশে একাধিক সভাসমিতি গড়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দী ধরে স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে বাঙালি সমাজ চিন্তাভাবনা করেছে, বাদপ্রতিবাদে মুখর হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে অজস্র লেখালেখিও হয়েছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন স্ত্রীশিক্ষা কতখানি এবং

---

[৩১] 'তত্ত্ববোধিনী,' চৈত্র ১৮০২ শক

[৩২] 'বেদব্যাস, বৈশাখ ১২৯৬

[৩৩] দ্রঃ শঙ্করী প্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারত,' ৩য়, খন্ড, পৃঃ ২৮০-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

কতদূর পর্যন্ত বাঙ্গালী সমাজে, গৃহীত হয়েছিল, এক কথায় সমাজ একে গ্রহণ করেনি, সমর্থন করেনি। বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করা নয়ের দশকের শেষে ও সম্ভব হয়নি। ১৯০০-০১ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় শতকরা মাত্র ২টি মেয়ে শিক্ষা লাভ করছে।"[৩৪]

১৯০৬-০৭ খ্রিষ্টাব্দে কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৩, এইচ, ই, স্কুলে ৬৮০,এম ই, স্কুলে ১৭৭৬, এবং এম, ডি, স্কুলে ৬৫৩। কোটি কোটি মেয়ের তুলনায় এ সংখ্যা খুবই নগন্য। এ সংখ্যাও আবার শহরের কতিপয় শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, শহরের সঙ্কীর্ন গতির বাইরে গ্রামবাংলার জনসাধারনের সঙ্গে এর কোন ও যোগ ছিল না। দেশবিভাগের পর জীবিকার তাড়নায় অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ভদ্রহিন্দু ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন অনুভব করে। স্ত্রী শিক্ষার আধুনিক অগ্রগতির এটাই একমাত্র কারণ।

বৃটিশ শাসনকালে এদেশে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ, শিক্ষা-দীক্ষা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের ক্ষতির সম্মুখীন করেছিল, হিন্দুরা যত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলো মুসলমানরা সেভাবে এগোতে পারলো না। সেক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অবস্থা ছিলো আরো শোচনীয়। রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) মত নেতার আবির্ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই হিন্দু সামজের মানুষজনকে আধুনিক জীবনের মূল্যায়ন সম্পর্কে সজাগও সচকিত করে দিয়েছিল। রামমোহন রায় প্রথম জীবনে আরবী ও ফারসী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেন ও বুৎপত্তি লাভ করেন। পরবর্তীতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা এবং ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু সমাজ সংস্করের ক্ষেত্রে তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য ও লেখা ছিল বাংলায় বাংলাদেশের নাবজাগরণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। যে ভাষাকে অবলম্বন করে হিন্দু সমাজের অনেকটাই এগিয়ে যায়। অন্যপক্ষে মুসলমান সমাজের চিত্রটা ছিল ঠিক তার উল্টো। সেখানে ভাষা ছিল মুসলিম সমাজের উঁচু নীচু শ্রেণীর প্রতীক। সম্ভ্রান্ত মুসলিম বংশের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু তা বাঙালী পরিবার হলেও ভাষা গত দুরত্ব এবং সামাজিক রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণে হিন্দু সমাজের এই সংস্কার আন্দোলনে সামিল হতে

[৩৪] N. Natarajan , Hundred Years of Indian social Reform, P.102- 03 Asia Publishing House.

Dhaka University Institutional Repository

তারা মুসলমান সমাজকে আহবান জানায়নি এবং মুসলমান সমাজ ও তাতে যোগদান করেনি। মুসলমানদের এই পশ্চাদপদতা নারীকে সামাজিক ভাবে আরও প্রান্তিকতায় ঠেলে দেয়।

উনবিংশ শতকের সমাজ এবং অনেক গুলো আদর্শ ব্যক্তিত্ব ঐ সময়ের তরুনী বেগম রোকেয়া কে অনেকটা প্রভাবিত করে। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিলোপ, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ ও শিক্ষা আন্দোলন, আব্দুল লতিফের বাঙ্গালী সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার বাঙ্গালীদের মধ্যে মীর মোশারফ হোসেন যিনি চেয়েছেন মাতৃভাষা বাংলার প্রচলন, এদের সবার লেখনি বেগম রোকেয়ার লেখনিকে আরও বেগবান করেছে। তাঁর লেখায় চিন্তায়, মানসিকতায় কর্মে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের আদর্শ সমুজ্জল ছিল। এঁরা "সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, মানসিকতার পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। ধর্মকে আঘাত করেছেন তেমনি একই গুরুত্বের সাথে নারীর সমস্যাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। অবহেলিত নির্যাতিত নারী সমাজের উন্নতির জন্য কলম ধরেছেন সেই সাথে বাস্তবে কাজ করেছেন। নারী সমস্যা নিয়ে এভাবে এর আগে কেউ এগিয়ে আসেনি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর হিন্দু নারী সমাজের অবর্ননীয় দু:খ সতীদাহ এবং বিধবা বিবাহের সমার্থন করতে চেয়েছিলেন। যে সমস্যা মুসলিম নারী সমাজে ছিল না। কিন্তু মুসলিম নারী সমাজেও ছিল অবরোধ প্রথার মত নারীকে নিষ্ক্রিয়, নির্যাতিত করে রাখার মতাদর্শ যেদিকে রোকেয়া সচেতন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। মুসলিম নারী সমাজের বিভিন্ন নির্যাতনের দিকগুলোকে চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খোঁজায় ব্যাপৃত ছিলেন।"[৩৫]

তৎকালীন হিন্দু সমাজের ঘোর বিরোধীতা এবং নারীর বুদ্ধিহীনতা এবং শিক্ষাগ্রহণে অপারগতা সংক্রান্ত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে, মদন মোহন তর্কালিঙ্কার স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে বাকযুদ্ধে অবতীর্ন হয়ে ১৮৫০ সালে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকাতে প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি বলেন, বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যুনাধিক্য স্থাপন করেন নাই অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক।"[৩৬]

---

[৩৫] সুমাইয়া বেগম।

[৩৬] বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, পুণর্মুদ্রন ১৯৯৩, পৃঃ ২২১।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে রোকেয়ার রচনাবলীর মধ্যে এই একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছেন- পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব ...আমাদের কি হাত নাই না পা নাই, না বুদ্ধি নাই ? [৩৭]

তিনি অনবরত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা লেখির মাধ্যমে নারীর উন্নতি পথে যে সব বাঁধা বিপত্তি আছে তা চিহ্নিত করে সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই সাথে সমাধানের পথ ও বলে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রের ও আশ্রয় নিয়েছেন। বিদ্যমানতাকে অবলম্বন করেই বিদ্যমানের অসারতা প্রমাণ করেছেন। এটাই উন্নয়নের একটি বড় পথ মানসিকতার দিক থেকে তিনি ছিলেন সেক্যুলার ব্যক্তিজীবনে নিয়মিত ধর্ম কর্ম করলেও ধর্মান্ধ তিনি ছিলেন না। বরং ধর্মের বিভিন্ন বানীকে ব্যাখ্যা করে নারী সাধারণকে জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন।

রোকেয়া নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন পরিবারে প্রতিবন্ধকতা থেকে আবার সহযোগিতা ও নিয়েছিলেন পরিবার থেকে সমাজ থেকে, ব্যক্তি থেকে, এবং নারীকে তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করেছেন তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে। তিনি নারীর ব্যক্তিত্বকে জাগরিত করার জন্য বলেছেন-

"বুক ধুকিয়া বল মা ! আমরা পশু নই, বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! আমরা জড়াউরা অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্ধুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নেই; সকলে সমস্বরে বল আমরা মানুষ।"[৩৮]

বেগম রোকেয়া সমসাময়িক সমাজের প্রতি রন্ধে রন্ধে নারীর প্রতি অত্যাচার পুরুষের প্রতি সামজে বিদ্যমান পক্ষপাতিত্বমূলক মূল্যবোধ ইত্যাদিকে তীর্যক ভাষা ব্যবহার ও রঙ্গ ব্যঙ্গের মাধ্যমে চাবকাতে চেষ্টা করেছিলেন। বিয়ে পাগলা বুড়ো বলিতে নিরীহ বাঙ্গালী রসনাপূজা, অবরোধ বাসিনীতে তার প্রমাণ জাজ্বল্যমান। উদাহরণ স্বরূপ স্ত্রী লোকেরা ঐ পূজার (রসনা পূজার) আয়োজনে সমস্ত সময় ব্যয় করেন। অন্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে তাহাদের অবসর

[৩৭] রোকেয়া রচনাবলী, স্ত্রী জাতির অবনতি, পৃঃ ২৯-৩০।
[৩৮] রোকেয়া রচনাবলী , সবেহ সাদেক , পৃ: ২৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

থাকে না। সমাস্ত দিন ও অর্ধরাত্রি তো তাঁহাদের রন্ধনের চিন্তায়ই অতিবাহিত হয়, পরে নিদ্রায় স্বপ্ন দেখেন যাঃ! মোরব্বার সিরা (চিনির রস) জ্বলিয়া গেল।"[৩৯]

রোকেয়া নারীর পিছিয়ে পড়া এবং নারীর নির্যাতেনের ক্ষেত্রে যে সব কারণগুলো চিহ্নিত করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাৎপদতা পর্দা ও অবরোধ প্রথা, সমাজে পুরুষের প্রাধান্য, ধর্মীয় অনুশাসন এবং নারীর সচেতনতার অভাব বাঙালী মুসলিম নারীদের চেতনা জাগাতে রোকেয়া নারী শিক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করেছিলেন তা নারী সমাজের উন্নয়নের পথে রেনেসাঁ স্বরূপ। সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কে অসমতা এবং ভারসাম্যহীনতাকে তিনি উন্মোচন করেন এভাবে-"স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনার সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ নক্ষত্র মালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরন করেন স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরন করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাধুনীর গতি নির্ণয় করেন।"[৪০]

তিনি ধর্মের উক্তি গুলোকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ধমের বিধান সবক্ষেত্রে নারীর জন্য অনূকূল নয়। এ কারণে স্ত্রীজাতির অবনতি প্রবন্ধ এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ পুরুষকে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত করেছিলেন।"তাই পরবর্তীতে রোকেয়া প্রকাশ্যে করেছিলেন। ধর্মের সেই দিকগুলোকে তুলে ধরে নারীর স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন যেগুলো নারীর অনূকূলে যায়।

সব সময় ধর্মবিরোধী বক্তব্য দিয়ে সমস্যা তুলে ধরা নয় বরং ধর্মের বিভিন্ন দিকগুলোকে উল্লেখ করে মানুষের চিন্তাশক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া, মনের মধ্যে প্রশ্ন উত্থাপন করার পথ দেখিয়েছেন। কারণ ধর্ম এত সংবেদনশীল, যে তাতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার মত পরিবেশ তখন ও ছিল না আজকের এই বাংলাদেশেও তা নেই। এরই মধ্যে ধর্ম সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্যগুলো সাহসী সৈনিকের মুখপাত্র। ধর্ম সম্পর্কে পরবর্তীতে তাঁর এই নীতি আমরা অনুধাবন করতে পারিনি

---

[৩৯] আব্দুল কাদির সম্পাদিত রোকেয়া রচনাবলী রসনা পূজা পৃঃ ২৫১।
[৪০] পূবোক্ত , অর্ধাঙ্গী, পৃঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাই ধর্ম সম্পর্কিত তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ যেমন, নূর ইসলাম, হজ্বের ময়দানে বোরকা পড়ে মনে হয় রোকেয়ার মধ্যে স্ব-বিরোধীতা কাজ করেছে।

রোকেয়া চিহ্নিত করেছিলেন নারীমুক্তির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক অবরোধ প্রথা। বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে পর্দা প্রথা তথা অবরোধ প্রথার সীমাহীন অত্যাচার নারীর স্বাভাবিক বিকাশকে প্রতিপদে প্রতিহত করে। তাঁর শিক্ষা লাভের পথকে সংকুচিত করে। এধরণের পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। পর্দা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য।"[৪১]

সবেমাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকের হইতেও পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই, অথচ পর্দা করিতে হইত। পুরুষদের তো অন্তঃ পুরে যাইতে নিষেধ, সুতরাং তাহাদের সত্যাচার আমাকে সইতে হয় নাই। কিন্তু মেয়ে মানুষের অবাধ গতি অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতেই লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ীর কোন লোক চক্ষুর ইশারা করিত, আমি যেন প্রাণভয়ে যত্রতত্র-কখন ও রান্নাঘরে, ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরাণীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির সভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম।....... কোন সময় চক্ষের ইশারা বুঝিতে না পারিয়া দৈবাৎ না পলাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষিনী মুরব্বীগণ, কলিকালের মেয়েরা কি বেহায়া , কেমন বেগয়রৎ ইত্যাদি বলিয়া গঞ্চনা দিতে কম করিতেন না।"[৪২]

রোকেয়া নারীর অবনতি, দাসত্ব, তাঁর প্রতি অত্যাচার এর পিছনে আর ও নিগূঢ় কোন কারণ বিদ্যমান তা অনুভব করেছিলেন। এক পর্যায়ে মানসিক দাসত্বকে নারীর পরাধীনতার কারণ মনে করেছেন। এ্যাঙ্গেলসের পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির তত্ত্বের সঙ্গে যার সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

'আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতিও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থটুকু ও থাকিল না, তখন কাজেই তাহারা ভূ-স্বামী, গৃহ- স্বামী প্রভৃতি হইতে ক্রমে

[৪১] মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম সম্পাদিত নারী : রাষ্ট্র , উন্নয়ন ও মতাদর্শ, বেগম রোকেয়া নারীবাদী চেতনা ও সাহিত্যকর্ম, সুরাইয়া বেগম, পৃ: ৮৯।

[৪২] আব্দুল কাদির সম্পাদিত রোকেয়া রচনাবলী, অবরোধ বাসিনী, পৃ: ৪৮৮-৪৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের 'স্বামী' হইয়া উঠিলেন। আর আমরা ক্রমশঃ তাহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি।"[৪৩]

তিনি সমস্যাকে তুলে ধরার সাথে সাথে সমস্যা উত্তরণের জন্য দিক নির্দেশ করেছেন। নারী সত্ত্বাকে জাগাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি কাজকে আরোপিত করে দেবার ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেছেন তাঁর ধারণা নারী যদি পুরুষের সমান সুযোগ সুবিধা এবং শিক্ষা লাভ করে তাহলে তারা ও পুরুষের তুলনায় উন্নত বই অবনত হবে না। বরং নারীর সৃষ্টিশীল ভূমিকা অনেক উন্নত পুরুষের তুলনায় সমাজের এই লিঙ্গভিত্তিক কর্ম বিভাজন কে মেনে না নেবার সুন্দর উদাহরণ সুলতানার স্বপ্ন; নারীস্থান। নারী উন্নয়নে বেগম রোকেয়া সাহিত্য কর্ম যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা বলে শেষ করা কঠিন। আজও গোটা সমাজ তাঁর প্রদর্শিত পথ যদি অনুসরণ করতে পারত তবে নারী উন্নয়ন আর ও তরান্বিত হত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী সমাজের সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হল বিধবা বিবাহ আন্দোলন এশতকের প্রথমার্ধে আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার পর বিধবার পুর্নবিবাহের প্রশ্নটি বড় করে দেখা দেয়। তবে এ প্রয়াস শুধু হয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে।"[৪৪]

"উনিশ শতকের তিরিশের দশকে বিধবাবিবাহ নিয়ে জ্ঞানান্বেষণ" 'সমাচার দর্পন' পত্রিকায় আলোচনা শুরু হয়ে এ দশকের শেষের দিকে Indian law commission এক সভায় বিধবাবিবাহকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবও করে, তবে তা কার্যকরী হয়নি। চল্লিশের দশকে আন্দোলন আরও জমে ওঠে। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ও 'সংবাদ প্রভাকর' এর মধ্যে বিষয়টি নিয়ে বাদ প্রতিবাদ চরমে ওঠে। "[৪৫]

১৮৪৫-এ 'The Bengal British Indian Society'. ধর্মসভাকে এ নিয়ে সরকারের কাছে আবেদন করলেন ও কোন সাড়া না পাওয়ায় আবার ১৮৪৬ এ আবার প্রস্তাবটি উস্থাপন করলে কেউ কেউ গর্বের সঙ্গে বললেন, বিধবার বিয়ে না দিয়ে বরং পুড়িয়ে মারার একটি আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করে পাঠাবেন।

---

[৪৩] ঐ, স্ত্রী জাতির অবনতি , পৃঃ ২৭-২৮।
[৪৪] রনজিৎ বন্দোপাধ্যায়, উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য পৃঃ ৩১
[৪৫] পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৪৯ এ বিদ্যাসাগর শাস্ত্র ঘেটে বিধবাদের বিয়ের বিধি খুঁজে পান এবং বেথুনের সহযোগিতায় পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি এ সংক্রান্ত বাদ প্রতিবাদ চরমে ওঠে। '২১ আগষ্ট, ১৮৫৪ 'ইংলিশম্যান' পত্রে পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, কৃষ্ণনগর নিবাসী রাজীব মোচন সরকার বিধবা কন্যার বিয়ে দিয়েছেন। কন্যার বয়স পঞ্চদশ বৎসর।''[৪৬]

এটিই জানামতে প্রথম বিধবাবিবাহ। এভাবে ধীরে ধীরে গণমাধ্যমের কল্যানে কতিপয় হৃদয়বান জ্ঞানী, সমাজ সংস্কারকের প্রচেষ্টায় সমাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে। তবে গণমাধ্যমের এ প্রভা সাধারণ নিন্মবিত্তের মধ্যে প্রতিয়মান হয় না এর কারন এখন ও ভারত বর্ষ তথা এদেশে শতভাগ মানুষ শিক্ষিত হতে পারেনি। শিক্ষিত ও তবে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যে উন্নয়নের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল তার ছোঁয়া সমাজের সর্বস্তরে কমবেশী লাগতে শুরু করে। বেগম রোকেয়ার লেখনী সবার কাছে না পৌছলে ও সমাজে ধীরে ধীরে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। কাল ক্রমে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে উন্নয়নের প্রসার ঘটে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহায়তায় নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষার প্রসার ঘটে। বিভিন্ন আইন তৈরী হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইন তৈরী হয়। সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাবে নারীর অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ হয়। সংবাদ পত্র পুস্তক পুস্তিকায়, কবিতায়, গল্পে, নাটকে , উপন্যাসে, প্রবন্ধে, প্রতিনিয়ত নারীর অধিকার গুলি সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হতে থাকে।

বাস্তবে যখন নারী মুক্তি সম্ভব হয়নি, কাব্যে তার হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ইতিপূর্বে রঙ্গলাল বঙ্গোপাধায়ের পখিনী উপাখ্যান' কাব্যে ১৮৫৮ এর ইচ্ছামাত্র সূচিত হয়েছিল, ১৮৬১ সালে মেঘনাদবধ যখন লেখা হয় তখন বঙ্গ সমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার উন্নতি আরম্ভ হয়েছে, ১৮-৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই ডিরোজিওর প্রভাবে সুশিক্ষিত বাঙালি যুবকরা হৃদয়ে যে সাম্যভাব ধারণ করেছিলেন, গৃহে তা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্র তখন ও প্রস্তুত হয়নি, কাজেই অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাশীলা সম্ফুচিতা বঙ্গনারীকে প্রমীলার বেশে দেখে কৃতবিদ সেদিন মোহিত হয়েছিলেন। দেশি ও বিদেশি আদর্শের এমন নিপুন মিশ্রন

---

[৪৬] সম্বাদ ভাস্কর , ৩১.৮.১৮৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

সেকালের কবিকল্পনায় আর কোথাও নেই, মনে হয় কবিমানসের আদর্শ নারী কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।"[৪৭]

প্রমীলা বাংলা সাহিত্যে আধুনিক নায়িকা কুলের অগ্রজা। বেহুলার সতীত্বনিষ্ঠার সঙ্গে তিলোত্তমার নারী মর্যাদাটুকু সম্মিলিত হয়েছে প্রমীলা চরিত্রে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে বিভিন্ন ভদ্রমহিলা যে দাবি তুললেন সে শুধু বাঁচার দাবি নয়, নারীত্বের দাবি, সমান অধিকারের দাবি। সীতা, সুভদ্রাও মাইকেলের প্রিয় চরিত্র। এঁরা যেন ভিন্ন যুগের বিবিধ নারী ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি। সীতা অতীত নারী সমাজের প্রতিনিধি তাই চিরনিগৃহীতা, ভারতীয় নারীর নিরুদ্ধ পুঞ্জীভূত বেদনার গাঢ়তম ভাষা সুভদ্রা, ভাবী সমাজের স্বাতন্ত্রময়ী রমনী। রথের রজ্জু তাই তার আপন করে। সীতা বিনম্রা আর সুভদ্রা দীপ্তিময়ী কবি সুভদ্রাহরণ নামে পৃথক কাব্য লিখে এই পৌরানিক আধুনিকাকে চিরস্মরনীয় এবং কাব্যের অঙ্গনে এক স্বতন্ত্র ভূখন্ডের অধীকারী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আর সময় পাননি।

মধুসূদনকে কেন্দ্র করে নারী প্রগতি আন্দোলনের ইতিহাসে যে নতুন পথ সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তী কবিরা সে পথেই অগ্রসর হয়েছেন।"[৪৮]

দেবেন্দ্র নাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যে নারীস্তুতি বর্ণনায় পঞ্চমুখ, যা স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের পরোক্ষ প্রতিফলন বলা যায়ঃ-

" জানি আমি নারী, তুমি কবি বিধাতার
শ্রেষ্ঠকাব্য; সুকোমল কান্ত পদাবলী;
ছন্দোবন্ধে অনুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কারে!
শ্যামের মুরলী সম শব্দের কাকলী!
উপমার কারিগরি বর্ণের যোজনা
কল্পনারলীলা খেলা (গোপীর হিন্দোলা)!
হেরি সখি, মুগ্ধ হয় লুব্ধ চেতনা;
নাচিছে উর্বশী যেন বাসন্তী নিচোলা।"[৪৯]

---

[৪৭] দ্রঃ মোহিত লাল মজুমদার আধুনিক বাংলা সাহিত্য, (সং ১৩৪৩) পৃঃ ১০৬।
[৪৮] রণজিৎ পাল্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯১।
[৪৯] দেবেন্দ্রনাথ সেন, অশোক গুচ্ছ (সং১৩১৯) পৃঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে নারী উন্নয়নের পথে কবি সাহিত্যিক গণ এগিয়ে আসেন। বেগম রোকেয়ার লেখনী যেমন 'সুলতানার স্বপ্ন', 'অবরোধ বাসিনী', 'স্ত্রীজাতির অবনতি'; নারীস্থান ইত্যাদি সাড়া জাগানো লেখা সমাজকে ঘুম থেকে জাগায়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখায় নারী উন্নয়ের আহবান দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের লেখায় সমাজে নারীর অসহায়-অধস্তন অবস্থান, নারীর মানবিক গুনাবলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আজও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন আলোচনায় নজরুলের নারী কবিতাটি উদাহরণ হিসেবে চলে আসে। এভাবে কাব্যে সাহিত্যে নাটকে গল্পে সর্বত্র নারীর সমান অধিকারের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে গণমাধ্যমের কল্যাণে মানুষের মনোজগতে পরিবর্তনের আবহ তৈরি করেছে। আজকের একবিংশ শতাব্দীর নারীর যে মানবিক রূপটি আমাদের সামনে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে তার মূলে প্রিন্ট মিডিয়াই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

মদন মোহন তর্কালঙ্কারের প্রবন্ধ স্ত্রীশিক্ষা (১৮৫০) শরৎ চন্দ্রের নারীর মূল্য, নজরুলের নারী, হুমায়ূন আজাদের 'নারী', সর্বত্রই নারী উন্নয়নের চেতনা বিধৃত।

ষাটের দশকে সমগ্র বাংলায় উন্নয়নের জোয়ার বইতে শুরু করে। দেশ বিভাগের পরও বাংলার মানুষের মধ্যে পরাধীনতার গ্লানি মুছে যায়নি। পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চারিদিকে অসন্তোষ দানা বাধঁতে থাকে। রেডিও টেলিভিশন, পত্র পত্রিকা শ্লোগান মিছিল মিটিং সর্বত্র স্বায়ত্ব শাসনের পক্ষে প্রচার প্রচারনা চলতে থাকে। এই আন্দোলনের সাথে নারী উন্নয়নও এক ধাপ এগিয়ে যায়। কারণ স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ সর্বত্র ছাত্রকের পাশাপাশি ছাত্রীরা, পুরুষের পাশাপাশি নারীরা যার যার অবস্থান থেকে যে যার মত মত করে অবদান রাখে। মুক্তি যোদ্ধাদের আশ্রয় দান, সংবাদ সরবরাহ, খাদ্য সরবরাহ, আহতবিপ্লবী মুক্তি যোদ্ধাদের সেবা দানের মাধ্যমে নারী তার ভূমিকা রাখে। 'মুক্তির গান'-এর দলে নারী শিল্পিরা এগিয়ে আসে। নারীর আত্মপ্রকাশের এ এক মহান পদক্ষেপ গ্রামে গঞ্জে নাম না জানা সাধারণ নারীরা নাটক, যাত্রা পালায় অভিনয়ের মাধ্যমে গণসচেতনতা তৈরি করে, একই সাথে স্বীয় সুপ্ত মানবিক সত্ত্বাকে নিজের মধ্যে আবিস্কার করে। অসংখ্য নারী যুদ্ধে সম্ভ্রম হারান, শহীদ হন নিজের স্বামী, সন্তান কিংবা দেশকে বাঁচাতে গিয়ে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সংবিধানে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের কথা ঘোষনা করা হয়। টেলিভিশন, সিনেমা, নাটক গান সর্বত্র পুরুষের পাশাপাশি নারীর পদচারণা লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি ভাবে নারী উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা শুরু হয়-যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। (বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিও গুলো ও বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়। রেডিও, টেলিভিশনে বিভিন্ন রকম নারী উন্নয়ন মূলক প্রচার প্রচারণা শুরু হয়। নারীশিক্ষা জন্মনিয়ন্ত্রণ, নারীর কর্মসংস্থান, অর্থ উপার্জণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রচার প্রচারনার পর মাধ্যমে সমাজকে নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়। গণমাধ্যমের ভূমিকায় নারী আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। গণমাধ্যমই নারীকে জীবন বোধে উদ্বুদ্ধ করেছে, সংগ্রামে সাহস যুগিয়েছে, নারীকে শিক্ষিত হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছে পুরুষের মনে, নারী সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণাকে বদলে দিয়েছে। আজকের পিতা-মাতা তাই ছেলে মেয়ে উভয়কে সম্মান চোখে দেখতে শুরু করেছে। যদিও সমাজের সর্বত্র এখনও নানা রকম বৈষম্যমুলক আচরণ দেখতে পাওয়া যায়। এখন ও প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এখন ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ হয়নি, ঘরে ঘরে নারী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার, এখন ও পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। সরকার অবৈতনিক নারী শিক্ষা চালু করলেও বৈষম্যমূলক সামাজিকীকরণের কারণে আজও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকল নারী শিক্ষার আলো দেখতে পায়নি। এখন ও ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার নারীর অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ কাজ করছে। গণমাধ্যম গুলি ও অনেক ক্ষেত্রে নারী অবউন্নয়নে কাজ করছে। পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। গণমাধ্যম এক্ষেত্রে কী ভাবে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে-গবেষণায় সে সব দিক নির্দেশালা রয়েছে। নারী উন্নয়নকে তরান্বিত করতে হলে গণমাধ্যমগুলিকে আরও জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে এক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন সে সংক্রান্ত আলোচনা ও রয়েছে।

৫.১.৪ জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নির্মাণ প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমঃ

বাস্তবতায় প্রতিবিম্ব হল গণমাধ্যম। আবার এও বলা যায় বাস্তবে যা ঘটে গণমাধ্যমে তা প্রতিফলিত হয়। আবার এই গণমাধ্যমের প্রতিফলনই সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। ইতোপূর্বে প্রিন্ট মিডিয়া কিভাবে সমাজ পরিবর্তন ও নারী উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে সে সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। এবার গবেষণার আলোকে গণমাধ্যমের অন্যান্য দিকও আলোচনা করা প্রয়োজন। উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে উন্নয়ন যোগাযোগ বা সামাজিক যোগাযোগ এক অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যাপ্রোচ। উন্নয়ন- ও সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমে উপকরণ বা উপাদান যেমন, গল্প কবিতা নাটক,

Dhaka University Institutional Repository

বই, প্রবন্ধ পত্রিকা, পোষ্টার লিফলেট, গান, ছবি প্রামান্যচিত্র, স্লাইড, পেইন্টিং আলোকচিত্র, কার্টুন পটচিত্র, প্রশিক্ষণ সহায়িকা পথ নাটক, মঞ্চ, বক্তৃতা বিবৃত্তি ইত্যাদি। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় উক্ত কৌশল বা মাধ্যম গুলি যথা যথ ভাবে ব্যবহার হলে তা উন্নয়ন কর্মকান্ডে গতিশীলতা দানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে এগুলোর উপযুক্ত ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে না পারলে যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, আবার তা অনেক সময় সমাজে অনাকাঙ্খিত বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে যা গোটা সামাজিক পরিবেশকে অবউন্নয়নের আবিষ্টতা আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে। এক্ষেত্রে ডেন্ডার সংবেদনশীলতা একটি বড় প্রশ্ন বোধক হয়ে দাঁড়ায়। উন্নয়ন যোগাযোগের উপকরণ গুলো শ্রোতা দর্শকের মনে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিংবা আদৌ কোন প্রভাব বিস্তার করে কিনা কিংবা শ্রোতা-দর্শক পাঠকের মনে যে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে সে প্রশ্নটি ও এক্ষেত্রে আমাদের সামনে চলে আসে। আমাদের দেশের গণমাধ্যম বা উন্নয়ন উপকরণ গুলি জেন্ডার সংবেদনশীলতা নির্মাণে কতটা প্রভাব রাখছে, কতটা নারী পুরুষ নিরপেক্ষ বা কতটা নারী পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে সচেতন সেটিও বিবেচনার বিষয়।

উনিশ শতকে পত্র-পত্রিকা বই-পুস্তকে নারীর জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষা রান্না, সেলাই, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সঙ্গীত ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে প্রচুর লেখা লেখি হয় যার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত তরুনরা যাতে উপযুক্ত ও পছন্দমতো স্ত্রী পান, যারা হবেন সুনিপুণ, সুগৃহিনীও সুমাতা। এক কথায় গণমাধ্যম গুলো নারীকে পুরুষতান্ত্রিকতায় আদলে পুরুষের পছন্দমতো তৈরি বা নির্মাণ করার প্রয়াসে ব্যস্ত ছিল "নারীর ওপর এমন খবরদারি অন্দরে-বাইরে ও সাহিত্যে তো ছিলই, পত্রিকার পাতাতে ও ছিল। এখনো অনেকাংশে রয়েই গেছে। নানা রকমের খবরদারি সত্ত্বেও রমনীয় সুগৃহিনী সুমাতা হওয়ার পাঠ নিতে গিয়ে নারীর ভেতর একটা সময় জেগে ওঠে আমিত্ব ও নিজস্বতার বোধ। এই নিজস্বতার বোধটুকুই তাকে পছন্দ অপছন্দের কথা বলতে ও লিখতে সাহস দেয় প্রেরণা যোগায়। শুরু হয় নারীর কথা কলাকলমে কালিতে এ পত্রিকার পাতায়। নিজের কথা বলতে গিয়ে ও প্রথমে নারী রান্না, সেলাই সৌন্দর্য সচেতনতার কথাই বলেছে, এখনো বলে। এভাবেই সংবাদপত্রে নারী নিজের কথা বলার জন্য জায়গা করে নিয়েই, সংবাদ হিসেবে নারীর বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। উনিশ থেকে একুশ শতকে নারী অনেক কাঠ-খড়

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পুড়িয়ে, বন্ধুর পথ মাড়িয়ে আজকের অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। বলতে, লিখতে, প্রতিবাদ জানাতে ও একা পথ চলতে শিখেছে।"[৫০]

গণমাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে নারী নিজের কথা উপস্থাপন করার মাধ্যমে উন্নয়নের পথে পা বাড়িয়েছে। পুরুষ তার মত করে নারীকে গড়তে চেয়েছে বলে তাকে মোহনীয়, কোমলমতি রমনীয় ইত্যাদি রূপে চিত্রায়ণ করেছে। তবে অগ্রগতির এই পর্যায়ে নারীর মধ্যে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। স্বীয় অধিকার রক্ষায় নারী সরব হয়ে উঠেছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে আত্ম সচেতনতা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। তবে এ চেতনা বা বোধ কিছু সংখ্যক শিক্ষিত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। সমাজের অধিকাংশ দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে এর কোন প্রভাব একখন ও খুব একটা লক্ষনীয় নয়। কারণ মিডিয়ার সুফল তাদের কাছে পৌছার আগে দারিদ্রের কুফল তাদের টিকে থাকার সংগ্রামকে স্থায়ী করে।

তবে দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামই নারীকে কর্মসংস্থানের সন্ধানে পথে নামিয়েছে। সে ক্ষেত্রে দরিদ্র শ্রেণী অর্থ সংস্থানের জন্য সমাজের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারকে ছিন্ন করে পথে ঘাটে কল-কারখানায় কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। কেউ বা দিন মজুরী করে সংস্কারের ভরণপোষণ করছে। কেউ বা বাসা বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করছে, কেউবা নিজ বাসস্থান ছেড়ে শহরে এসে কল-কারখানা, গার্মেন্টস ইত্যাদি জায়গায় কাজ করার জন্য শহুরে বস্তিএলাকা বা অপেক্ষাকৃত কম খরচে স্বীয় বাসস্থান গড়ে তুলে তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক বাঁধন ছিন্ন করে মুক্তজীবন যাপনের পথ খুঁজে পেয়েছে। নারী এভাবে চারদেয়ালের মধ্য থেকে মুক্ত পৃথিবীতে পা বাড়িয়েছে। এক্ষেত্রে দারিদ্রতার কারণে নারী হয়ত পড়ালেখা সম্পূর্ণ করতে পারেনি। গণমাধ্যমের সুফল ও হয়ত সে সরাসরি ভোগ করছে না কিন্তু স্বীয় কর্মক্ষেত্রে এসে সে নানা রকম মাধ্যমের সাথে পরিচিত হচ্ছে। সে কর্মক্ষেত্রে ও অসমতার স্বীকার হচ্ছে। মজুরী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম পাচ্ছে ফলে তার মধ্যে অসমতার বোধ তৈরী হচ্ছে। মানসিক প্রতিবাদ পুঞ্জিভুত হয়ে এক সময় বিস্ফোরিত হচ্ছে সম্মিলিত প্রতিবাদ আকারে তারমধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধ তৈরী হচ্ছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় নিয়ামক ।

---

[৫০] বনশ্রী ডলি, নারী পাতার দৃষ্টি ভঙ্গিগত পরিবর্তন, ডেভার ইন মিডিয়া, বুলেটিন-৮, আগষ্ট-অক্টোবর ২০০৭ পৃঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবার দরিদ্র শ্রেণীর নারীদের মধ্যে হয়ত গণ মাধ্যমের প্রভাব সরাসরি পড়ছে না, কিন্তু পথে ঘাটে কর্মক্ষেত্রে সে যেসব ছবি, গান, প্রচার পত্র, রেডিও, মানুষের মুখের কথা, বক্তৃতা, সভা সমিতি, যাত্রা, পথ-নাটক, সিনেমা বিজ্ঞাপন ইত্যাদি গণ যোগাযোগ মাধ্যমের সংস্পর্শে আসছে সেগুলি তাদের উন্নয়নে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করছে। যা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক উভয়বিধ প্রভাব রাখছে। এই পরোক্ষ মাধ্যম গুলি পরোক্ষভাবে দরিদ্র শ্রেণীর নারীর মধ্যে ও অবচেতন মনে এক ধরণের চেতনা তৈরী করছে। একে আমরা নির্মাণ প্রক্রিয়া ও বলতে পারি।

গণমাধ্যম যদি জেন্ডার সংবেদনশীল হয় তবে নারীর নির্মাণ প্রক্রিয়া অবশ্যই উন্নয়নের পথ প্রদর্শক হবে। যেমন-'ছেলে হোক মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট' আমরা একটি সন্তান নিয়েই সুখে আছি', যেখানে বাবা মা দুজন কেই তাদের মেয়ে শিশুটিকে নিয়ে সুখে থাকতে এবং স্বপ্ন দেখতে দেখা যাচ্ছে। এতে দরিদ্র অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে মেয়ে শিশুর প্রতি সহনীয়তা বোধ, গ্রহণ যোগ্যতা ইত্যাদি মানসিক সম্মতি পরোক্ষ ভাবে তৈরি হচ্ছে। মেয়ে শিশুকে তারা এখন অভিশাপ মনে করছে না। রাস্তা ঘাটে যান বহণের পিছনের ছবিতে ছেলে মেয়ে বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, এরকম দৃশ্য দেখে অশিক্ষিত দরিদ্র মা বাবার মধ্যে ছেলে সন্তানের সাথে মেয়ে সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর মানসিকতা তৈরি হচেছ।

"উন্নয়ন যোগাযোগ হচ্ছে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাও গণমাধ্যম ব্যবহারের একটি সুগঠিত প্রচেষ্টা। এধরণের যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রচার, শিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের আচরণগত পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। উন্নয়ন যোগাযোগ একটি গবেষণালব্ধ এবং পরিকল্পিত প্রক্রিয়া বা অ্যাডভোকেসি, সোশাল / অ্যাডভোকেসি মবিলাইজেশনসহ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তন বা উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের যুগে সফল ও টেকসই উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন যোগাযোগ খুবই কার্যকরী একটি উপায়। কেবল প্রচলিত আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ও মাধ্যমগুলোই নয়, নানা অনানুষ্ঠানিক, লোকজ ও অন্যান্য মাধ্যমের সহায়তায় সৃজনশীল পন্থায় উন্নয়ন যোগাযোগ তখন আরো কার্যকর ও শক্তিশালী হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশে ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন যোগাযোগের ভূমিকা বাড়ছে।"[৫১]

এক্ষেত্রে অনেক সময় গণমাধ্যম গুলির পুরাণ ধ্যান ধারনা গুলির পুনরাবৃত্তি, দীর্ঘদিনের সামাজিক রীতিনীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা, নারীর গুরত্বপূর্ণ সংগ্রামশীল ভূমিকা এবং সৃষ্টিশীলতাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থাকে অবউন্নয়নের পথে পরিচালিত করে।

টেলিভিশন এবং সিনেমা এই দু'টি মাধ্যম মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনায়নে ভূমিকা রাখে। দৃশ্যমান ছবি গুলি মানুষের মস্তিকে স্থায়ী রেখাপাত করে যা ব্যক্তির নির্মাণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করে এবং চলমান ছবি গুলো বাচন প্রক্রিয়া, কথোপকোথন বা 'ডায়ালগ' গুলি ব্যক্তির মস্তিকে পৌনপৌনিকতা আনায়নের মাধ্যমে চেতনাকে পরিবর্তনশীলতা দান করে। ব্যক্তির মস্তিস্কের এই প্রতিচছবিই ব্যক্তির সামাজিক মূল্যবোধ নির্মাণ করে। এই নির্মাণ প্রক্রিয়া ইতি বাচক হলে সমাজ দ্রুত উন্নয়নের পথে ধাবিত হয় আর এর নেতিবাচকতা ভূতের পায়ের মত পশ্চাৎগামী হয়। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের এই দ্বি-বিধ ভূমিকাই পরিলক্ষিত হয় ব্যাপক ভাবে। টিভি, চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী মাধ্যমের সঙ্গে ইদানিং যুক্ত হয়েছে কম্পিউটার, ইন্টারেনট ইত্যাদি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের দ্বারা সার্থক উন্নয়ন বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অতীত থেকেই কিছু ইতিবাচক উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন : জনস্বার্থে প্রচারিত বিভিন্ন টিভি স্পট, বিজ্ঞাপন, নাটিকা, জীবন্তিকা, কার্টুন সহ বিভিন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। যেমন-সম্প্রতি ছবি সহ ভোটের তালিকা প্রণয়নের মত জটিল কাজটি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত পাপেট শোনটি ব্যাপকভাবে সহায়ক হয়েছে যেখানে একজন তরুনী স্কুল-শিক্ষিকা সবাইকে ভোটার তালিকা তৈরির জন্য ছবি তোলার কাজে উৎসাহিত করছে এবং কোথায় কিভাবে এ কাজটি সম্পন্ন করতে হবে এবং এর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি জনসাধারণকে বলে দিচ্ছেন এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে, যেমন দরিদ্র অশিক্ষিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভোটার ছবি সহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের গুরুত্বের বার্তা পৌছে দিয়ে

---

[৫১] শাহেদা মুন্নী- উন্নয়নে জেন্ডার সংবেদনশীল এবং কার্যকর যোগাযোগ উপকরণ উন্নয়ন পদক্ষেপ, ষ্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, মার্চ ২০০৭, পৃঃ ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে উৎসাহিত করেছে, আবার এটি একই সাথে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও রক্ষা করেছে-যেখানে একটি গ্রামীণ শিক্ষিত তরুনী শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করে নারী পুরুষ সকলকে এই মহান জাতীয় কাজটিতে উৎসাহিত করেছে। এতে নারীর প্রতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ও তাই ছবি সহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের মত কঠিন কাজটির প্রতি সহযোগিতা সমর্থন দেখা গিয়েছে এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্ক সবাই তালিকার আওতায় ভুক্ত হয়েছে। প্রায় পনেরো কোটি মানুষের এই দেশের মানুষের (হাত) যদি কাজে লাগান যায় তবে এদেশে সমৃদ্ধশালী হবে এই বানী নিয়ে বিটিভি যে গান প্রচার করছে 'পনেরো কোটি মানুষের ত্রিশ কোটি হাত'- তা একটি জেন্ডার সংবেদনশীল প্রচার, যেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে জাতির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকলের সমান অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবার নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ উপলক্ষে যেসব প্রচার প্রচারণা দেখা গিয়েছে তার অধিকাংশই জেন্ডার সচেতন প্রচারণা। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবুঝ নারীকে পুরুষের মাধ্যমে ভোট দান সংক্রান্ত জ্ঞান দানের প্রক্রিয়া দেখা যায় যেটা এসমাজের অতি সাধারণ দৃশ্য। তবে মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগানোর ক্ষেত্রে, নারীর নিজস্বতা বোধ তৈরির ক্ষেত্রে নির্বাচন সংক্রান্ত এ প্রচার প্রচারণা গুলি ব্যাপক ভাবে কাজে লেগেছে। তারই ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে ভোট দানের ক্ষেত্রে নারী ভোটারের সংখ্যাধিক্য, ব্যাপক উৎসাহ ও ভোট কেন্দ্র গুলিতে নারীদের দীর্ঘ লাইন। এছাড়া ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের আরেকটি বিশেষ দিক আমাদের সামনে চলে এসেছে তা হল সরাসরি নির্বাচনে এবার সর্বাধিক সংখ্যক (জন) নারী প্রার্থীর বিজয়। যদিও ৩১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী সভায় প্রধানমন্ত্রী সহমাত্র পাঁচজন মহিলা মন্ত্রীকে দেখা যায় তবে এটি ও এদেশের নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিশাল অগ্রগতি।

উপরের আলোনায় গণমাধ্যম জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নির্মাণ প্রক্রিয়ায় কীভাবে ভূমিকা রাখে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অবস্থান উন্নয়নকে গণমাধ্যমের ভূমিকা

চতুর্থ অধ্যায়ে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অবস্থান এবং বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার এ পর্যায়ে নারীর অবস্থান উন্নয়ন গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য দিয়ে শুরু করা যাক। 'মেয়ের নাম ফেলি, জমে নিলে ও গেলি, পরে নিলেও গেলি-' প্রবাদটির মধ্যে সমাজে নারীর অবস্থান কতটা নগন্য তা বুঝতে সমাজকে শিক্ষা দেয়। একটি মেয়ে শিশু অসচেতন পিতামাতার কাছে বোঝা স্বরূপ, তাকে যে কোন উপায়ে যে কোন স্থানে স্থানান্তর করতে পারলেই যেন একটি সংসারে স্বস্তির নিঃশ্বাস আসে। আমাদের সমাজের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মেয়ে সন্তানের প্রতি যে অবহেলা-তা দূর করতে গণমাধ্যমই সর্বাধিক শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। সিনেমা, টেলিভিশন, রেডিওতে জীবন ঘনিষ্ট ছবি, নাটক, নাটিকা, জীবন্তিকা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে ছেলে মেয়ে উভয় সন্তানেরই সমান গুরুত্ব উপস্থাপনের মাধ্যমে কন্যা সন্তানের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব দূর কারা সম্ভব। গত কয়েক দশক ধরে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা এক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনায়নে সক্ষম হয়েছে।

প্রিন্ট মিডিয়াগুলির ইতিবাচক উপস্থাপনা, নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাসের জন্য জনসাধারণের প্রতি বিভিন্ন রকম আহবানের ফলে-নারী আজ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পর্যায়ে স্বীয় ভূমিকা রাখার সুযোগ পাচ্ছে। বেগম রোকেয়া তার লেখনীর মাধ্যমে নারী সমাজকে অন্ধকারের বেড়াজাল ছিন্ন করে শিক্ষিত হওয়ার আমন্ত্রন জানিয়ে এদেশের নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বেলেছিলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আবার অর্থউপার্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে তাদেরকে স্বনির্ভর হওয়ার মন্ত্রণা জাগিয়ে ছিলেন। স্বীয়কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে তাই নারী আজ আত্ম নিয়োজিত। কিন্তু রোকেয়ার এই প্রয়াস এত সহজ ছিল না। চারিদিকে ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে যেমন নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেছেন, তেমনি তাঁর বিপরীতে অসংখ্য শ্লোক মুখস্থকারী পুথি পন্ডিত পত্রিকান্তরে অসংখ্য লেখা ছাপিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সামাজিক কুংস্কারের পক্ষে জনমতকে আরো শক্তিশালী করার চেষ্টায় রত ছিল। কিন্তু রোকেয়া আজীবন তার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। তবু এখনও সমাজের শিক্ষা বঞ্চিত দরিদ্র সমাজে নারীর প্রতি নিষ্ঠুর ভাবে বৈষম্য

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান। এখন ও ছেলে সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে মেয়েকে গৃহস্থালী কর্মে নিয়োজিত করা হয়- সারাদিন সংসারে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও মেয়েটি অর্ধাহারে থাকে আর ছেলে স্কুল থেকে ঘরে ফিরলে তার সেবায় নিয়োজিত হয় মা বোন দু'জন মিলে। অনাহারি কিংবা অর্ধাহারি বোনের হাতে ভাইকে দুধের গ্লাস এগিয়ে দেওয়ার মত নিষ্ঠুর দায়িত্ব দেয়া হয়। কন্যা সন্তানটির ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে এটিকে সমাজের রীতি বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। কখনও কখনও ধর্মের নামে কন্যা শিশুর বা পরিবারের নারী সদস্যের সাথে বৈষম্যমূলক নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য মওলানা, ফকির-দরবেশধারী কিছু লোক বিভিন্ন অজুহাতে ধর্মীয় গোড়ামীকে সামনে নিয়ে এসে নারীর মুক্ত চিন্তার বিকাশকে খর্ব করে থাকে। এরা বিভিন্নভাবে নারী বিরোধী প্রচারণায় মত্ত থাকে। এদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে লেখক হয়ে ওঠে। বই ছাপিয়ে সরল প্রাণ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে নারী বিদ্বেষী মনোভাব গড়ে তোলে। আবার গ্রামে গঞ্জে ওয়াজ মাহফিলের নাম করে সুরে সুরে যে সব বক্তৃতা বিবৃতি দেওয়া হয় তার ও অধিকাংশ সময় জুড়ে থাকে নারী বিরোধী প্রচারণা। যেমন-'নারী হইল ঘরের শোভা রাস্তা ঘাটে মানায় না' একালের মেয়ে মানুষের সাজ হইল-'পেট খালি, পিট খালি কপালের উপর এক নক্তা (নাউযুবিল্লাহ)''[৫২]

ওহে নারীরা পর্দার আড়াল থেকে শুনুন-স্বামী পাগল, মদখোর, মাতাল, চোর, বদমাশ যাই হোক না কেন তাকে না রাজ করা যাবে না। স্বামীর মুখে মুখে তর্ক করা যাবে না-স্বামী না রাজ (নাখোশ) হলে আল্লাহও ঐ স্ত্রীর উপর নারাজ হন। আর আপনারা শুনে রাখুন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোঃ (সাঃ) দোজখে বেশী বেশী নারীদে দেখে এসেছেন, ইত্যাদি নানা রকম প্রচার প্রচারণা। এছাড়া কিছু ইসলামী বই-যেমন 'মকসুদুল মোমেনীন ও স্ত্রী শিক্ষা বা বেহেশতের পুঞ্জি' জাতীয় কিছু ধর্মীয় বই অধিকাংশ মুসলমান এর ঘরে রয়েছে। যে খানে নামাজ, ধর্ম-কর্ম শিক্ষার সাথে সাথে দৈনন্দিন জীবনে নারী পুরুষের সার্বিক সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হাদিস কোরানের উধৃতি সহ। 'সাবধান যেনাকার, যেনাকারিনী! খোদাকে ভয় কর , দোজখের ঐ ভীবণ কষ্ট হইতে বাঁচিতে চেষ্টা কর এবং পর্দা পুশিদায়

[৫২] জামাত নেতা 'মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদী' তার ওয়াজ মাহফিলে সুচতুর বাক পটুতার মাধ্যমে এসব বলে থাকেন-যা শিশুকালে শুনে আমরা সুর করে বলতাম।

Dhaka University Institutional Repository

থাকিতে ভালবাসা। যাহাদের সঙ্গে দেখা দেওয়া কথাবলা খোদা ও রসুলের নিষেধ, তাহাদের দৃষ্টি ও সঙ্গ থেকে দূরে থাকিতে প্রাণপনে চেষ্টা কর। কেননা (বিশেষতঃ)

বেপর্দেগীর দরুনই সচরাচর ঐ সমস্ত কার্য হইতেছে। আপনার স্বামী যদি খারাপও হয়, তথাপি তাহার সঙ্গিনী হইয়া যেন্দেগী কাটাইতে ভাল মনে কর। যাহাদের সঙ্গে দেখা দিতে, কথা বলিতে খোদা ও রছুলের আদেশ আছে, অগত্যা তাহাদের সহিত দেখা দিতে কথা বলিতে পার।"[৫৩]

"আর ও কত কত স্ত্রীলোক আছে, তাহারা কাঁচের চুড়ি ও অলঙ্কারাদি পরিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া চলিতে ফিরিতে ও কাজকর্ম করিতে থাকে সুতরাং বাহিরের লোক তাহা শুনিয়া মনে মনে বলিতে থাকে, যদি এই সময় দেখিতাম বা পাইতাম তবে মনের আশাপূর্ণ করিতাম। নাউজুবিল্লাহ! তাই আল্লাহ তা আলা ক্বোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন। ....
অর্থাৎ স্ত্রী লোকেরা অলঙ্কারাদি পরিয়া গুপ্ত খুবছুরতি জানাইবার জন্য যমিনের উপর দিয়া পা আছড়াইয়া যেন না চলে।
এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে অলঙ্কার পরিধান করিয়া চলিতে ফিরিতে অন্যেশব্দ শুনিতে পায়, উহা পরিধান করা দুরস্ত নাই, করিলে সে অঙ্গখানি দোজখের অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে।"[৫৪]
এ সব বই গুলিতে নারীদের সম্পর্কে এমন ভাবে বলা হয়ে থাকে যে নারী সকল অন্যায়ের মূলে, আর পুরুষ মানুষ যত খারাপই হোক না কোন নারী যেন সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না তুলে। আবার এমন ও বলা হয় নারী সদা সর্বদা পুরুষকে আকৃষ্ট করায় রত থাকে। আর পুরুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল নারীর অমর্যাদা করা, নারীকে যে কোন স্থানে, যে কোন অবস্থায় একা পেলে তার সম্ভ্রমহানী করা কিন্তু এসব প্রচারণা গুলি প্রকারান্তরে পুরুষকে অসৎ, নীতি বিবর্জিত, স্বেচ্ছাচারী রূপে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। নীতি বর্জিত হয়ে চলাটাই যেন পুরুষের জন্য স্বাভাবিক এ সম্পর্কে নারীর প্রশ্ন তোলাটা যেন অন্যায় এদেশের অধিকাংশ নারী সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গৃহস্থালী কর্মে নিয়োজিত থাকে। তাদের এসব চিন্তা করার মত পর্যাপ্ত

[৫৩] আলহাজ্ব কাজী মাওলানা মোঃ গোলাম রহমান, মক্বছুদোল মো'মেনীন বা বেহেশ্‌তের কুঞ্জী প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১০৬।
[৫৪] প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৯ (এখানে উল্লেখ্য যে কোরানের বানীর পরের সাবধানতা বাণী 'সেই অঙ্গখানি দোজখের অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে'- এটুকু উক্ত লেখকের নিজের ব্যাখ্যা)।

Dhaka University Institutional Repository

সময়ও হাতে থাকে না প্রচারণার সময় এসব ধর্মব্যবসায়ীর সে কথা মালুম ভুলে যান। নারী-পুরুষ একস্থানে অবস্থান করে পৃথিবীর অনেক মহৎ কর্ম সম্পন্ন করতে পারে, পরস্পর সহযোগিতা উন্নয়নকে তরান্বিত করেন একথা এসব মৌলবাদীরা ভুলে যায়। তারা ভুলে যায় নারীর শরীর সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত এবং তার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার একমাত্র তারই । পুরুষের চরিত্র রক্ষার্থে নারী নিজেকে গৃহবন্দী করে, আপাদ মস্তক আবৃত করে নিজের স্বাভাবিক চলাফেরার অধিকার বঞ্চিত থাকবে, জীবনের সবদিক থেকে পুরুষ তার আধিপত্য করবে, নারীকে শাসন করবে এ খুবই অন্যায় দাবী। আমাদের দেশে ধর্মীয় গোড়ামী ও অপব্যাখ্যা, অপপ্রাচারের ফলে নারী উন্নয়ন অনেকটা বাধা গ্রস্থ হয়েছে।

প্রায় সব ধর্মেই জননীর সর্বোচ্চ সম্মান এবং তার প্রতি সম্মানের কর্তব্যের ওপর কমবেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনেকেই একে নারীর অধিকারের স্বীকৃতির বা তার মর্যাদার সাথে সমার্থক করে দেখেন বা দেখিয়ে থাকেন। যদি ও জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' এই বহু উদ্ধৃত বাক্যের পাশাপাশি সহ অবস্থান করছে নারী পুংশ্চলী।"[৫৫] দুস্কৃতাগ্নিশিখা নার্যো, দহন্তি তৃনবন্নরম"[৫৬]-এমন কি অধিকতর অবমানাকর কোনো কোনো উক্তি।

কোরআন হাদিসে নারীর সমান অধিকার, শিক্ষা, মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে যে সব বানী রয়েছে তার অধিকাংশের সাথেই আমরা মোটামুটি পরিচিতি। কিন্তু এরই পাশাপাশি কতগুলি (আয়ত বা হাদিসের) এমন উক্তি ও রয়েছে, নারীর মর্যাদার অবনয়ন এবং সমাজে তার সম অংশীদারিত্বের অস্বীকৃতির সপক্ষে ধর্মধ্বজীরা যাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে (এবং করে ও) "আর 'আন নেসাও হাবালাতিস শায়াতিন' অর্থাৎ 'নারী শয়তানের ফাঁদ'- এটিই তার একমাত্র উদাহরণ নয়। এরকম আরো কিছু উদ্ধৃতি নিচে দেয়া হলঃ

ক) স্বামীর প্রাধান্য স্ত্রীর উপর এই কারণে যে, আল্লাহতায়ালা পুরুষকে নারীর উপর শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (সূরা নিসা, ৩৪ আয়াত)

খ) স্ত্রীরা হইতেছে তোমাদিগের শষ্যক্ষেত্র স্বরূপ, সুতরাং তোমারা ইচ্ছামতো তোমাদের ক্ষেত্রগুলিকে উপগত হইতে পার (সূরা বাকারা , ২২৩ আয়াত)।

---

[৫৫] অর্থাৎ পুরুষ দেখলেই তার সঙ্গে কামক্রিয়ায় রত হওয়ার জন্য নারীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে, (মেনুসং হিতা , ৯ম অধ্যায়)।

[৫৬] অর্থাৎ নারী নরকাগ্নির ইন্ধন,(যাজ্ঞাবল্ক্যোপনিষৎ)।

Dhaka University Institutional Repository

গ) হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমার পরে দ্বীন-বিনষ্টকারী এবং মানুষকে বিপথগামী করার বহু সূত্রই সৃষ্টি হইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর ক্ষতিসাধাণকারী বস্তুসমূহের মধ্যে পুরুষদের জন্য নারী গনই হইবে সর্বাধিক ক্ষতিকারিণী- পুরুষদের জন্য নারী সমতুল্য পথভ্রষ্টকারী ক্ষতিকারক আর কোনো কিছু হইবে না। (বোখারি হাদিস ২০১২),

ঘ) নারী (জাতির মূল অর্থাৎ সর্বপ্রথম নারী আদি মাতা হাওয়া) পাঁজারের (উর্ধ্বতম) হাড় হইতে সৃষ্ট। পাঁজরের হাড়সমূহের মধ্যে উর্ধ্বতম হাড়খানাই সর্বাধিক বাঁকা (বো,হা, ২০৪৫)।

ঙ) নারী তোমার মত মোতাবেক পূর্ণ সোজা হইয়া চলিবে না। অতএব উহার দ্বারা উপকৃত হইতে চাহিলে উহার (স্বভাবের) বক্রতাবস্থায়ই তাহা হইতে নিজের উপকার উদ্ধার করিও। যদি উহাকে সোজা রাখিতে চেষ্টা কর তবে তুমি উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। (মোসলেম হাদিস)

চ) দোজখীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা হইবে (বো, হা, ২০৫১-২০৫২)।

আবার স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যকে প্রশ্নাতীত মনে হতে পারে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে:

ক) স্বামী যদি স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় প্রতি ডাকে এবং স্ত্রী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে যদ্দরুন স্বামী অসন্তুষ্টির সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছেন, তবে সেই স্ত্রীর রাত্রি এই অবস্থায় অতিবাহিত হয় যে, ফেরেশতাগণ ভোর পর্যন্ত সারারাত্র তাহার প্রতি লানৎ (বা অভিশাপ বর্ষন করিয়া থাকেন। (বো, হা, ১৫৯৬/২০৪৯/২০৫০)"[৫৭]

খ) স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখিলে তাহাকে নছিহৎ কর এবং বিছানায় তাহাকে পৃথক রাখ, (তাহাতে ও কাজ না হইলে) তাহাকে প্রহার করিবে। (সুরা নিসা, ৩৪ আয়াত)" প্রিন্ট মিডিয়ার সাহায্যে এমন অবমূল্যায়ন ধর্মভীরু নারীকে আত্মসচেতনতা বোধ জাগ্রত হওয়া থেকে বিরত রাখে, নারীর মধ্যে হীনমন্যতা বোধ তৈরী হয় যা নারী উন্নয়নের পরিপন্থি। স্বামী স্বীয় বিছানায় ডাকলে নারী অসম্মতি প্রকাশ করতে পারবে না কিন্তু নারীর শারীরিক বা মানসিক সমস্যা থাকলে কি করবে সে সংক্রান্ত কোন নির্দেশ বা

[৫৭] উল্লিখিত হাদিসের উদ্ধৃতি মাওলানা আজিজুল হক অনুদিত বোখারী শরীফ (হামিদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা-১৯৮২) থেকে নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরামর্শ এ ক্ষেত্রে উপস্থাপন করা হয়নি। অর্থাৎ এখানে নারীর মানবিক কোন মূল্যায়নই করা হয়নি।

আবার 'মেয়েরা স্বামীর ঘরে যায় লাল বেনারসী পরে, আর বের হয় সাদা কাফন পরে'-এ জাতীয় প্রচার সিনেমা নাটকের মাধ্যমে এই প্রচার হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে নারী নিষ্ঠুর স্বামীর কঠিন অত্যাচার সহ্য করেও স্বামী গৃহ ত্যাগ করে বাবা মা, বা অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার নীতিগত অনুমোদন পায় না। গণমাধ্যম গুলিকে এ ধরণের প্রচার থেকে বিরত থাকার এখন সময় এসেছে।

'আপনার শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ যেখানে একটি মেয়ে শিশু বড় হয়ে ডাক্তার হয় এধরণের আরো ইতিবাচক বিজ্ঞাপন প্রচার হলে সমাজে নারী উন্নয়ন তরান্বিত হবে। কন্যা শিশুর আগমন বার্তায় বাবা মায়ের মুখে সুখের হাসি দেখাতে হবে। নারীর কল্যাণময়ীরূপ সর্বত্র তুলে ধরতে হবে। মেয়ে শিশুও বড় হয়ে বাবা মায়ের দায়িত্ব নিতে পারে। একথা সবাইকে বুঝতে হবে। একটি মেয়ে সম্পূর্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে শশুর বাড়ীতে যদি সবাইকে আপন করে নিতে পারে তবে তাকে যারা লালন পালন করে বড় করল তারাই বা কেন তার পর হবে? সমাজের কাছে এধরণের প্রশ্ন তুলে ধরতে হবে। নারী স্বামী সংসারের দায়িত্ব পালন করেও নিজের পিতামাতার খোঁজ খরব করতে পারে। এতে কারুর মনে প্রশ্ন জাগা উচিত নয়। বর্তমানে নারী সমাজ শিক্ষিত হচ্ছে। তারা স্বীয় কর্মসংস্থানে প্রখর দায়িত্বশীলতা সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা অনেক পুরুষের চেয়ে নিবেদিত প্রাণ এবং ভাল করছে। তারা অর্থনৈতিক স্বানির্ভবতা অর্জন করছে এ ক্ষেত্রে নারী তার অর্থ অধিকাংশ সময়েই গঠন মূলক ও উন্নয়ন মূলক কাজে খরচ করছে। নারী যেহেতু আর নির্ভরশীল নয় সুতরাং তার জীবন যাপন পদ্ধতি ও অন্যের বেঁধে দেওয়া রীতি নীতির গতিতে আবদ্ধ থাকাটা সমীচিন নয়। আজকাল সন্তানের বিপথগামী হওয়ার পিছনে অনেক ক্ষেত্রে মায়ের কর্মব্যস্ত তাকে দায়ী করা হয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে। কিন্তু এসব গণমাধ্যমে কর্মব্যস্ততার মধ্যেই সন্তানের প্রতিমায়ের কর্তব্য কর্মকে ততটা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় না। এ ক্ষেত্রে সন্তানের প্রতি মায়ের পাশাপাশি বাবার ও সমান কর্তব্য ও বাধ্য বাধকতা রয়েছে এধরনের নাটক

Dhaka University Institutional Repository

সিনেমা, বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে পুরুষের মানবিক বোধ ও কর্তব্য নিষ্ঠা জাগ্রত করতে হবে।

২০০৮ সালের ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে যে নারী উন্নয়ন নাতি ঘোষণা করা হয় তাতে সর্বক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়েছে। পিতার সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ের উভয়ের সমানাধিকার দাবি করা হয়েছে অতিযুক্তি সংগত এ দাবীকে গণমাধ্যমের সহায়তায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া একান্ত জরুরী। পিতা মাতা ছেলে-মেয়ে উভয়কে একই কামনা বাসনা নিয়ে পৃথিবীতে আনেন, একই পরিবেশে একই যত্ন দিয়ে মানুষ করেন এক্ষেত্রে পৃথিবীতে আগত সন্তানের কোন দোষ থাকে না। নারী হওয়ার কারণে সে সম্পত্তি সহ সর্বক্ষেত্রে পুরুষের অর্ধেক সুবিধা পাবে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে এটি অযৌক্তিক। নারী হওয়া কোন অপরাধ নয়। নারীকে মানুষ হিসেবে দেখতে হবে। সে সব রকম মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করে সুতরাং সর্বত্র তার সমান অধিকার থাকাটা একান্ত আবশ্যক। নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণার পর মৌলবাদীরা যে ভাবে উদ্ধত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তাতে মনে হয় এটি একটি অত্যন্ত অন্যায় দাবী তারা একথা ঘোষনা করে যে নারী পুরুষ কখন ও সমান অধিকার পেতে পারে না। আল্লাহই নারীর উপর পুরুষের অধিক মর্যাদা দান করেছেন। তারা জুমার নামাজের পর লাঠি সোটা নিয়ে উদ্ধত মারমুখী প্রতিবাদ ব্যক্ত করে সরকার ও মিডিয়া গুলি এক্ষেত্রে বেশ নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে। সরকার নারী উন্নয়ন নীতির গ্রহণযোগ্যতা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য দেশের মওলানা-মৌলভীদের নিয়ে বৈঠক করেন। এটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন কর্মকান্ডে লিপ্ত নারী গবেষক, চিন্তাবিদ উন্নয়ন কর্মীদের পরামর্শের চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী গোষ্ঠীর মতামতকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন এ ক্ষেত্রে একেবারে নিশ্চুপ থাকে। এক্ষেত্রে শুধু সরকারের সাথে নারী উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত মাওলানাদের (যারা ইসলামী চিন্তাবিদ নামে পরিচিত) বৈঠকের খবর বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করা হয় এবং এ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা, ধর্মীয় আলাপ আলোচনা বিটিভিতে প্রচার হয়। বিটিভির গুরুত্ব এ কারণে বেশি যে এদেশের গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র বিটিভির অনুষ্ঠান সাধারণের কাছে পৌঁছে। অন্যান্য স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল গুলির অনুষ্ঠান দেখতে হলে এ বাবদ যে মাসিক ভাড়া দিতে হয় এমন সামর্থবান

Dhaka University Institutional Repository

লোকের সংখ্যা এখন ও হাতে গোনা। কারণ মৌলিক চাহিদা মিটাতেই এখন ও অধিকাংশ জনসাধারণের হিমসিম খেতে হয়। সুতরাং নারী উন্নয়ন নীতি প্রশ্নে আলোচনা অনুষ্ঠান, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এসংক্রান্তা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিটিভিতে প্রচার হওয়া জরুরী কিন্তু বাংলাদেশ টেলিভিশন এখন ও তার চিরাচরিত নিয়মের বাইরে আসতে পারেনি। এখন ও সরকারের তাবেদারিতে এ প্রতিষ্ঠানটি ব্যস্ত। এজন্য বিটিভিকে প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসন দিতে হবে। প্রভাব মুক্ত ভাবে অনুষ্ঠান বা সংবাদ সম্প্রচার করার ক্ষমতা না পেলে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় কখন ও প্রকৃত মান সম্মত সৃষ্টিশীল অনুষ্ঠান আশা করা যায় না। মৌলবাদের আবর্তে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন অনুষ্ঠান তো এক্ষেত্রে আশা করা বাতুলতা মাত্র। তবে তথাবধায়ক সরকারের অধীনে দুর্নাতি দমন কমিশন রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের দুর্নীতির খবর যেভাবে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে তার ফলাফল এবার জনগন ভোটের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ক্রিয়াশীল প্রভাবমুক্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে পারলে উন্নয়নের পথ সুগম হয়-এটা নিশ্চিত। এবার এদেশের অধিকাংশ নারী ভোটার তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। এক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন একধাপ এগিয়ে গিয়েছে। নারী তার নিজস্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেয়েছে। ভাই তার দুর্নীতিগ্রস্থ নেতাকে ভোট দেবার জন্য বোনকে আদেশ দিচ্ছে এবং ছোট বোনটি তার বিরোধীতা করে তার স্বীয় মতামত জানিয়ে দিলে ভাইটি তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এসময় টিভি পর্দায় ভেসে ওঠে নারীর ভোটাধিকারে হস্তক্ষেপ না করার জন্য বাণী ও লেখা। সাম্প্রতিক অতীতের এ ধরণের ছোট নাটিকাগুলি এদেশের নারী সমাজের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে- এবং সে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে এবং নিজের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শিখেছে। এভাবে উন্নয়ন মূলক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান নারীদের খুব তাড়াতাড়িই প্রভাবিত করতে পারে। কারণ নারীর মধ্যে বিশ্বাস প্রবণতা ও গ্রহণ করার ক্ষমতা খুবই প্রবল। আমরা দেখতে পাই একটি অল্প বয়সী, অল্প শিক্ষিত গ্রাম্য মেয়েও শহুরে একজন উচ্চ বিত্ত পরিবারের অধিক বয়সী, উচ্চ শিক্ষিত স্বামীর সংসারে হঠাৎ এসে সম্পুর্ণ নতুন পরিবেশে নিজেকে খুব তাড়াতাড়িই মানিয়ে নিয়েছে। পরিবর্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা নারীর মধ্যে অনেক প্রবল নতুবা অসূর্যস্পর্শা নারী আজ রাষ্ট্র শাসন করতে পারত না, বৈজ্ঞানিক হতনা, কিংবা এভারেষ্টের চূড়ায়ও উঠতে পারত না। নারীর শারীরিক দুর্বলতা বা অসুবিধার দোহাই দিয়ে এতদিন তার অক্ষমতার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারণা হয়েছে। যার ফলে নারী তার নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারেনি। মৌলবাদীরা ধর্মীয় বিধিনিষেধ গুলোর যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে গিয়ে এপর্যন্ত নারীর শারীরিক গঠন ও শক্তিহীনতার দোহাই দিয়ে উন্নয়নের মূলস্রোত ধারা থেকে নারীকে সরিয়ে রেখেছে।

"এ-প্রসঙ্গে বিস্তৃত (বৈজ্ঞানিক) আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নারী করতে পারে না বা অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে এমন কোনো কাজ কি আজকের দুনিয়ায় আছে?"[৫৮]

আমাদের চারপাশে বিশেষ করে নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন শ্রেনীর মধ্যে এমন চিত্র যথেষ্টই দেখা যায়, যেখানে স্বামী পঙ্গু অথবা চিররুগ্ন। উপার্জনে অক্ষম, সাংসারিক কোন দায়-দায়িত্বই পালন করতে পারে না। স্ত্রী গায়ে-গতের খেটে বাসায় কাজ করে, ইট ভেঙ্গে বা গার্মেন্টসে চাকরি করে স্বামী ও সন্তানের প্রতিপালন করছেন। স্বামীর চিকিৎসার ব্যয়ভার তিনিই বহণ করেছেন। অথচ তারপর ও স্ত্রী স্বামীকেই তাঁর বল ভরসা জ্ঞান করেন। অনেক ক্ষেত্রে সেই স্বামীর ছোট খাট গালমন্দ এমন কি শারীরিক নিগ্রহও মুখ বুঁজে সহ্য করেন। এখানে কারণটা আসলে মানসিক বা ভাবাদর্শগত, বৃহত্তর অর্থে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির। এর বিরুদ্ধে লড়াইটাও চালাতে হবে সুতরাং ভাবাদর্শের স্তরে। সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন সমাজে নারী প্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ব্যাপারটা সহজে বা রাতারাতি ঘটে না।" [৫৯]

সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য দরকার গণমাধ্যমের জেন্ডার সংবেদনশীল প্রচার।

নারীরা পুরুষের পাশাপাশি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে, বড় বড় চাকরিও দায়িত্ব পালন করছে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে এই অধিকারের সুরক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছে। কিন্তু পরিবারে নারীর প্রতিদৃষ্টিভঙ্গির খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। এ জন্য দরকার জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়াবলী সংযোজন করা। বাংলা সমাজ বিজ্ঞান, ইংরেজী ইত্যাদি বাধ্যতা মূলক বিষয়গুলিতে জেন্ডার সংবেদনশীল পাঠ্যক্রম চালু করা যেমন ছেলে মেয়ে দুজন বই নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে,

---

[৫৮] (স্পর্টার নারীদের কথা বাদ দিলে ও) ইসলামের ইতিহাসেও রনাঙ্গন সহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সক্ষমতার কথা বলেছেন ইবনে রাশিদ ।

[৫৯] শাকিল হাসীন, 'নারী অধিকার' মৌলবাদী প্রেক্ষিত, নারী ও মৌলবাদ, প্যাপিরাস, ফেব্রুয়ারী ২০০৫, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

উভয়ই একই খেলাধুলা করছে, উভয়েই একই রকম কাজ করছে যেমন ঘরে দুজনেই বাবা-মায়ের কাজে সাহায্য করছে। দু'জনেই কম্পিউটারে কাজ করছে, দু'জনে বাগানে কিংবা ঘরে পরিচ্ছনতার কাজ করছে, দু'জনেই বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে, দুজনেই উৎসব আয়োজনে একই সাথে অংশ গ্রহণ করছে। পাঠ্যক্রমে এই রঙ্গিন ছবিগুলি সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। এতে শিশু মনে অবচেতন মনে সমানাধিকারের ছবিটি রেখাপাত করে। কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায় মা-রান্নাঘর সহ সমস্ত গৃহস্থালী কাজ করছেন, বাবা চায়ের কাপ পাশে নিয়ে কম্পিউটার কিংবা সংবাদ পত্রে চোখ বুলাচ্ছেন ছেলেটি জুতা জামা পরে বল খেলছে কিংবা সাইকেলে চড়ছে আর মেয়েটি পা ছড়িয়ে পুতুল খেলছে বা ফুলদানী সাজাজে বা মায়ের ঘর কন্যার কাজে সাহায্য করছে। মা সেলাই করছেন মেয়ে থালা বাসন গোছাচ্ছে। ছেলে কিভাবে বড় মানুষ হবে বুদ্ধি দীপ্ত হবে ইত্যাদি নানা রকম গল্প কবিতা প্রবন্ধ চিরকাল ছাপা হয়েছে। কিন্তু এখন সময় এসেছে আবশ্যিক বিষয়গুলির সাথে মেয়েদের নিয়ে গল্প, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীর অবদান সম্পর্কে লেখা গল্প, প্রবন্ধ, সামাজিক সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়াদি সংযোজন করা। গানে গল্পে নাটকে, সিনেমার মেয়েদের শুধু মাত্র প্রেয়সী, রূপবতী, রহস্যময়ী, কোমলমতি, অসহায় ইত্যাদি রূপে চিত্রায়ন না করে নারীর প্রকৃত অধিকার, সমাজে তার ভূমিকা, চেতনা জাগ্রতকারী বাণী ইত্যাদি সংযোজন করা উচিত। নারীর মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে, যে সৃজনশীলতা রয়েছে তাকে প্রকাশ করার মত পথ তৈরি করে দেয়া আবশাক এবং এ ব্যাপারে গণমাধ্যমের ভূমিকাই সর্বাধিক।

অধিকারের প্রশ্নে নারী যে মজুরী বৈষম্যের স্বীকার সে ব্যাপারে কাঙ্গালীনী সুফিয়ার 'কত কষ্ট কইরা আমি কামাই রোজগার কইয়া আনি'- গানটির পর যে বাণী প্রচার হয় সেটি ও প্রানিধান যোগ্য।

আবার 'সৌদর্য্যই শক্তি' জাতীয় বিজ্ঞাপন নারীর মানবিক গুনাবলীর অবমূল্যায়ন করে। পন্যের বাজার সৃষ্টি করতে গিয়ে নারীর অবমূল্যায়ন কোন রকমেই কাম্য নয়। শিক্ষাই শক্তি, জ্ঞানই শক্তি, দক্ষতাই শক্তি, ইত্যাদি বাণী বিজ্ঞাপনের সাথে সংযুক্ত হলে নারী উন্নয়ন তরান্বিত হয়। কদুর তেল মেখে মেয়ের পরীক্ষায় ১ম হওয়ার মত হাস্যকর বাণী গণমাধ্যমকে আধুনিকতা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে পিছিয়ে দিচ্ছে। 'পুরুষ আবার অভাগা হয় কেমনে? গতরটাই হইল

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ মানুষের আসল' .... মেয়ে মানুষ যত শিক্ষিতই হোক সারাজীবন পুরুষের কাছে মাথা নত করে চলতে হয়-এ ধরণের সংলাপ চলচ্চিত্র থেকে বাদ দিয়ে নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের মানবিক গুনকে বড় করে তুলে ধরতে হবে। চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে জ্ঞানী গুণি ব্যক্তির সমাহার ঘটাতে হবে। গল্প নাটক, চলচ্চিত্র গুলিতে পুরুষ ক্রোধে তার প্রেয়সীকে চড় মারে, আবার পর মূহূর্তে আবেগে আলিঙ্গন করে, এধরণের নারীর প্রতি অবমাননাকর দৃশ্য তুলে দেয়া আবশ্যক। আর ভবিষ্যতে যেন এ ধরণের ভাল গল্প উপন্যাস বাছাই করে জেন্ডার সংবেদনশীল নাটক, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন প্রচার করা একান্ত জরুরী। কর্মক্ষেত্রে নারী যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়, নারীর সন্তান পালনের ক্ষেত্রে পিতার অংশগ্রহণ, সন্তান জন্মালে মায়ের প্রথম চারমাস ছুটির পাশাপাশি বাবাদের ও নির্দিষ্ট সময়ে ছুটি বরাদ্দ করে (সন্তানের দেখা শুনার জন্য) সরকারী পর্যায়ে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা প্রয়োজন। এছাড়া শহরের ছাত্রী বা চাকুরীজীবী মায়েদের সন্তান দেখাশুনার জন্য সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ে শিশু পালন কেন্দ্র, ডে কেয়ার সেন্টার বা দিবা যত্ন কেন্দ্র খোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো একান্ত জরুরী। এ ছাড়া উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে চাকুরীজীবীরা সন্তানের মায়েদের অসুবিধাসমূহ বিবেচনা করে তাদের বয়স সীমার ক্ষেত্রে নূন্যতম ৫/১০ বছর ছাড় দেয়া উচিত। এ সংক্রান্ত লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপানোর মাধ্যমে আমাদের সমাজে নারীর বিভিন্নমুখী প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে সচেতন করে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নারী উন্নয়নের পথ সুগম করা উচিত। একই পরিবারে মা-বাবা যে কারুর মৃত্যু বা অনুপস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রী (ভাই-বোন) উভয়ের সাংসারিক কাজ সমাজ কর্তব্য পালন করার মত প্রচার প্রচারণা চালান একান্ত জরুরী।

আমাদের নাটক-সিনেমা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে যে বাঙালি নারীর জন্য অতি সহজ (এবং কোন ব্যাপারই না বা স্বাভাবিক প্রকৃতির) সে কাজটি সংসারের পুরুষ মানুষটি পরনে তাকে অতি কষ্টকর, জটিল এবং কঠিন কাজ হিসেবে (পুরুষের জন্য) প্রচার করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে সন্তান লালন বা সাংসারিক দায়িত্ব পালনের অজুহাত দেখিয়ে সুন্দরী যুবতী নারীর সঙ্গে তার ভালবাসা বিয়ে ইত্যাদি দেখানোর প্রবণতা দেখা যায়। আবার বিধবা নারীর জীবনের দুঃখ

Dhaka University Institutional Repository

দুর্দশা প্রচার করলেও সে ক্ষেত্রে তার নতুন ঘর কিংবা বর নির্বাচনে খুব একটা উৎসাহিত করা হয় না। এটাই তার নিয়তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সামাজিক পরিবর্তনের ধারাটি এসে এখানে থমকে গিয়েছে। গণমাধ্যমে ডিভোর্স বা বিধবা নারীর অসুবিধা গুলি তুলে ধরে সেগুলির সমাধানের পথসমূহ বাৎলে দিলে পারে।

দেশের ৪৭% নারী গৃহে অত্যাচারিত এধরণের প্রচারের পাশাপাশি অত্যাচারী স্বামীদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে তাদের শাস্তি দেওয়ার বিধান রাখতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ৯৯৯ জাতীয় হেল্পলাইন চালু করার প্রয়োজনীয়তাকে গণমাধ্যমের মাধ্যমে সমাজের ও সরকারের সামনে তুলে ধরতে হবে।

স্বামীর অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য না করে আইনের সাহায্য নিতে নারীকে উৎসাহিত করতে হবে। স্বামীর বদ অভ্যাস ও অসৎচরিত্র আত্নসম্মান রক্ষার্থে অনেক উচ্চশিক্ষিত চাকুরীজীবী নারী প্রকাশ করতে চান না এটি মোটেই ঠিক কথা নয়। এ ধরণের প্রবণতা নারীর প্রতি পুরুষের সহিংসতাকে উৎসাহিত করে। সুতরাং গণমাধ্যমের সাহায্যে নারীকে পুরুষের অসাধু চরিত্রের বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে হবে। এসিড সন্ত্রাসীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড এ ধরণের প্রচার নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। নারীর সম্মান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি অধিকার রক্ষায় গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রচার প্রচারনাই নারী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

৫.৩ রাজনীতিতে নারী ও গণমাধ্যম

আমাদের সমাজের সার্বিক লিঙ্গ অসমতার প্রতিফলন রাজনীতিতে নারীর অবস্থানকে আরও পিছিয়ে দিয়েছে। সমাজের অন্যান্য পরিসরের তুলনায় এ দেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ আরও সীমিত। নারীর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে যে অধস্তনতার বীজ লুকিয়ে আছে তা নারীকে রাজনীতি থেকে বহুগুণ দূরে রাখে যা এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সুস্পষ্টরূপে আমাদের সামনে ভেসে উঠে। বৃটিশ ভারতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন ইত্যাদি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও নারীর ব্যাপক

অংশগ্রহণ কম দেখা যায়। এক্ষেত্রে নারীর পরোক্ষ সমর্থন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা করা ইত্যাদি বেশী ছিল। তবে কিছু শিক্ষিত তরুনীর সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল লক্ষনীয়। ভারতীয় কংগ্রেসের মত মুসলিম লীগের পদসোপানে কোন মহিলার স্থান ছিল না। অবশ্য এই দলের একটি মহিলা অংগ সংগঠন ছিল এবং তা প্রধানত নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের পক্ষে নারীর ভোট সংগ্রহের প্রচেষ্টা পর্যন্তই সীমিত ছিল। সে সব সংগঠন নারীর অধিকার রক্ষা বা প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কর্মকান্ড বা সক্রিয় চিন্তাভাবনা করলেও এ ধরণের কোন প্রচেষ্টাও তাদের মধ্যে ছিল না। পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীতে খুব কম সংখ্যক মহিলাই যোগদান করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতাউত্তর নারীদের মধ্যে কিছুটা রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করা গেলেও তা পরিবারতন্ত্র বা কিছু সংখ্যক পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজনীতির মাধ্যমে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা পালনের সুযোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে মুখ্যভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের রাজনীতিতে নারীর সীমিত অংশগ্রহণ, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গৌন অবস্থান নারী উন্নয়নকে ততটা কার্যকর করে না বলে সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাঁধা গ্রস্থ হয়। যদিও আমাদের দেশের দু'টি শক্তিশালী দলের প্রধান নেতা-দুজন নারী-তবু পুরুষ তান্ত্রিকতার রাজনীতি চর্চার ফলে সে আবর্তেই তারা আবর্তিত হচ্ছেন।

বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের জন্য ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার বা রাজনৈতিক দল করার অধিকার লিপিবদ্ধ রয়েছে। নারীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের কথা চিন্তা করে সংবিধান প্রণেতাগন জাতীয় সংসদে ১৫টি আসন সংরক্ষণের বিধান রাখেন। জাতীয় সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ এই ১৫জন মহিলা সদস্যকে নির্বাচিত করেন। এই ব্যবস্থা দশ বছর বলবৎ থাকার কথা বলা হয়। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০ এ উন্নীত করা হয়। এবং সময়সীমা ১০ থেকে ১৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া নারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকাল্পে সরকার ১৯৭৬ এবং ১৯৭৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদে ২জন মনোনীত মহিলা। সদস্যার বিধান করে সরকার মহিলা সদস্যার সংখ্যা ১৯৮২ সালে ২ থেকে ৩ জনে বর্ধিত করে এবং ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

সালে উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভায় মহিলা মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা ৩ জনে নির্ধারিত করে।

বাংলাদেশের সংবিধানে পুরুষ ও নারীর সমান রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান করা হলে ও বাস্তবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বা ভূমিকা খুবই সীমিত। অধিকাংশ পরিবার আজকাল মেয়েদের শিক্ষা দানে সম্মত হলেও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণকে সহজে মেনে নিতে পারে না। মেয়েকে শিক্ষা দিয়ে একটি ভাল পাত্রের কাছে বিয়ে দেয়া বা একটি ভাল চাকুরী করাটাকে এদেশের পিতামাতাগণ নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। অনেকে আবার রাজনীতিতে মেয়েদের অংশ গ্রহণকে বেলেল্লাপনা হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। কেউ কেউ মেয়ে রাজনীতি করবে না, মিছিল মিটিং করে সময় অসময়, রাত বিরেতে বাড়ী ফিরবে সেটি মোটেই ভাল চোখে দেখেন না। আবার অনেকে মনে করেন ঘরের বউ রাজনীতি করে বেড়ালে ঘর সংসার উচ্ছন্নে যাবে। আবার এ পর্যন্ত আমাদের দেশে সে সব নারীকে রাজনীতিতে আসতে দেখা গেছে তারা কোন নো কোন ভাবে পরিবারের পুরুষ সদস্যের রাজনৈতিক অবস্থানকে ব্যবহার করে এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। পিতা, স্বামী ভাই বা অন্য কোন সদস্যের রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে বলে নিজস্ব কোন প্রভাব খাটাতে পারে না বা সে ধরনের কোন পরিবেশ ও তারা পায় না। নীতি নির্ধারণে ও তারা সরাসরি কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এখন ও বাংলাদেশে রাজনৈতিক অংগনে মহিলারা কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব পরিচয় নিয়ে অবতীর্ন হতে পারেন নি। যেমন সাজেদা চৌধুরী ও মতিয়া চৌধুরী, শিরিন আক্তার প্রমূখ কিছু কিছু নেত্রী স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয়।

সামাজিক মূল্যবোধ, পারিবারিক ঐতিহ্য ইত্যাদি কারণে আমাদের দেশের মেধাবী, উচ্চ শিক্ষিত মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে চান না। এ পর্যন্ত সংরক্ষিত মহিলা আসনে যারা সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁদের অধিকাংশই আধা শিক্ষিত কিংবা স্বল্প শিক্ষিত। তাদের মধ্যে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব নারীর প্রতিচ্ছবি ও খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। সংসদে তাদের বক্তৃতা দান কিংবা স্বীয় দলে তাদের ভূমিকা কিংবা নিয়ন্ত্রণ খুবই হতাশা ব্যঞ্জক।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতা হচ্ছে এই যে পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব অপর্যাপ্ত, যা তাদের অ-সম অবস্থানের চিত্রকে ব্যাপক করে তোলে। রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ন্যায্যতা স্থাপনের জন্য জরুরি হলেও-পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে সার্বিকভাবে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থানের ধারাবাহিতায় রাজনীতিতে নারীর স্বল্প উপস্থিতি লিঙ্গ বৈষম্য দুরীকরণের সম্ভাবনাকে আরও দূরবর্তী করে তোলে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই রাজনীতিতে নারীর প্রবেশগম্যতা মর্যাদা বা প্রভাব পুরুষের সমকক্ষ নয় এবং ক্ষমতার প্লাটফর্মে এই অসমতাই নারী পুরুষের বৈষম্যের অন্যতম মূল কারণ বলে মনে করা যেতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে নারী রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় অদক্ষ। শ্রীলঙ্কার শ্রীমাভো বন্দর নায়েকে, ভারতের ইন্দিরা গান্ধি, ইসরাইলের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামায়ার, পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো, শ্রীলংকার চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা, বৃটেনের মাগারেট থেচার সহ একালের আমেরিকার হিলারী ক্লিনটন সবাই প্রশ্নাতীতভাবে রাজনীতিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন।

নারীরা তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল। কিন্তু যদি রাজনীতিতে যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তাহলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। আর দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সবল উপস্থিতি অতি আবশ্যক ।

এদেশে ক্ষমতার দুই প্রধান বলয় হচ্ছে রাজনৈতিক দল ও জাতীয় সংসদ রাজনৈতিক দলের সভা বা মিছিলের একেবারে সামনের সারিতে নারীদের ব্যাপক হারে দেখা গেলে ও এবং পুলিশের নির্মম দমন পীড়নের শিকার হিসেবে পত্রিকার প্রথম পাতায় তাদের ছবি ছাপা হলেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ একেবারেই গৌণ। সংসদে যেমন, তেমনি মন্ত্রিপরিষদ, প্রশাসন এবং বিচার বিভাগের উচ্চ পদেও নারীর উপস্থিতি অনুল্লেখ্য। রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক কাঠামোতেই নারীরা চরমভাবে অবহেলিত। "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী সমাজের অবস্থান অপেক্ষা কৃত ভালো হলেও তা নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। তারপরও বলা যায় পাঁচ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকারে।

Dhaka University Institutional Repository

এক তৃতীংশ আসনে নারীদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি তৃনমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের দ্বার উম্মোচন করেছে। এখন জাতীয় পর্যায়েও এ ধরণের পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে নারীর ৩৩ শতাংশ অংশগ্রহণের দাবিটি বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে।”[৬০]

সংসদ ও রাজনৈতিক দলে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সংসদ থেকে সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে নারীর জন্য এক তৃতীয়াংশ আসনে শুধু নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন- যেখানে নারী ইচ্ছে করলে সাধারণ আসনের জন্য পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। এ ধরণের সংস্কারের প্রশ্নে কোন রাজনৈতিক বাধা নেই, বাধা যদি কিছু থেকে থাকে সেটা পুরুষতান্ত্রের বাধা। এ ধরণের একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে চলে আসে যে, নেতৃত্বে আসার মতো যোগ্য নারী কর্মী পাওয়া যায় না। কিন্তু বাস্তবতা হল এই যে নারীদের যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট সুযোগ কিংবা পরিবেশ দেওয়া হয় না।

“রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনতে হলে একদিকে যেমন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে এবং নির্বাচনের সময় প্রার্থী মনোনয়নে এক তৃতীয়াংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে, অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে ও যথেষ্ট নারী বান্ধব করে ঢেলে সাজাতে হবে। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীর যেন কোন ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের কোন ভাবেই অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড় করানো যাবে না।”[৬১]

গনমাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের গুরুত্ব তুলে ধরে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা হলে নারী রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠবে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলে এদেশের রাজনীতি কখন ও নারী বান্ধব হয়ে উঠতে পারবে না বা পূণগণতান্ত্রিকতার স্বাদ পাবে না। “২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১হাজার ৯৩৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪০টি আসনে ৩২জন নারী অংশ নিয়ে মাত্র ৬টি আসন লাভ

[৬০] সম্পাদকীয়, 'নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের স্বার্থে নির্বাচনী সংস্কার প্রয়োজন', উন্নয়ন পদক্ষেপ চতুর্দশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা এপ্রিল ২০০৮ পৃ: ২।
[৬১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। বড় বড় দলগুলো মাত্র ২৯টি আসনে ১৯জন নারীকে মনোয়ন দিয়েছে। এছাড়া খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা ও রওশন এরশাদ যথাক্রমে ৫টি ৫টি ও৩টি আসনে নির্বাচন করেছেন। সর্বশেষ জাতীয় সংসদে তাই নারী সাংসদের সংখ্যা ছিলো মাত্র ৬ জন। অর্থাৎ ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ২ ভাগ ছিলো নারী। পরে অবশ্য ৮ম জাতীয় সংসদের মেয়াদ কালের একেবারে শেষদিকে সংরক্ষিত নারী আসনের মাধ্যমে আরো ৪৫জন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু এই নারী এমপিরা জনগণের ভোটে নয়, সংসদে সরকারি দলের সমর্থনে মনোনীত হন। ফলে তারা ছিলেন ক্ষমতাহীন নারী এমপি।"[৬২]

রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীদের অবস্থান অত্যন্ত নগন্য আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রেসিডিয়ামে শেখ হাসিনা ছাড়া রয়েছেন আরো ৩জন নারী। সম্পাদক মন্ডলীর ৩১ সদস্যের মধ্যে নারী আছেন ৩জন। ৭৩ জনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী রয়েছেন ৮ জন। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে নারীর অবস্থান তুলনা মূলক ভালো।

বি এন পির ১৫ সদস্য বিশিষ্ট্য জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে খালেদা জিয়া ছাড়া আর কোন নারী নেই। দলের ২৫১ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে নারী হলো মাত্র ১২জন। জাতীয় পার্টির ৩০৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীর সংখ্যা ৯জন এবং ৪১ সদস্যের প্রেসিডিয়ামে মাত্র ১জন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে নারীর সংখ্যা ৫জন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারী আছেন ৪জন "[৬৩]
ওয়ার্কাস পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারী আছেন ২জন।
জামায়াতের ইসলামী কেন্দ্রীয়কমিটিতে নারীদের কোন স্থান নেই।
রাজনৈতিক দল গুলিতে নারীদের এই নূন্যতম অংশ গ্রহণ টেকসই উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। নারীর এই সংখ্যা স্বল্পতার জন্য নারীকে খুব একটা দায়ী করা যায় না। কারণ এদেশের আর্থ সামাজিক ও পরিপার্শ্বিক পরিবেশ নারীকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে

[৬২] সূত্র বিভুরঞ্জন সরকার, 'রাজনৈতিক দলের ঘোষণা পত্র ও নির্বাচনী ইশতেহার বিবেচনার জন্য প্রস্তাবনা' উন্নয়ন পদক্ষেপ, পৃঃ ২৩।
[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

নিরাৎসাহিত করে। ফাতোয়াবাজী, মৌলবাদ কু-সংস্কার ইত্যাদি নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে সবচেয়ে বড় বাঁধা। কিন্তু পরিবেশ পেলে এদেশের নারীরা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক ভাবে অংশ গ্রহণে আগ্রহী হবে এ কথা নিশ্চিত করে চলা যায় এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক ভাবে নারীর ভোট কেন্দ্রে আগমন ও ভোট প্রদান। সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রচার প্রচারণার ফলে নারীরা নিশ্চিন্ত মনে দলে দলে ভোট কেন্দ্রে এসে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। এতে বোঝা যায় গণমাধ্যমগুলি ইতিবাচক সাড়া দিলে নারীরা অবশ্যই রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠতে পারে। নবম জাতীয় সংসদের সরকারী দলের মন্ত্রীসভায় এবারই সর্বাধিক সংখ্যক ৫ জন নারী সদস্য মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন। পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন দু'জন নারী মন্ত্রী। আবার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে নিয়েছেন। এবার জনসাধারণের ব্যাপক আশা নতুনত্বের ও পরিবর্তনের যে সূচনা নবম জাতীয় সংসদের জন্ম লগ্নে আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে-তা সঠিক পথে পরিচালিত হলে নারী উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

অপেক্ষাকৃত তরুনদের সমন্বয়ে গঠিত এ মন্ত্রী সভায় দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেহেতু এটি একটি পুরান রাজনৈতিক দল এবং মৌলবাদের প্রভাব মুক্ত সুতরাং এ সরকারের আমলে নারীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড আরও বেগবান হবে বলে জনমনে ব্যাপক আশার সঞ্চার হয়েছে। এ ব্যাপারে গণমাধ্যমগুলি যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারলে টেকসই উন্নয়ন তথা নারী উন্নয়ন তরান্বিত হবে, এ আশা সকল গণতন্ত্রকামী মানুষের মনে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয়েছে।

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিবর্তন করে গণতন্ত্রের সঠিক পরিবর্তন আনতে হলে রাজনীতিতে নারীর ৫০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। যেহেতু এখনও এ ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা বিরাজমান তাই আপাতত ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্বের দাবীটির কার্যকারিতা এখনই শুরু হওয়া উচিত। রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর সমান অংশীদারিত্ব না থাকার কারণে যথেষ্ট মেধা ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও নারী আজও জাতীয় জীবনের সর্বত্র প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে না।

Dhaka University Institutional Repository

আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নারী ভিসিকে দেখা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে কোন নারী সদস্য নেই (অবশ্য অতি সম্প্রতি একজন নারী সদস্য ইউজিসি তে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন), প্রতিবারই কেয়ারটেকার সরকারে দু'একজন নারী উপদেষ্টার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তবে এখন সময় এসেছে জাতীয় জীবনের সর্বত্র নারীদের সমান অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা। এ ব্যাপারে গণ মাধ্যমগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সংবাদ মাধ্যমে নারী

৬.১ নারী উন্নয়ন ও সংবাদপত্র
৬.২ সাধারণভাবে সংবাদপত্রে নারীকে যেরূপে দেখা যায়
৬.২.১ বাংলাদেশের সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ ও নারীর রূপায়নঃ গবেষণার আলোকে
৬.৩ সংবাদ মাধ্যমে নারীর ইমেজ ও নারী অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে না পারলে নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সে প্রচেষ্টা একটি সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে বিচ্যুত করে দিতে পারে। আজ বিশ্বব্যাপী তাই নারী উন্নয়নের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। আমরা জানি এ লক্ষ্য অর্জণের জন্য মিডিয়া হল সবচেয়ে প্রভাবশালী মাধ্যম। উন্নয়নের ক্ষেত্রে মিডিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। মিডিয়া বলতে সংবাদ মাধ্যম সহ সকল গণমাধ্যমকে বুঝানো হয়। গবেষণার এ পর্যায়ে সংবাদ মাধ্যমের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে।

৬. সংবাদ মাধ্যমে নারী ঃ যুগে যুগে নারী-পুরুষের যৌথ উদ্যোগে মানব সমাজ বিকশিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কারো অবদানই কারোর চেয়ে কিছু কম নয় কিংবা কারোর অবদানকেই খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। তবে বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, দুর্ভাগ্যজনক ভাবে নারীর অবদানকে খাটো করে এবং পুরুষের অবদানকে বড় এবং মহিয়ান করে উপস্থাপন করার একটা প্রবনতা বা প্রয়াস সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এ ক্ষেত্রে পুরুষের অন্যায়কে পুরুষসুলভ আচরন হিসেবে চালিয়ে দেবার জন্য পুরুষ মানুষ একটু আধটু এরকম করতে পারে" - জাতীয় একটা সামাজিক মতাদর্শ ও পুরুষতান্ত্রিক এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করে রেখেছে বহুযুগ ধরে, যার ধারক ও বাহক নারী পুরুষ উভয়েই।

ইতোপূর্বে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া আলোচনার ক্ষেত্রে একটি মেয়ে শিশু কিভাবে 'নারী' হয়ে ওঠে এবং একটি ছেলে শিশু কিভাবে পুরুষ হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অন্য প্রাণীর চাইতে মানুষের কিছুটা পার্থক্য হল যে মানব শিশুকে দিনে দিনে সকল মানবিক গুনাবলি নিয়ে সামাজিক জীব হিসেবে সুন্দরভাবে বিকশিত করে তুলতে হয়। সে যদি জঙ্গলে পশুদের মধ্যে বড় হয় তবে তার মধ্যে মানবিক গুনাবলী গড়ে না উঠে শিকার ধরার কৌশল রপ্ত করার গুনাবলী বিকশিত হবে। আমরা এও জানি বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজেই শিশুর মধ্যে এই ভিন্নতা তৈরী করে। পুরুষদের শেখায় পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে তথা গোটা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করতে, শেখায় তাদের 'পুরুষ' হতে মানুষ নয়। আর নারী ধীরে ধীরে উনমানব বা নারী হয়ে ওঠে যে পূর্ণ মানব হিসেবে সমাজের কাছে সহজে স্বীকৃত হয়না। সমাজের এই অস্বীকৃতি ও গঠন প্রক্রিয়া তাকে অধস্তন এবং দুর্বল

Dhaka University Institutional Repository

মানসিক শক্তি সম্পন্ন একজন 'নারী' হিসেবে গড়ে তোলে। কিন্তু সমাজে তার অবদান তো কিছু মাত্র কমই নয় বরঞ্চ নারী হিসেবে আর একটু বেশি; আর তা হল স্বীয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানব জাতির প্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখছে। এই বিশেষ শক্তি শুধু তারই আছে যাকে এত দিন পুরুষতন্ত্র তার দুর্বলতা হিসেবে রটিয়ে এসেছে। এর পিছনে যে গূঢ় সত্য লুকিয়ে আছে তা হল পুরুষ নারীর এই বিশেষ শক্তির ক্ষেত্রে নিজের অপারগতাকে অস্বীকার করার প্রয়াস হিসেবে নারী অবদমন প্রক্রিয়াটি বেছে নিয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় গোটা সমাজ ব্যবস্থাকেই পুরুষতন্ত্র মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে যার ফাঁদে নারী ও পা দিয়েছে। এই সামাজিক মতাদর্শে নারীও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে মূল সত্য -নারীর শক্তি ও তার অন্তর্নিহিত গঠন শক্তি।

সমাজের এই প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাৎপদ চিন্তা-চেতনায় আছন্ন সেই সত্যকে আজ উদ্ধার করতে হবে। কারণ মূল সত্য থেকে সরে গিয়ে কখনও সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, আর সমস্যাকে জিইয়ে রেখে কখনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর সত্য উদ্ধারের এ কাজটির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে গণমাধ্যম বা মিডিয়া। কিন্তু এই মিডিয়া বা গণমাধ্যমের পরিচালনায় আছে এ সমাজেরই মানুষেরা। যারা অনেকেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে এখনও পশ্চাৎপদ মানসিকতার প্রতিভূ এবং পূরোটাই পুরুষতান্ত্রিক। পুরুষ তান্ত্রিকতার এই কাঠামোর মধ্যে মিডিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের প্রশ্নটিও আমাদের সামনে চলে আসে। নারীরাও পুরুষের সাথে সাথে জ্ঞানে-অজ্ঞানে পুরুষতান্ত্রিকতাকে লালন করছে-তাদের চিন্তায় চেতনায় পুরুষ প্রাধান্যের দৃষ্টি ভঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটায় নিজ সত্তার বিকাশে পিছিয়ে পড়েছে। এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন সামাজিক চিন্তা নারীকে দুষ্ট করেছে অতীতেও আজও।

এখন সমাজের বোদ্ধা শ্রেণীর কাজ হচ্ছে উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং এ অধিকার রক্ষায় নারী-পুরুষ উভয়কে সত্যান্বেষী করে তোলা, নারীকে অধিকার সচেতন করে তোলা। এ কাজে সাহায্য করতে পারে নারী বান্ধব মিডিয়া বা গণমাধ্যম। এ পর্যায়ে মূলত সংবাদ মাধ্যমের কথা আলোচনা করা হয়েছে যেখানে নারীর প্রতিনিধিত্ব বা অংশগ্রহণ জরুরী।

"সংবাদ মাধ্যমে জেন্ডার বিষয়ক যতগুলো গবেষনা সারা পৃথিবীতে হয়েছে তার মধ্যে বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষন প্রকল্পটি (জি এম পিপি) সবচেয়ে ব্যাপক পরিসরের। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত তিন বার এ ধরনের পরিবীক্ষন কার্যক্রম পরিচালিত হলো। জেন্ডার সমতা আনায়নে গণমাধ্যমের যে দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে, সেটিকে তুলে ধরার জন্যই এই

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগ শুরু। দুনিয়াজুড়ে একদিনের সংবাদ মাধ্যমে নারীর উপস্থাপন ও অংশগ্রহণ দেখাবার এই প্রচেষ্টার প্রথম পরিকল্পনা করা হয় ১৯৯৪ সালে, ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত 'নারী যোগাযোগকে ক্ষমতাশীল করছে' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। এরই ধারাবাহিকতায় গণমাধ্যম পরিবীক্ষণে পতিকৃৎ প্রতিষ্ঠান 'মিডিয়া ওয়াচ' (কানাডা) ১৯৯৫ সালের ১৮ জানুয়ারী প্রথম বিশ্ব পরিবীক্ষণ সমন্বয় করে। ৭১ টি দেশের অংশগ্রহণে সাধিত এই পরিবীক্ষনের ফলাফল বেইজিং নারী ফোরামে হাজির করা হয়। সে বৎসরই চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গণমাধ্যম পরিবীক্ষনকে পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনায় স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘ। এর পাঁচ বৎসর পর ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অফ ক্রিশ্চিয়ান কম্যুনিকেশন (ডব্লিউ এ সিসি) 'র উদ্যোগে দ্বিতীয় বিশ্বপরিবীক্ষনটি অনুষ্ঠিত হয় ২০০০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এবং সর্বশেষটি ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বের আরও ৭৬ টি দেশের মানুষের সাথে এবার বাংলাদেশ থেকে জেন্ডার ইন মিডিয়া ফোরাম এই পরিবীক্ষনে অংশগ্রহণ করে। বরাবরের মতোই এই পরিবীক্ষনের লক্ষ্য ছিলো সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও বেতারে পরিবেশিত সংবাদে নারীও পুরুষ কিভাবে উপস্থাপিত হয় এবং সংবাদ রচনায় তারা কতটুকু অংশগ্রহণ করে সেটি দেখা। আগের পরিবীক্ষণগুলোর ফলাফল যেমন মানুষকে বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমে নারীর প্রান্তিক উপস্থিতির বিষয়টি বুঝতে সহায়তা করেছে তেমনি সহায়তা করেছে বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হতে বা নীতিমালা তৈরীতে। বিশ্বে যারা জেন্ডার সমতার প্রশ্নে গণমাধ্যম নিয়ে কাজ করছেন, বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষন প্রকল্প (জি এম এমপি) তাদের জন্য তৈরী করে দিয়েছে নেটওয়ার্ক সরবরাহ করেছে পরিবীক্ষনের হাতিয়ার।"[১]

লক্ষনীয় বিষয় হলো, মিডিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরে নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম। "দেশের জাতীয় পর্যায়ের সবগুলো দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, সাময়িকী মিলিয়ে এই সংখ্যা হাতে গোনা ৪ জন। বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো আত্মপ্রকাশের পর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নারীদের অংগ্রহণ বেড়েছে। কিন্তু রিপোর্টিং এ মেয়েদের সংখ্যা এখনো অনেক কম। নারী রিপোর্টারের চাইতে নারী উপস্থাপকের সংখ্যা বেশি। ধারণা করা হয়, 'নারী' বলেই ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় উপস্থাপক পদে মেয়েদের বেশি নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ বেতারে মোট পদের সংখ্যা ২৬৮৯। কিন্তু মাত্র ৩২টি পদে নারীরা রয়েছেন, যার শতকরা হার ১% এর চাইতেও কম। পর্যালোচনায় এটাই বোঝা যায়, সংবাদ মাধ্যমে নারীর

---

[১] বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০০৫ এর বাংলাদেশ প্রতিবেদন 'সংবাদ নির্মাণ করে কে?' জেন্ডার ইন মিডিয়া ফোরাম।

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণের হার এখনো খুবই কম। এ অবস্থা বদলানো প্রয়োজন। ....সংবাদ মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহন পরিস্থিতি ছাড়াও আরো একটি দিক আলোচনা করার রয়েছে তাহলো মিডিয়ায় বিশেষ করে সংবাদ মাধ্যমে নারীকে কীভাবে প্রতিফলিত করা হচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে নারীকে নেতিবাচকভাবে সংবাদপত্র ও টিভিতে প্রতিফলিত করা হচ্ছে।” [২]

“ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব ক্রিস্টিয়ান চার্চেস (WACC) নামের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন একটি বৈশ্বিক মিডিয়া মনিটরিং প্রকল্পের আওতায় ২০০০ সালে ১ ফেব্রুয়ারি ৭০টি দেশের শত শত অংশগ্রহণকারীর সহায়তায় নারীও মিডিয়া এলাকায় যে তথ্যগুলো প্রকাশ করে সে গুলো এরকম ঃ

- ❖ বিশ্বের ৪১% উপস্থাপক ও রিপোর্টার হলো নারী কিন্তু মাত্র ১৮% সংবাদে নারীকে দেখা যায়। নারীর অংশগ্রহণ যথেষ্ট হলেও নিউজ-আইটেম হিসেবে তাকে কমই দেখা যায়।
- ❖ নারী বিষয়ক সংবাদের উল্লেখযোগ্য অংশে (১৯%) সে নির্যাতনের শিকার হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু পুরুষ বিষয়ক সংবাদের মাত্র ৭% নির্যাতন সংক্রান্ত।
- ❖ টিভি সংবাদ উপস্থাপকদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্টই হলো নারী (৫৬%), কিন্তু রেডিও - রিপোর্টারদের ২৮% এবং সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের ২৬% হলো নারী। অর্থাৎ টেলিভিশন ভিস্যুয়াল মিডিয়া হবার কারনে নারীমুখ এখানে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- ❖ টিভি-সংবাদ-উপস্থাপকদের মধ্যে যারা নারী, তাদের সবচেয়ে যে বয়সসীমায় বেশি দেখা যায় তা হলো ২০-৩৪। আর ৫০ এর পর থেকে তারা অদৃশ্য হতে থাকে। তাই বলা যায়, টেলিভিশনের উপস্থাপনায় চাকরির ক্ষেত্রে তারা নিষ্ঠুরভাবে পুরুষতন্ত্রের শিকার হয়।
- ❖ শিল্প ও বিনোদন বিষয়ক সংবাদে (৩৫%) এবং সেলিব্রেটি বিষয়ক সংবাদে (২৬%) নারীকে ব্যাপক মাত্রায় দেখা যায়। কিন্তু রাজনীতি (১২%), আন্তর্জাতিক সংকট (১১%) বা জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক (৬%) সংবাদে তাকে খুব কমই দেখা যায়।

---

[২] নাসিমূল আরা হক মিনু, সংবাদ মাধ্যমে নারীর অধিকার, উন্নয়ন পদক্ষেপ, এপ্রিল ২০০৭, পৃ.৪।

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ নিউজ আইটেম হিসেবে নারীকে কম দেখা গেলেও প্রকাশিত ছবিতে তাকে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি দেখা যায়। ২৫% নিউজ-আইটেমের ছবিতে নারীকে দেখা যায় কিন্তু পুরুষকে এক্ষেত্রে দেখা যায় মাত্র ১১%।

পরিসংখ্যানগুলো প্রকাশ করে সমাজ নারীকে যেভাবে দেখে (সৌন্দর্য ও যৌনসামগ্রী, অধস্তন, দুর্বল ইত্যাদি) মিডিয়ায় ও তাকে সেভাবেই উপস্থাপন করা হয়।"[৩]

গণমাধ্যম ইতিবাচকরূপে আবির্ভূত বা উপস্থাপিত হওয়া নারীর জন্য আবশ্যক এবং এটা তার অধিকার । তার এ অধিকার সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করা হয় না। বরঞ্চ বিভিন্ন সময় নারীর মর্যাদা হানিকর রূপকে সংবাদ মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় এ ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষন এর জন্য "২০০৫ এর শুরুতে ডব্লিউ এ সি সি'র পাঠানো নির্দেশবলীও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি আত্মস্থ করে কার্য-কৌশল নির্ধারন করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় পরিবীক্ষণের মহড়া। অধ্যায় বিশ্লেষণ সম্পর্কে পূর্বে অভিজ্ঞতা আছে এমন পরিবীক্ষকরাই দলে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি সম্পন্ন হয় মূল পরিবীক্ষণ।"[৪]

<u>পরিবীক্ষণ পরিধি ঃ</u> প্রচার সংখ্যা, মালিকানার ধরন, রাজনৈতিক ঝোঁক, পাঠকের বিভিন্নতা ইত্যাদি প্রশ্ন বিচার করে বেছে নেয়া হয়েছিলো ছয়টি দৈনিক পত্রিকা, এর মধ্যে পাঁচটি ঢাকা থেকে এবং একটি খুলনা থেকে প্রকাশিত। এ গুলো হলো-দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক পূর্বাঞ্চল এবং দি ডেইলি ষ্টার। পত্রিকাগুলোর প্রথম ও শেষ পাতা থেকে ১২টি করে সংবাদের অধ্যায় বিশ্লেষণ করা হযছে। টেলিভিশন চ্যানেলের ভেতর থেকে নেওয়া হয়েছে বিটিভি, এটি এন এবং চ্যানেল আইয়ের রাতের মূল সংবাদ। বেতারের ক্ষেত্রে একমাত্র সংবাদ পরিবেশকারী বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা কেন্দ্রকে বাছাই করা হয়। টেলিভিশন, বেতার ও সংবাদপত্র মিলিয়ে মোট ১২০টি সংবাদ পরিবীক্ষনের আওতাভুক্ত হয়। এই সংবাদগুলোর তথ্যসূত্র, উপস্থাপক এবং প্রতিবেদক হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন ২৬৯ জন মানুষ। আর বিশ্ব-ব্যাপী ৭৬টি দেশের ৩৯ হাজার ৯৪৪ জন মানুষ সংবাদের মাধ্যমে এ পরিবীক্ষনের আওতায় বা প্রতিবেদনে আসেন,

[৩] ফাহমিদুল হক, 'সমাজ, নারী ও মিডিয়া আন্তঃসম্পর্ক, মিডিয়া ও নারী, স্টেপস্ টুয়াউস্ ডেভেলপমেন্ট. পৃ. ৮।
[৪] দ্রষ্টব্য : www.whomakesnews.org

Dhaka University Institutional Repository

কখনো সংবাদ সূত্র হিসেবে, কখনো সংবাদের বিষয় হয়ে, আবার কখনো সংবাদ উপস্থাপনা তৈরির কাজে যুক্ত থেকে।"[৫]

তৃতীয় বারের মত এই বিশ্ব সংবাদ পরিবীক্ষণে বিশ্বের ৭৬টি দেশের একশ'রও বেশি নারী পুরুষ অংশ নেয়। এই পরিবীক্ষনের ফলাফল বিশ্লেষন করলে বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে নারীর অবস্থান কোথায় তা জানা যায়। "বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বর খুবই প্রান্তিক। বিশ্বের জনসংখ্যার ৫২% নারী, কিন্তু সংবাদে নারীর উপস্থিতি মাত্র ২১%। রেডিওর সংবাদে আরোও নগণ্য, মাত্র ১৭%। টেলিভিশন সংবাদে নারীর উপস্থিতি একটু বেশি, যা ২২% এবং সংবাদপত্রে ২১%।[৬]

এ ছাড়া দেখা গেছে প্রধান প্রধান সংবাদে (hard news) পুরুষের স্বর প্রাধান্য পায়। এমনকি নারীরা যখন সংবাদের বিষয় হয় তা মূলতঃ অপ্রধান/কম গুরুত্বপূন। (Soft news))যেমন বিনোদন এবং শিল্প সংস্কৃতির সংবাদে (২৮%), প্রধান প্রধান সংবাদে (hard news) যেমন ঃ রাজনীতি ও সরকার বিষয়ক সংবাদে নারীর উপস্থিতি মাত্র ১৪% এবং অর্থনীতির সংবাদে ২০%।

বিশেষজ্ঞ এবং মুখপাত্র হিসেবে পুরুষের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। ৮৬% সংবাদে মুখপাত্র হিসাবে এবং ৮৩% সংবাদে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পুরুষকে দেখা যায়। সংবাদ মাধ্যমে নারীর বিশেষজ্ঞ হিসাবে খুব কমই বিবেচিত হন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা (৩১%) অথবা জনপ্রিয় মতামতের (৩৪%) ক্ষেত্রে নারী কর্মীকে ব্যবহার করা হয়। (সূত্রঃ বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০০৫ বাংলাদেশ)

নির্যাতনের শিকার হিসাবে নারীর উপস্থাপন পুরুষের থেকে দ্বিগুণ। সংবাদ অনুষ্ঠানগুলোতে সাধারণভাবেই নির্যাতনে শিকার নারী ও পুরুষের সংবাদ এসেছে। যদিও অসমভাবে নির্যাতনের শিকার হিসাবে নারীর উপস্থাপন ছিল (১৯%), যা নির্যাতনের শিকার হিসাবে পুরুষের উপস্থাপনের (৮%) চাইতে বেশি।

---

[৫] বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০০৫-এর বাংলাদেশ প্রতিবেদন, জেন্ডার ইন মিডিয়া ফোরাম

[৬] নাজনীন আখতার শিফা, কারা সংবাদ হয়? বিশ্ব সংবাদ পরিবীক্ষণ প্রকল্প', জেন্ডার ইন মিডিয়া, বুলেটিন : ৬, অক্টোবর ২০০৫ -মার্চ ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ দাতা ও উপস্থাপক ঃ

সংবাদ এখনও মূলতঃ পুরুষদের দ্বারাই তৈরী এবং উপস্থাপিত হয়। শুধু মাত্র টিভি সংবাদের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। ৫৭% টিভি সংবাদই নারীদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়। এছাড়া সংবাদের অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীরা সংখ্যালঘু। এই ভারসাম্যহীনতা সবচেয়ে প্রকট সংবাপত্রের ক্ষেত্রে, সেখানে মাত্র ২৯% সংবাদ তৈরীতে সাংবাদিকরা কাজ করছে।[৭]

"বাংলাদেশের মাধ্যম দৃশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, খুব কম ক্ষেত্রেই নারী প্রকাশ্যে সংবাদে প্রধান হয়ে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী খবরে এসেছেন, তবে নারী হিসেবে নয়। সাধারনত নারী যখন সংবাদে প্রধান, তখন তা শুধু বিনোদন ও নির্যাতন বিষয়ক সংবাদের ক্ষেত্রে। নারীর ছবিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে তথ্যের চেয়ে বেশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা হামলার অনুগামী সংবাদে প্রতিবাদ মিছিলে ছাত্রীদের ছবি দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু সংবাদে কোন ছাত্রীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা বা তাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি। যদিও আমরা জানি সে দিন যারা আহত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যা নেহায়েত কম ছিল না। হরতাল বিষয়ক সংবাদেও নারী রাজনৈতিক কর্মীর ওপর হামলার ছবিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বক্তব্যের চেয়ে নারীর ছবি দেখাবার ঝোঁকটি চোখে পড়ে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমেও।[৮]

---

[৭] নাজনীন আখতার শিফা, প্রাগুক্ত।
[৮] 'সংবাদ নির্মাণ করে কে? প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সারনি : ৬.১

সংবাদের উপস্থাপক, প্রতিবেদক ও সংবাদ বিষয়ের লিঙ্গভেদ

উপস্থাপক				প্রতিবেদক				সংবাদের বিষয়				
নারী		পুরুষ		নারী		পুরুষ		নারী		পুরুষ		মোট
সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা
৪৫	৮৩%	৯	১৭%	৫	১৮%	২৩	৮২%	৪৯	২৬%	১৩৭	৭৪%	২৬৮

সূত্র : বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০০৫

দেখা যায় বিষয়বস্তু অনুযায়ী সংবাদগুলোকে ভাগ করবার জন্য ৩১টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে অর্থনীতি ও বানিজ্য, অপরাধ ও সহিংসতা, রাজনীতি ও সরকার, সমাজ, আইন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ক্রীড়া ইত্যাদি সব কিছুই ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রের সংবাদেই পুরুষের অন্তর্ভূক্তি অনেক বেশি সংখ্যায়। আর কিছু ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি শুধু নগন্যই নয়, অনেক ক্ষেত্রে শূন্য (যেমন আইনগত বিষয়ে)। এমনকি রাজনীতির মতো গুরুত্বপূর্ন যেখানে বাংলাদেশে নারীর সর্গভ পদচারণা, সে ক্ষেত্রে সংবাদে আমরা দেখতে পাই নারীর উপস্থিতি মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। তারকা ব্যক্তিত্ব শিল্পকলা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর উপস্থিতি এক-নবমাংশ।

সারনি : ৬.২

সংবাদ ক্ষেত্রে নারী -পুরুষের উপস্থিতি

লেখার প্রধান প্রধান ক্ষেত্র	নারী		পুরুষ	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
অর্থনীতি, ব্যবসায়	২০	৩৩%	৪০	৬৭%
অপরাধ, সহিংসতা	৭	৩২%	১৫	৬৮%
রাজনীতি, সরকার	১৭	২১%	৬৩	৭৯%
সামাজিক, আইন	০	০%	৩	১০০%
বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য	৪	৩৩%	৮	৬৭%
তারকাব্যক্তি,শিল্পকলা,ক্রীড়া	১	১১%	৮	৮৯%
সংবাদের মোট বিষয়বস্তু	৪৯	--	১৩৭	---

সূত্র : বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০০৫ এর বাংলাদেশ প্রতিবেদন, (জেন্ডার ইন মিডিয়া ফোরাম)

Dhaka University Institutional Repository

পরিসংখ্যান গুলির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সংবাদ মাধ্যমে নারীর উপস্থাপন বা রূপায়ন নারীর প্রতি গোটা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলণ।

৬.১ নারী উন্নয়ন ও সংবাদপত্র ঃ

ইতো পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংবাদ পত্র গুলিতে বিভিন্ন লেখক, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, সমাজ সংস্কারক বৃন্দ তাদের লেখনীর মাধ্যমে কীভাবে ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে বর্তমান অবস্থানে নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন অবস্থানে নারীর প্রান্তস্থ্য রূপ কতটা কষ্টকর ছিল এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিয়ত নারী সংক্রান্ত জনসচেতনতা মূলক লেখনী প্রচার, প্রকাশ, বাদ-প্রতিবাদ, নারী-পাতার মাধ্যমে নারী লেখক তৈরীর প্রয়াস ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানি সংবাদপত্রকে সমাজের দর্পন বলা হয়। সংবাদ পত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করলে একটি সমাজের আজন্তরীন, বাহ্যিক, গঠণতান্ত্রিকতা প্রকাশ পায়। নিয়ত কলম যুদ্ধেরত বোদ্ধা সমাজ প্রতিনিয়ত সমাজে নারীর দুরাবস্থা তুলে ধরার মাধ্যমে সমাজে পুরুষের নিষ্ঠুর রূপকে প্রকাশ করেছেন। তারা পুরুষতান্ত্রিকতার সংশোধন, রীতিনীতি সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন করে সমাজের নারী বিদ্বেষী গঠণতান্ত্রিকতাকে নারী বান্তবতায় পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন। একদিকে যেমন নারী শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের শিক্ষিত হওয়ার পক্ষে সংগ্রাম করেছেন, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করেছেন। তেমনি বিধবা বিবাহের পক্ষে জনমত গড়ে তুলে এর পক্ষে আইন তৈরী করেছেন। সমাজ থেকে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ করার কাজে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক সফলতা অর্জণ করেছেন। সংবাদ পত্র মানুষের নৈমত্তিক সংবাদ মনস্কার স্বাধ মিটায় জাতীয় আন্তর্জাতিক সকল প্রকার সংবাদ সরবরাহের সাথে সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রের এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং তা সমাধান কল্পে বিশিষ্ট লেখক, চিন্তাবিদদের লেখনী, সাহিত্যিক পর্যালোচনা, বিজ্ঞান, খেলা ধূলা, পড়া লেখা, চাকুরির খবর, অর্থনৈতিক আলোচনা পর্যালোচনা, শেয়ার বাজার ইত্যাদি সমাজের প্রতিটি স্তরকে মানুষের সামনে ফুটিয়ে তোলে। তাই সমাজে বসবাস রত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্ক ও তাদের মাধ্যমে ঘটমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংবাদ পত্রকে সর্বদা মুখরিত করে রাখে। অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত মতামত বৃহৎজনগোষ্ঠীর মতাদর্শ, কর্তৃপক্ষের মতামত ইত্যাদি দ্বারা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রিত থাকে। অধিকাংশ সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ যেহেতু পুরুষ শ্রেণী সংবাদপত্রের মতামত ও

Dhaka University Institutional Repository

এখনও পর্যন্ত বিশেষভাবে পুরুষের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত এবং সম্পূর্ন নারী বান্ধব নয়। আবার কিছু কিছু মৌলবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র বিশেষ ভাবে নারী বিরোধী। বিশেষ করে তারা সর্বক্ষণ ধর্মীয় আলোচনার অজুহাতে অনেক সময় নারী উন্নয়ন বিরোধী পুরুষতান্ত্রিক মতামত সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার ফন্দি খুজেঁ বেড়ায়। কখনও নারীর অপচ্ছায়া অন্বেষণের মাধ্যমে চলমান নারী উন্নয়নের ধারাকে ধর্মবিরোধী বা অধর্ম অথবা ধর্মের জন্য হুমকী, বা নারীর জান্নাতগমনের পথরুদ্ধকারী এধরনের মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে ধর্মভীরু কোমল হৃদয় অশিক্ষিতরা আধা শিক্ষিত -গ্রাম্য, কিংবা শহুরে মানুষের মনে নারী উন্নয়ন বিরোধী মতাদর্শ সৃষ্টি করে। এই প্রচার প্রচারণার ক্ষেত্রে তারা হাদিস-কোরান, সমলা-মাসায়েল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজে মতাদর্শগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। যেমন- ২০০৮ সালের ৮ই মার্চ সরকার ঘোষিত 'নারী-নীতি' কে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে এ নীতিকে ধর্মবিরোধী বলে সাধারণ ধর্মভীরু সমাজের প্রচার করে এবং ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদ সহ দেশের অন্যান্য মসজিদ গুলোতে ও বাদ জুমা মিছিল -মিটিং সহ উদ্ধত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা জীবনের বিনিময়ে হলেও এ নীতির কালো ছায়া থেকে ধর্ম, দেশ ও জনগনকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে। 'নারী-পুরুষের সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার হতে পারে না, আল্লাহ-ই এ বিধান সৃষ্টি করে দিয়েছেন বলে তারা ফতোয়া জারি করে। নারী তার অধিকার রক্ষা করতে চাইলে পুরুষের কী ক্ষতি তা তারা ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকে। সর্বত্র নারীর সমান অংশীদারিত্বে পুরুষের কোন ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। কারণ-নারী কল্যাণীয়া। নারী চরিত্র তাদের কথা মত যদি বিধ্বংসী হত বা ক্ষতিকর কিছু হত, তবে এত হাজার বছর যাবৎ নারীর বিরুদ্ধে যে অন্যায় অত্যাচার হয়েছে, তা তারা যন্ত্রণা কাতরতার মধ্য দিয়ে সহ্য না করে পৃথিবীতে বহু আগেই প্রলয়কান্ড বাঁধিয়ে দিত। তাহলে কোন নারী-বিদ্বেষী পুরুষ মায়ের কোলে, বোনের স্নেহে, স্ত্রীর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বেড়ে উঠতে পারতনা। সুতরাং দেখা যায় মালিক নিয়ন্ত্রিত এ সব সংবাদ পত্রে মালিকের আদর্শ অনুসারে ভাষা এবং চিত্র ব্যবহৃত হয়।

ধর্মীয় মতবাদ অনুযায়ী 'পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা তৈরী নারীর বাঁকা স্বভাব' যদি বক্র পথেই চলত আর নারী-বুদ্ধি যদি প্রলয়ংকরী হত, আর যদি তা সকল অশুভ কর্মেযন্ত্রণা যোগাত তবে সেই প্রলয়কান্ডে পৃথিবীগ্রহটি অনেক আগেই মহাপ্রলয় (বা কেয়ামত) প্রত্যক্ষ করত আর তার এ অপমৃত্যুতে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহসহ তাবৎ গ্রহ নক্ষত্র 'ইন্নানিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ত। কিন্তু আমরা পৃথিবীকে গুহার দিকে ফিরে যেতে দেখি নাই।

Dhaka University Institutional Repository

বরং হাজার হাজার বছরের অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার ইত্যাদি কাটিয়ে পৃথিবী আজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এর মূলে রয়েছে গণমাধ্যমের জোরালো এবং ইতিবাচক ভূমিকা। আর গণমাধ্যমের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সংবাদপত্র।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপক প্রসারের পরও সংবাদপত্র তার স্বমহিমা নিয়ে টিকে আছে। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের পর ইলেক্ট্রনিক প্রকাশনা বা ইন্টারনেট ভিত্তিক সংবাদপত্র ইত্যাদির আবির্ভাবের পর একটা আশঙ্কা করা হয়েছিল যে মুদ্রণ মাধ্যম হুমকির সম্মুখীন হবে। কিন্তু একটা পর্যায় অতিক্রম করার পর প্রমানিত হয়েছে যে সংবাদপত্র তার পূর্বেকার মহিমা নিয়েই টিকে থাকবে। অ্যালান রোবলস্ (Robles, 1996 : 57) মনে করেন "যতক্ষণ না কম্পিউটারকে ভাঁজ করা যাচ্ছে, সংবাদপত্র ইন্টারনেট থেকে নিরাপদ থাকবে।" সংবাদপত্রের সংরক্ষণের সুবিধা, সহজে ব্যবহার যোগ্যতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য তাকে অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত রেখেছে। অন্তত বাংলাদেশের মতো দেশে সংবাদপত্রই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রভাবশালী গণমাধ্যম।[৯]

কারণ এদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ মানুষেরই মৌলিক চাহিদা পূরণ করার পর তথ্য প্রযুক্তির উন্নততম আবিস্কার কম্পিউটারের নাগাল পাওয়া সহজ সাধ্য নয়। একটি ব্যক্তিগত কম্পিউটার কিনতে এখনও যে পরিমান অর্থের প্রয়োজন হয় তা থেকে তারা বরঞ্চ সন্তানের, অনেক দিনের ভরনপোষণের যোগান দিতে পারে। অনেক কষ্ট করে অনেক দিনের সঞ্চিত টাকা দিয়ে তারা সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য খরচ করে থাকে কিংবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে থাকে। অনেকে ইচ্ছা থাকা সত্যেও অর্থাভাবে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির নাগাল পায় না। তাই সংবাদ পত্রের আবেদন এত সহজে সাধারণ মানুষের কাছে কমে যাবে না। আর সংবাদ পত্রের সহজ লভ্যতা, বহন যোগ্যতা ছাড়াও কম্পিউটারের মত না না সময়ের যান্ত্রিক ত্রুটির কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। তাই সাধারণ মানুষের কাছে সংবাদপত্রের গ্রহণ যোগ্যতা প্রশ্নাতীত।

সংসারের গন্ডিবদ্ধতাকে অতিক্রমের দৈনন্দিন মাধ্যম হিসেবে সংবাদ পত্র মানুষের মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নারী উন্নয়ন বিষয়ে সংবাদপত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কর্মকৌশলগুলো পৌন পৌনিকতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। পিতৃতান্ত্রিকতার পিঠে ভর করে আমাদের সমাজ সামনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার

[৯] ফাহমিদুল হক, 'নারী ও সংবাদপত্র', প্রাগুক্ত, পৃ .৯।

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করছে। ফলে সমাজে নারী উন্নয়নের ধারাটিকে নানা ভাবে বেগ পেতে হচ্ছে। এই সমাজেরই প্রতিচ্ছবি হল সংবাদপত্র। সুতরাং তার চরিত্রটি ও এই চক্রাবর্ততাকে অতিক্রম করতে পারছে না।

একটি সংবাদপত্রকে আমরা সাধারণ পাতা, সাহিত্য পাতা, নারী পাতা ও বিজ্ঞান পাতা এই চার ভাবে যদি দেখি তবে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংবাদ পত্রের ইতিবাচক রূপটির পাশাপাশি পক্ষপাত দৃষ্টান্ত ও দেখতে পাই। একটি সমাজ আপন আদর্শকে সমুন্নত রাখে প্রচারের মাধ্যমে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে নারীকে নেতিবাচক ভাবে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত করা হচ্ছে ফলে নারী উন্নয়ন গতি হারাচ্ছে।

৬.২ সাধারণ ভাবে সংবাদ পত্রে নারীকে যেরূপে দেখা যায় ঃ

সাধারণভাবে নারীকে যেরূপে সংবাদপত্রে দেখা যায়, তা হলো ঃ

- সাংবাদিকতার তত্ত্বই সংবাদপত্রে নারীর অপরূপায়ণকে উৎসাহিত করে। যেমন, স্ট্যানলি ওয়াকারের দেয়া খুব পরিচিত একটি সংজ্ঞা অনুসারে 'Women, Wampum and wrongdoing : Sex, money, crime'-ই হলো সংবাদ। যৌনতা, অর্থ, অপরাধ এই তিনটি বিষয়ের সঙ্গে , পুরুষতান্ত্রিক সমাজে খুব সহজেই নারীকে যুক্ত করে দেয়া যায়। সংবাদপত্রে তাই নারীকে দেখা যায় যৌনতা ও অপরাধের অনুষঙ্গ হিসেবে। তাত্ত্বিকভাবেই বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- নারীর সমস্যা, বাধা কিংবা সংগ্রাম থেকে নারীর অর্জন সর্বক্ষেত্রেই সংবাদপত্রে যেস সংবাদ আকারে স্বল্পমাত্রায় হাজির থাকে। অন্যদিকে নারী সংশ্লিষ্ট খবর, ফিচার প্রকাশের চাইতে নারীর ছবি পত্রিকায় বেশি ছাপা হয়ে থাকে। প্রদর্শণ, পাবলিক পরীক্ষা, মেলা ইত্যাদি আইটেমে অবধারিতভাবে নারীর ছবি ছাপা হয়ে থাকে।
- সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য হলো 'টু সেল এন্ড টু টেল'। পুজিঁতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সংবাদপত্রও একটি পণ্য। আর নারী সংশ্লিষ্ট যেসব আইটেম বিক্রয়যোগ্য পন্য হিসেবে বিবেচিত হয়, সেসব আইটেম সহজেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। নারী-নির্যাতনের সংবাদ, অপরাধ বিষয়ক সংবাদ, গসিপ, ফ্যাশন ইত্যাদি সংবাদ পত্রিকায় বেশি বেশি ছাপা হয় এবং নারীকে সেখানে যৌনবস্তু ও প্রদর্শণযোগ্য সৌন্দর্যের আধার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

❖ সংবাদপত্রে নারী প্রধানত ঘটনার শিকার হিসেবেই উপস্থাপিত হয়ে থাকে। সক্রিয় সংবাদ উপাদান হিসেবে তাকে খুব একটা দেখা যায় না। পত্রিকায় সাধারনত নারী সংবাদ হয়ে ওঠে তখনই যখন সে কোনো না কোনভাবে নির্যাতনের শিকার হয়।

❖ ধর্ষণ বিষয়ক এবং অন্যান্য নারী নির্যাতনের সংবাদে ঘটনাটিকে যতটা সম্ভব দৃশ্যায়িত বা চিত্রায়িত করার চেষ্টার মাধ্যমে পুরুষ পাঠকের যৌনানন্দ দেবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এসব সংবাদদে নারীকে পরিচয় পাওয়া গেলেও অপরাধিদের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায় না। ধর্ষণ সংবাদের শব্দ ও নির্বাচন করা যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে।

❖ নারী বিষয়ক পাতাগুলোতে নারীর সমস্যা নিয়ে প্রতিবেদন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই রান্নাবান্না, ফ্যাশন, শিশুপরিচর্যা, গৃহকর্ম ইত্যাদি বিষয়ের প্রচুর আইটেম থাকে যেসব আইটেম নারীর অধস্তন তাকেই বলবৎ রাখে।

❖ ক্রীড়া সংবাদ ও ছবিতে নারীর ক্রীড়ানৈপুন্যের চেয়ে তাকে যৌনাবেদনময়ী করে উপস্থাপন করার ঝোঁক লক্ষ করা যায়।

❖ প্রথম পাতায় বা নারী পাতায় নারী বিষয়ক যেসব সংবাদ ফিচার থাকে তা মূলত শহর কেন্দ্রিক। মফস্বলের নারীর প্রবেশাধিকার সংবাদপত্রে তেমন নেই। আর তরুণীরাই সংবাদ আইটেম হয়ে থাকে। মেয়ে শিশু বা বৃদ্ধাদের স্থান সংবাদপত্রে নেই বললেই চলে।

❖ সংবাদে নারীকে উপস্থাপন করা হয় অসহায়, দুর্বল হিসেবে। সংবাদে তাই প্রায়ই লক্ষ করা হয় 'নারী ও শিশুসহ .. জন নিহত' ধরনের শিরোনাম। নারীকে পুরুষ থেকে বিযুক্ত করে শিশুর সঙ্গে পৃথকভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে তাকে দুর্বল সত্তা হিসেবে হাজির করার ঝোঁকই লক্ষ করা যায়।

❖ যদিও পত্র-পত্রিকায় সাম্প্রতিককালে নারী বিষয়ক আইটেমের সংখ্যা বাড়ছে তবে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তার অধস্তন মানসিকতাকে জিইয়ে রাখার নানা আইটেম। তার সমস্যার কথা যেমন আগের চাইতে বেশি বলা হয়, তার ফ্যাশন বা রূপচর্চার আইটেম ও আগের চাইতে অনেক বেশি প্রকাশিত হয়।

❖ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ব্যাপার হলো, সংবাদপত্রে নারীর অংশগ্রহণ এখনও খুব কম এবং নীতিনিধারন পর্যায়ে তার কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে।

❖ সংবাদপত্রে নারীবিষয়ক ইস্যু নিয়ে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় কম হারে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তে একটি পত্রিকার পলিসি কী তা প্রকাশিত হয়ে থাকে। পত্রিকার পলিসিতে নারী ইস্যুটি যে অবহেলিত তা পত্রিকাগুলো দেখলে স্পষ্ট বোঝা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় পাতা পত্রিকার হয়ে জনমত গঠনের কাজটি করে থাকে। নারী ইস্যুটির প্রায় অনুপস্থিতির কারনে এ বিষয়ে জনমত গঠনের যে কাজ পত্রিকা করতে পারতো তাতে ঘাটতি দেখা যায়।"[১০]

৬.২.১ বাংলাদেশের সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ ও নারীর রূপায়ণ গবেষণার আলোকে

আরিফা এস. শারমিন ও রোবায়েত ফেরদৌস (২০০১) বাংলাদেশের সংবাদপত্রে নারীর রূপায়ণ নিয়ে উল্লেযোগ্য একটি গবেষণাকর্ম করেছেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা শীর্ষক গবেষণায় ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ছয় মাসের আটটি সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণনের মাধ্যমে গবেষকদ্বয় সংবাদপত্রে নারীর রূপায়ণের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। আধেয় বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তারা নারীর নিম্নলিখিত রূপায়ণ তুলে ধরেন ঃ

অদৃশ্যমানতা

❖ গবেষণাধীক ৮টি সংবাদপত্রেই নারীবিষয়ক সংবাদ কম গুরুত্ব পেয়েছে। প্রকাশিত নারী সংবাদের হার খুবই নগন্য।

❖ জনসংখ্যার বিচারে সমাজের অর্ধেক নারী হলেও নারীবিষয়ক আইটেমের জন্য একেবারেই স্বল্প স্থান বরাদ্দ করা হয়।

❖ সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় কিংবা চিঠিপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে সব কাগজেই নারীবিষয়কে উপেক্ষা করা হয়।

অতিসাধারনীকরণ

❖ সমস্যা হলো সমাজের একটি অংশের কথা সবার কথা বলে শনাক্ত করা। যেমন খরায় উত্তরাঞ্চলের কৃষককূলের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে দেখা যায় শুধু পুরুষ কৃষকদের কথা বলেই প্রতিবেদন রচিত হচ্ছে। কৃষি কাজে নারীরাও জড়িত, তাদের সমস্যার কথা সংবাদপত্রে আসে না।

---

[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০।

অধিকতর দৃশ্যমানতা

প্রধানত ঘটনার শিকার হিসেবেই নারী উপস্থাপিত হয়েছে। সক্রিয় সংবাদ উপাদান হিসেবে নারীকে কোন কাগজেই খুব বেশি উঠে আসতে দেখা যায় না, সব পত্রিকায় নারী নির্যাতণমূলক সংবাদের আধিক্য দেখা যায়। সব কাগজে নারী সংশ্লিষ্ট খবর, ফিচার বা অন্য আইটেমের তুলনায় নারীর ছবি প্রকাশের ঝোঁক লক্ষ করা যায়। 'নারীদেহ বিকোয়' অধিকহারে ছবি প্রকাশ করে সংবাদপত্র যেন এই ধারনারই বিস্তার ঘটাচ্ছে।

অতি বিশেষায়িত

অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ইত্যাদি বিষয়ে শুধু পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যেমন সমগ্র মানব সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির অতিসাধরণীকরন করা হয়; অন্যদিকে সৌদর্য, প্রদর্শনী, শিশুর পরিচর্যা, গৃহকর্ম ইত্যাদি প্রতিবেদন পুরুষ ক্রেতা-বিক্রেতা, ছাত্র-শিক্ষকের সঙ্গেই কথা বলে তৈরি করা হলেও, এসব সংবাদের সঙ্গে কেবল নারীর ছবিই যায়।

দু'মুখো আদর্শ

সংবাদপত্রে নারী ও পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে গৎবাঁধা ধারনার বহিঃপ্রকাশ প্রতিবেদনের জেন্ডার সংবেদনশীলতাকে প্রায়শ ক্ষুন্ন করে থাকে। নারীও পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত বেশিরভাগ ধারণারই কোনো জৈবিক ভিত্তি নেই, অথচ সংবাদপত্রে সেগুলোই প্রতিফলিত হয়।

প্রান্তিকীকরণ

❖ সংবাদপত্রে নারী বিষয়ক বাইলাইন-সংবাদ থাকে না বললেই চলে।

❖ নারী সংশ্লিষ্ট ইস্যু নিয়ে ব্যাখ্যামূলক বা অনুসন্ধানমূলক সংবাদ প্রকাশের ঝোঁক অনুপস্থিত থাকে।

❖ ট্রিটমেন্টের দিক থেকে নারী বিষয়ক সংবাদগুলো অবহেলিত। প্রথম পৃষ্ঠায় লিড হওয়া বা কয়েক কলামব্যাপী সংবাদ ছাপা হয় না বললেই চলে।

❖ নারী সংশ্লিষ্ট নির্যাতনের সংবাদে নির্যাতিতাকে দুশ্চরিত্রা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়।

❖ নারীর রহস্যজনক মৃত্যুকে কাগজ সূত্র ছাড়াই আত্মহত্যা হিসেবে প্রকাশ করে। অথচ অনেক আত্মহত্যাই আসলে হত্যাকান্ড।

Dhaka University Institutional Repository

❖ প্রথম পৃষ্ঠায় নারী নারীবিষয়ক যেসব সংবাদ থাকে তা শহরকেন্দ্রিক। প্রথম পৃষ্ঠায় মফস্বলের নারীর প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ।

গৎবাঁধা ধারণা

❖ গণমাধ্যমে নারীর বাঁধা চরিত্রগুলো হয় কামোদ্দীপক, জননী, জায়া, অসহায়, নির্যাতিত, গৃহকোণবাসী, পরনির্ভর এবং সব মিলিয়ে গুরুত্বহীন। নারী অডিয়েন্সকে মনে করা হয় শুধু গৃহসজ্জা, সন্তানপালন, রূপচর্চা রন্ধনে আগ্রহী।

❖ সংবাদপত্র সহজে কোনো পরিবর্তনকে প্রতিবিম্বিত করে না। যদিও পত্রপত্রিকায় নারীবিষয়ক আইটেমের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু ধর্বণের সংবাদে নির্যাতনের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে এর ব্যাপক বর্নণা, সামাজিক সমস্যার চেয়ে বেশি দেওয়া হয় ফ্যাশন বা রূপচর্চার বিষয়কে।[১১]

জেন্ডার অসচেতন শব্দের ব্যবহার

বাংলাদেশের সংবাদপত্র গুলিকে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ গুলো সংবাদ পরিবেশনের সময় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিশেষ সচেতন নয়। সংবাদ লিখার কাজটি যেহেতু অধিকাংশ সময়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষ প্রতিনিধির মাধ্যমেই হয়ে থাকে সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাদের চিরাচরিত মানসিকতার একটি প্রতিফলন রয়েই যায়। উদিসা ইসলাম (২০০৩) বাংলাদেশের চারটি দৈনিকে প্রকাশিত ধর্ষণ বিষয়ক সংবাদের ওপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন ব্যবসায়িক কারনে ও পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ দ্বারা তাড়িত হয়ে সংবাদগুলোর মাধ্যমে পাঠককে কী ভাবে যৌনানন্দ দেবার চেষ্টা করা হয়। মার্চ ২০০১ থেকে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত প্রকাশিত চারটি পত্রিকাকে নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করে 'ধর্ষণ-সংবাদে লিঙ্গ পক্ষপাতের বিচারমূলক পাঠ' শীর্ষক এই গবেষনাকর্মটি করা হয়েছে। সিমিওলাজির সাহায্য নিয়ে গবেষক ধর্ষণ সংবাদে সচরাচর ব্যবহৃত শব্দবন্ধের বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

দ্যোতক (Signifier)	দ্যোতিত (Signified)
গণধর্ষণ ও পালাক্রমে ধর্ষণ শব্দ দু'টোর পাশাপাশি অবস্থান	একধিক লোক দ্বারা ধর্ষণ ঘটলে তা পালাক্রমেই ঘটে। দু'টো শব্দ এক সাথে ব্যবহারের মাধ্যমে বিষয়ের মাত্রা বোঝানোর নামে ঘটনার নগ্ন চিত্র তুলে- ধরার চেষ্টা চলে।

[১১] ফাহমিদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১০-১১।

নির্জন স্থানে ধর্ষণ	ধর্ষণের জন্য নির্জন স্থান দরকার হয় এটা জানার পরও এই শব্দ লেখা হয়। কারণ পাঠককে রিপোর্টার সেই নির্জনতার সঙ্গে একাত্ম করতে চান।
কিশোরী যুবতী তরুণী ষোড়শী শব্দের ব্যবহার	যে ধর্ষিত হলো তার শারীরিক মানসিক গঠন-কাঠামো সম্পর্কে পাঠককে ধারণা দিতে এই শব্দগুলোর ব্যবহার করা হয়।
রাতভর পালাক্রমে ধর্ষণ	এই শব্দাবলি ব্যবহার করে সারা রাত কী ভাবে পালা করে ধর্ষণ করা হয়েছে তার সচল সচিত্র প্রতিবেদন পাঠকের সামনে হাজির করা সম্ভব হয়।
রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার	ধর্ষিত ব্যক্তি, তার শরীর যে ফোকাসের মূল বিষয় সংবাদ বিবরনীতে এমন শব্দের ব্যবহারে তা স্পষ্ট হয়।
জোর পূর্বক ধর্ষণ	ধর্ষণ হলো জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন। তারপরও যখন জোরপূর্বক শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে তখন এর পেছেনে ইঙ্গিত কাজ করে। ধর্ষণ সময়ের জোরাজুরি দৃশ্যের চিত্র বর্ণনের মাধ্যমে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত ধর্ষণ সংবাদগুলোর একটি সাধারন কাঠামো উদিসা ইসলাম উপস্থাপন করেছেন ঃ

ক) ধর্ষণ ঘটনাকেন্দ্রিক সংবাদ সূচনা (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণ ঘটেছে এই সংবাদটা সূচনায় দেয়া হয়, কখনো কখনো কে ধর্ষণের শিকার হলো এবং কার বাড়ি কোথায় অর্থাৎ ধর্ষিত ব্যক্তিকে সূচনায় ফোকাস করা হয়; এবং কদাচিৎ ধর্ষককে দিয়ে সংবাদ শুরু হয়);

খ) ঘটনা বর্ণনা (কীভাবে ধর্ষণ ঘটনাটি ঘটলো তার বিস্তারিত বিবরন);

গ) ধর্ষকের পরিচয় (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অস্পষ্ট);

ঘ) ধর্ষিত ব্যক্তির পরিচয় (নানা কৌশলে ও অনেক সময়ই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়);

ঙ) মামলা হয়েছে নাকি হয়নি (এই অংশের বর্ণনা বা উল্লেখ খুব কম সময় থাকে);

চ) আলামতের বর্ণনা (আক্রান্তর 'শরীরে' রক্তের দাগ কিংবা অন্যান্য চিহ্ন থাকলে তা তাৎক্ষনিকভাবে তুলে ধরা হয় এবং ডাক্তারি পরীক্ষার পর রিপোর্ট করা হলে 'ধর্ষণের

Dhaka University Institutional Repository

আলামত পাওয়া গেছে' শুধু এই টুকু বলার মধ্যে না থেকে খুঁটিনাটি বিবরণ তুলে ধরা হয়)।[১২]

তবে পুরুষতন্ত্রের সদস্য হিসেবে সাংবাদিকদের এই বর্ণনা নারীর যে শুধু অবমূল্যায়ন করছে শুধু তাই ভাবলে ভুল হবে তাদের এই জেন্ডার সংবেদনহীন বর্ণনা প্রকারান্তরে পুরুষের পাশবিক অত্যাচারী পুরুষ নিজেকে সহ গোটা পুরুষ সমাজের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করছে। তাদের এই পাশবিকতাকে বর্ণনার মারপ্যাঁচে প্রশ্রয় দিয়ে পুরুষ সমাজের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এবং -এ ধরনের কার্যকলাপ সংগঠনের প্রতি কিছু বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন লোকের সাহস সঞ্চার করা হচ্ছে যা গোটা সমাজকে অবউন্নয়নের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

নারী পাতায় নারীর অবস্থানঃ

সংবাদপত্র গুলোর 'নারী পাতা-এর নামকরন বা নারীদের জন্য নির্দিষ্ট ফিচার পাতাটাকে তাদের জন্যই এবং নির্দিষ্ট ধরণের বোঝাতে এবং বিযুক্তি করণের জন্য "মহিলা পাতা" "মহিলা অংগন" "মেয়েদের পাতা" প্রভৃতি নাম দেয়া হয়। এখানে নারীর মহিলা হিসেবে করনীয় কাজ, Stereotype বা সনাতনী চিত্রকে গুরুত্ব দেয়া হয় যেমন নারী সুন্দর যখন সে প্রেয়সী। যখন বধূ সে কল্যাণময়ী, সেবাব্রতী, যখন ভগ্নী তখন সহযোগী প্রেরণাদাত্রী। যখন মাতা তখন কর্তব্যপরায়ণ স্নেহশীল। ক্ষমাবতী ইত্যাদি। এটা হোল নারীর ইতিবাচক চিত্র, নেতিবাচক চিত্রে সে সর্বগ্রাসী। (গল্প কাব্যে বিশেষ করে) পণ্য, প্রলুব্ধকারী, রমণীয় ইদানিং কালে নারীপাতায় "ইমেজ " বা 'চিত্র' ভাঙবার চেষ্টা চলছে সেটাও মাত্রা যুক্ত। যেমন গার্মেন্টস শ্রমিক নারী 'কর্মী নারী' শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অবদান। বিভিন্ন দেশের আন্দোলনের নারীর অবদান। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা কেমন মহিয়ষী পুরুষের পাশাপাশি ইত্যাদি।"[১৩]

খ) আলম (২০০৪) 'কোটাভিত্তিক নারীপাতা পুরুষতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের এক কোটারি ব্যবস্থা' শীর্ষক গবেষণায় বাংলাদেশের ৮টি দৈনিক সংবাদপত্রের নারী পাতা নিয়ে গবেষণা করেছেন। নারী পাতাগুলোর আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন ঃ

---

[১২] ইসলাম, উদিসা (২০০৫); 'ধর্ষণ' সংবাদে লিঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিচারমূলক পাঠ; যোগাযোগ, সংখ্যা-৭; ফাহমিদুল হক সম্পাদিত; ঢাকা।

[১৩] শামীম আখতার, "সংবাদ গণমাধ্যমে নারীচিত্র," গণমাধ্যম ও নারী, নারী সংহতি, পৃ. ৩৭।

❖ নারী পাতাগুলোর শহরের নারীদের তুলনায় (৮৪.২০%) গ্রাম/মফস্বলের নারীদের খবর অনেক কম (১৫.১৫%) থাকে।

❖ উচ্চ মধ্যবিত্ত (৫৩.০১%) এবং মধ্যবিত্ত (৫৬.৪৩%) নারীদের তুলনায় নিম্নবিত্তের নারীদের (২১.৪৮%) খবর অনেক কম থাকে।

❖ উৎপাদনশীল খাতের চাইতে (২০.১১%) অনুৎপাদনশীল খাতের (৭৯.৩২%) খবর অনেক বেশি থাকে।

❖ ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়েসী নারীদের খবর (৮২.১৬%) অন্যান্য বয়েসীদের (১৬.১৭%) চাইতে অনেক বেশি থাকে।

❖ নারীর সমস্যাকেন্দ্রিক সংবাদ (৩৬.৯২%) থাকে সবচাইতে বেশি। তবে বিশেষজ্ঞ নারী অর্জন ও স্বাবলম্বিতাভিত্তিক সংবাদ (৩০.৮৫%) পরামর্শ ও চিঠিপত্র আইটেম (২১.৪৭%) যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। আর ফ্যাশন ও সৌন্দর্যচর্চাকেন্দ্রিক সংবাদ (৫.৩৩%) ইত্যাদি ও নারী পাতায় থাকে।"[১৪]

বলা যায়, মূল পাতায় নারীর যথেষ্ট অপরূপায়ণ থাকলেও বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোর নারী পাতায় তার সমস্যা ও অর্জনকেন্দ্রিক আইটেম যথেষ্ট থাকে, যদিও রান্না-বান্না, ফ্যাশন ও পাশাপাশি পাতাগুলোতে প্রকাশিত হয়।

৬.৩ সংবাদ মাধ্যমে নারীর ইমেজ ও নারীর অধিকার ঃ

নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রিন্ট মিডিয়ার অবদানের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় একটি অনগ্রসর গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে সংবাদপত্র কী ভাবে পথের সন্ধান দিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিকতার কবলে পড়ে নারীরা তার সার্বিক মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এক অন্ধকার গুহায় যেন হাবুডুবু খাচ্ছিল। তাদের এ দুরবস্থার কবল থেকে মুক্ত করতে সংবাদ মাধ্যম গুলোর সহায়তায় মানবতাবাদী মহান ব্যক্তিবর্গ কলম যুদ্ধের মাধ্যমে নারীকে এই অচলায়তন থেকে মুক্ত করে আত্মপোলব্ধির পথ প্রদর্শন করেন। ঘোর সামাজিক বিরোধীতার মধ্য দিয়ে তাঁরা নারী অধিকার আন্দোলন চালিয়ে যান এবং তাদের এ অবদানের ধারা বাহিকতায়ই আধুনিক সমাজ নারী উন্নয়নের বর্তমান অবস্থানে উন্নতি হয়েছে। তখনকার দিনে সংবাদপত্র গুলো নারীকে একটি অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে

---

[১৪] আলম, খ. (২০০৫); কোটাভিত্তিক 'নারী পাতা' : পুরুষতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের এক কোটারি ব্যবস্থা; যোগাযোগ, সংখ্যা ৭; ফাহমিদুল হক সম্পাদিত; ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

চিহ্নিত করে তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিস্তার লেখা লেখি চালিয়ে যায়। ফলে নারী শিক্ষার আন্দোলন দেখে ধীরে ধীরে স্বীয় অধিকারগুলো আদায়ের জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হতে থাকে এবং বিভিন্ন রকম আন্দোলনগুলোকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সংবাদ পত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখার বিষয় হচ্ছে সংবাদ পত্র নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে অবস্থান রাখতে পেরেছে তাহলে সমাজের কুসংস্কার দূর করে মানুষের মনে নারী সম্পর্কে 'ইতিবাচক ইমেজ' বা ভাবমূর্তি তুলে ধরা আর যা করতে পারেনি তা হল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত পুরুষতান্ত্রিকতার ধারা যা আজও পুরুষকে প্রভু আর নারীকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোন থেকে দেখা তাই দেখা যায় নারী পাতায় নারী উন্নয়ন মূলক, তার সমস্যা ও অর্জন কেন্দ্রিক আইটেম ব্যবহার হলেও মূল পাতায় নারীর যথেষ্ট অপরূপায়ন হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিগত শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত সংবাদপত্র গুলি তার লেখনীর মাধ্যমে নারী উন্নয়নমূলক যতটা অবদান রাখতে পেরেছে, শতাব্দীর শেষের দিকে এসে যেন ততটা বেগ ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি এক্ষেত্রে সেখানে যেন কিছুটা ভাঁটা এসেছে। সমাজে বিরাজমান নারীর অবমূল্যায়ন মূলক মতাদর্শকে ভিন্ন আঙ্গিকে অনেক ক্ষেত্রে চাঙ্গা করে রেখেছে। সংবাদপত্রের মালিক ও প্রভাব বিস্তারকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের ব্যবসায়িক সুনাম অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নারীকে পণ্য করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে এবং তারা এক্ষেত্রে অনেকটা সক্ষম ও হয়েছে। আগের দিনে নারীকে পর্দার অন্তরালে অন্তরীন রেখে সেবা দাসী বানানোর প্রয়াসে পুরুষতন্ত্র লিপ্ত ছিল, এখন ধনতন্ত্রের বাজারে পুঁজি হিসাবে নারীর 'রূপ'কে বিনিয়োগ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। তাই দেখা যায়, একই দিনে হয়তো বা চলচ্চিত্র পাতায় প্রকাশ পাচ্ছে নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে স্বল্প বাসনা নারীর অশ্লীল ছবি অন্য দিকে নারী পাতায় তার মহীয়সী রূপায়ণ।

প্রগতির গতিকে যত চেষ্টাই করা হোক না কেন অবরুদ্ধ করা কোন কালেই সম্ভবপর নয়। তাই বিশ্বব্যাপী নারী অধিকারের বিষয়টা ক্রমশ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। "১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার ঘোষণার পরও লক্ষ্য করা গেছে যে নারীর অধিকার পদদলিত হয়ে এসেছে। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অধিকার বঞ্চিত রাখলে তারা কিন্তু সমাজ প্রগতির জন্য তাদের ভূমিকা রাখতে পারবে না। পারবে না দায়িত্ব পালন করতে। সেই উপলব্ধি থেকেই ১৯৭৫ এবং পরবর্তী দশক নারী দশক হিসেবে জাতিসংঘ ঘোষনা করে। ১৯৭৯ সালে গৃহীত হয় নারীর মানবাধিকারের জাতিসংঘ ঘোষণা নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপের জাতিসংঘ সনদ (CEDAW) । ১৯৭৫ থেকে শুরু করে ১৯৯৫ পর্যন্ত জাতি

Dhaka University Institutional Repository

সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে চারটি বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় নারীর অধিকার মানবধিকার। কারণ নারীকে বাদ দিয়ে বিশ্ব এগুতে পারনে না। ১৯৯৫ সালে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের ঘোষণায় (Beijing Platform for Action) নারীর পূর্ন সম অধিকার তথা মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ১২টি গুরুত্বপূর্ন বিষয় সম্পৃক্ত করা হয়। এই ১২টি বিষয়ের একটি হচ্ছে নারীও গনমাধ্যম। সংবাদ মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক রূপায়ণ নিশ্চিত করতে নারীর অধিকারের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সংবাদ মাধ্যমে স্থান পাওয়া জরুরি। তার জন্য সংবাদ মাধ্যমে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ জরুরি।"[১৫]

বাংলাদেশের কিছু গণমাধ্যম যেমন টেলিভিশন, রেডিও এবং কতিপয় সংবাদপত্রের উপর রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ এখন ও বিদ্যামান। এসব মাধ্যমে, কিছু অনুষ্ঠানে, লেখায় বিশেষ ধরণের Stereotype লক্ষ্যনীয়। ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার ক্রমবৃদ্ধির কারণে বিটিভিতে রমজান মাস এবং ধর্মীয় ছুটির দিনে নারীদের (ঘোষিকা, সংবাদ পাঠিকা) মাথায় কাপড় দিতে বাধ্য করা হয়। নারীদের র‍্যাডিক্যাল ভাবমূর্তিকে নিরুৎসাহিত করা হয়।"[১৬]

আবার ৮মার্চ ২০০৮ সালে সরকারের নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষনার পর জাতীয় মসজিদ সহ দেশের বিভিন্ন মসজিদে এর বিরোধীতাকারী মুসল্লীদের বিভিন্ন রকম নেতিবাচক ও অসঙ্গত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সরকারের নমনীয় ভাব ও সংবাদ মাধ্যম গুলোর সর্তক অবস্থান এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ নীরবতা নারীর প্রতি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের রূপটি ফুটিয়ে তুলছে। এ ক্ষেত্রে দেখা গেছে ইসলামী চিন্তাবিদ নামের কিছু মাওলানা মৌলভীর সাথে সরকারের বৈঠকের কিছু ছবি। নামাজ শেষে কিছু ব্যক্তির লাঠি সোটা সহ ব্যাপক বিশৃংখল আচরণও নারীর প্রতি অসম্মান জনক উক্তি সম্পর্কে বিটিভির সংবাদে বিশেষ কোন দৃশ্য চোখে পড়েনি। আবার অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম গুলিও যেন এক অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ছিল। 'নারী উন্নয়ন নীতির' কার্যকারিতা ও যৌক্তিকতা নির্ধারণে মাওলানা মৌলভীদের নিয়ে বৈঠকের দৃশ্য নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার ধর্মীয় ও পুরুষতান্ত্রিকতার কঠোর ইচ্ছা ও মতাদর্শকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আজও 'নারী-নীতি' নির্ধারণের 'মুরব্বীয়ানা' পুরুষ নিজের হাতে রাখার সক্রিয় দাবীদার। এক্ষেত্রে বিভিন্ন নারী অধিকার আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত সংবাদ মাধ্যমে তাদের কণ্ঠ অনেকটা ম্রিয়মাণ দেখা গেছে। জনগনের মধ্যে 'নারী নীতি', নারী উন্নয়নের পক্ষের নীতি হিসেবে প্রচার না করে, একে ধর্ম বিরোধী নীতি হিসেবে ব্যাপক

[১৫] নাসিমুন আরা হক মিনু, 'সংবাদ মাধ্যমে নারীর অধিকার; উন্নয়ন পদক্ষেপ, এপ্রিল ২০০৭, পৃ : ৬।
[১৬] মেঘনা গুহঠাকুরতা : বাংলাদেশের গনমাধ্যম নিরীক্ষণে লিঙ্গীয় বিশ্লেষণ, গণমাধ্যম ও নারী, নারী সংহতি, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে প্রচার করা হয়েছে। নারী তার নিজস্ব উন্নয়ন নীতি নির্ধারণে অপারগ কেন হবে সেক্ষেত্রে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তি হল নারীর উপর আল্লাহই পুরুষের অভিভাবকত্ব দান করেছেন। কিন্তু তারা এ নীতিকে নারীর ন্যায় সঙ্গত য যৌক্তিক দাবী হিসেবে বিবেচনা না করে ধর্মীয় নীতির সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। এ ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যম গুলোর ভুমিকা আরো শক্তিশালী হওয়া বাঞ্চনীয় ছিলো। এ ক্ষেত্রে বিবিসির ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়, বিশেষ করে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা ও মতামতসমূহ। কিন্তু বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য বেসরকারী রেডিও চ্যানেলগুলিতে এ সংক্রান্ত বিশেষ কোন ফলপ্রসু অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হয়নি। সংবাদ পত্রগুলোতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকারী আন্দোলনকে স্বীকার করতে হয়। সংবাদ পত্রগুলি বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতন মূলক ছবি ছাপিয়ে মানুষের মনে এর বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিরোধ গড়ে তুলে। আবার অনেক সময় দেখা যায় কোন নির্যাতনকারীর ছবি ছাপিয়ে তার প্রতি তথা নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ঘৃনা ও প্রতিরোধ মূলক মানসিকতার জন্ম দেয়। আবার অনেক সময় কোন বর্বরোচিত হত্যাকান্ড মানুষের মনে ব্যাপক দাগ কাটে। কোন কোন সময় দু'একটি এ সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যম গুলি ব্যাপক ভাবে প্রচার প্রচারনা চালালেও পরে সে সম্পর্কে নিশ্চুপ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে হত্যাকারীর বিচার ফাঁসি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ খবরাখবর সংবাদ মাধ্যম গুলোতে প্রচার হলে অপরাধ প্রবন পুরুষের মনে নৃশংস কর্মকান্ড সম্পাদনের ক্ষেত্রে শাস্তিভীতি জন্মাবে। এতে সমাজে অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে। আজকাল অপরাধ জগত ও আইন সংক্রান্ত প্রতিবেদন মূলক টিভি অনুষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে সংবাদ মাধ্যম গুলো নারী উন্নয়ন ও অধিকার আন্দোলনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। এখানেও দেখা যায় এই প্রতিরোধের কাহিনী ব্যাপকতর রাজনীতির সাথে গুলিয়ে দেয়ার মনোভাব যাতে করে আন্দোলনের নারীবাদী চেতনা ধামাচাপা পড়ে যায় বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে। দুঃখ জনক হলেও সত্য যে আন্দোলনকে পরিচালিত করা হয়েছিল এই ভাবে। আবার এটা লক্ষ্যনীয় যে নারী আন্দোলন পত্র পত্রিকায় স্থান পায় তখনই যখন অন্যান্য খবরে ভাঁটা পড়ে।[১৭]

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা লালনকারী সাংবাদিকদের হাতে মুদ্রণ গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক স্বরূপ ক্ষুন্ন হয়। "সবাই যদি জেন্ডার সমতা ও সাম্যের ভিত্তিতে ভাষা নির্মাণ করেন তবে

[১৭] "নারীপক্ষ, নারী ও গণমাধ্যম প্রকল্পের রিপোর্ট, গণমাধ্যম ও নারী, নারী সংহতি, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী গণমাধ্যম পারে নারীর প্রতি সংঘটিত নানা বৈষম্য দূর করতে। কিন্তু তা করে না। আমার মনে হয় এর কারণ খোঁজা কঠিন নয়।

এক. সাংবাদিকরা শৈশবে শেখা যে ভাষার ভেতরে বড় হয়ে ওঠেন সেই ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে যান। তা থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তা করেন না।

দুই. নারীর প্রতি জেন্ডার সংবেদনশীল ভাবনায় তারা সচেতন থাকেন না।

তিন. মুখরোচক শব্দ ব্যবহার করে পত্রিকার বাণিজ্যিক কাটতি বাড়ানোও এক্ষেত্রে কাজ করতে পারে বলে অনুমান করা যায়। নারীকে পন্য হিসেবে চিন্তা করার মানসিকতাও এর পেছনে কাজ করে বলে অনুমান করা যায়।

যেমন কয়েকদিন আগে একটি পত্রিকার বড় বড় অক্ষরে ছাপানো সংবাদ টি ছিল এমন : 'এমপি হতে চাই' নারী নেত্রীদের হুড়োহুড়ি শুরু। সংবাদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে এমপি হতে বিএনপির মহিলা নেত্রীরা দলের শীর্ষ নেতাদের অফিস ও বাসায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। গত মঙ্গলবার মহিলা আসনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষনার পর নেত্রীদের দৌড়ঝাপ অনেকগুন বেড়ে গেছে।' (সংবাদ ০৪-০৮-০৫)। এ খবরটি এভাবে কি লেখা যেত না ঃ এমপি হতে চাই ঃ নেত্রীদের রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্যের জোর প্রকাশ। সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে এমপি হতে বিএনপি নেত্রীরা দলের শীর্ষ নেতাদের অফিস ও বাসায় যোগাযোগ করছেন। গত মঙ্গলবার মহিলা আসনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নেত্রীদের কর্ম তৎপরতা বেড়ে গেছে।' নেত্রী ব্যবহার করলেই নারী বোঝায়। নেত্রী-স্ত্রীবাচক শব্দ। সংবাদটি এভাবে লেখা হলে নারীদেরকে ব্যবহার করার প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হতো না। গণমাধ্যমে ভাষার শহনশীলতা নারীর মর্যাদা বাড়াতে সহায়ক শক্তি। একটি পত্রিকায় হরতালের সময় রাজপথে পুলিশের হাতে প্রহৃত একজন নারীর ছবি ছাপানো হয়েছে। ছবির ক্যাপশন ঠিক আছে। কিন্তু খবরে বলা হয়েছে : 'শান্তিপূর্ণ ঢিলেঢালা হরতাল পালিত'। (সমকাল : ০১-০৭-০৫) খবরের শিরোণামটি কি এমন হওয়া উচিত ছিল না ঃ 'শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ নারীর প্রতি সহিংস আচরণ করেছে।' ছবি এবং সংবাদ শিরোণামের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় এর ফলে। সংবাদের সঠিক বিশ্লেষণ তৈরী হয় না এবং আবারও মনে হয় এখানেও কৌশলে নারীকে পন্য বানানো হয়েছে। মিছিলকারী নারীর রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করেনি সংবাদ মাধ্যম। রাষ্ট্রীয় সহিংসতা দিয়ে নারীকে দমন রাখার প্রক্রিয়াটি আড়াল করা হয়েছে। যে দুটো সংবাদের উল্লেখ করলাম দুটো সংবাদই

Dhaka University Institutional Repository

নারীর রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে কিন্তু অধিকারের পক্ষে কোথাও স্পষ্ট এবং দৃঢ় উচ্চারণ নেই। এভাবে ক্ষমতায়নকে অদৃশ্য করা হয়।"[১৮]

'যতদিন নারীরা সংবাদ মাধ্যমের মোট সংবাদকর্মীর অন্তত ৫০ শতাংশ না হবে ততদিন তারা সংবাদ মাধ্যমকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারবে না। তবে শুধু নারীর অংশগ্রহণ বাড়ালেই হবে না তাদেরকে (নারী সাংবাদিকদের) অবশ্যই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা মুক্ত হতে হবে। অন্য দিকে পুরষ সাংবাদিকদেরও হতে হবে পুরুষতান্ত্রিকতা মুক্ত। তাদের বিশ্বাস করতে হবে-'নারীর অধিকার মানবাধিকার।'

দুর্ভাগ্যক্রমে এখানো পর্যন্ত আমরা সাংবাদিকতায় নিয়োজিতদের মধ্যে, বিশেষ কারে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে দায়িত্বরতদের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা প্রবল বলেই দেখতে পাই। পশ্চাৎপদ সমাজ দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে এখনো জ্ঞাতসারে কখনো বা নিজের অজ্ঞাতে তারা নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গির প্রকাশ ঘটায়। নারী হেয় প্রতিপন্ন হবে এমন ছবি তারা পত্রিকায় প্রকাশ করে। নারীর প্রতি নেতিবাচক অনেক শব্দ, ভাষা তারা প্রতিদিন নিজেদের কথায় সংবাদপত্রে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে বা অবশ্যই করা উচিত নয়। যেমন মক্ষিরানী, মধুকুঞ্জ এ ধরনের শব্দের ব্যবহার। খেলার পাতায় 'প্রমীলা' ফুটবল বা 'প্রমীলা' ক্রিকেট। কোন এক কালে যখন খেলাধুলায় মেয়েদের অংশগ্রহণ অভাবিত ছিল তখন বিদ্রূপাত্মক ভাবে ব্যবহৃত শব্দটি আজকের দিনেও অবলীলায় ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।........
এটি যে একটি নেতিবাচক ব্যবহার তা ওই রিপোর্টার নিজেও বুঝতে পারবে না।
একটা সময় ছিলো যখন একটি মেয়ে বই পড়বে সেটা ছিলো অপরাধ। কোন মেয়ে পায়ে জুতো বা চটি পরলে ও তা ছিলো অনেকের কাছে দৃষ্টি কটু ও বিরূপ আলোচনার বিষয়। আর চশমা পরলে তো কথাই নেই। আর ওই মেয়েরা প্রকাশ্যে স্কুলে-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে অথবা অফিসে আদালতে চাকরি করবে। এসবই ছিলো কল্পনাতীত। সেকালে যারা এসব ক্ষেত্রে পা বাড়িয়েছিল তখন তাদের নিয়ে টীকা-টিপ্পানির তো শেষ ছিলো না। সাহিত্য থেকে এর কিছু পরিচয় আমরা পেয়ে যাই; কিন্তু আজকের যুগে কোনো রিপোর্টার যখন কোনো নারী খুন হলে সে প্রসঙ্গে লেখেন, 'মহিলা অত্যাধিক স্মার্ট ছিলেন,- তা কি মেনে নেয়া যায়? ওই রিপোর্টার লিখেছেন, তিনি কলেজে চাকরি করতেন। পঞ্চাশের দশকে হাতাকাটা ব্লাউজ পরতেন। স্মোক করতেন এবং নিজে গাড়ি ড্রাইভ করতেন। মৃত্যুর সময়

[১৮] সেলিনা হোসেন, "গণমাধ্যমের সংস্থাপি," জেন্ডার ইন মিডিয়া, বুলেটিন-৬, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ওই বাড়িতে একা ছিলেন । এই রিপোর্টে প্রচ্ছন্ন থাকে এমন একটি ইঙ্গিত যেন তার স্মার্ট হওয়ার সঙ্গে তার নিহত হওয়ার কোন গূঢ় যোগসূত্র রয়েছে।”[১৯]

অথবা এ ও বোঝাতে পারে স্মার্ট মহিলা যিনি নিজে গাড়ি ড্রাইভ করেন তাদের পরিণতি এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক অথবা তাদের অন্য কোন দুস্কৃতি কারীর হাতে নিহত হওয়াই উচিত। আসলে গোটা পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই নারীর স্বনির্ভরতার বিপক্ষে যেন কথা বলতে পছন্দ করে এবং নারীর উন্নয়নের চেয়ে নারীর বেশভুষা নিয়ে সমালোচনা করাটা যেন একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এত সব নেতিবাচকতার মধ্যেও সমাজের মধ্যে একটি মতাদর্শিক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। সমাজ আজ নারী শিক্ষা ও তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্বীকৃতি দিচ্ছে সার্বিকভাবে। এখন সমাজ (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) কর্মক্ষেত্রে নারী পদচারণাকে স্বাভাবিক চিত্র হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। এখন সংবাদপত্র নারী পাতা গুলোতে নারীর সামাজিক ভূমিকাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এখন এ গুলোতে নারীর মন ও মানসিকতার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। তবে একথা সত্য যে, আমরা যেভাবে নারীর সংগ্রাম, লড়াই এবং ভিতরে ভিতরে যে সব নিয়ামকগুলো তার উন্নয়নের বিপক্ষে কাজ করছে সে গুলোর সংবাদ দেখা যাচ্ছে কম।

সামাজিক ফতোয়াবাজী ছাড়া ও ঘরে ঘরে নারীর উন্নয়ন বিরোধী যে সব ফতোয়াবাজী চলছে তার সার্বিক চিত্র সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভবপর হচ্ছে না। তবে নারীর জীবনের যে বহুমাত্রিকতা তা এখন কিছুটা হলেও নারী পাতায় ফুটে উঠছে। নারীর বহির্জাগতিক সম্পৃক্তির বিভিন্ন মুখিনতা যেমন আমরা এখন এই পাতাগুলোতে দেখতে পাই, তেমনি আবার তার গৃহজীবনের ও অনেক কথার প্রকাশ, যা আগে ছিল অপ্রকাশিত। আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান ও এখনো সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর পেছনে যে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলো রয়েছে সে সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করে তোলা ও তা দূর করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের একটি মূখ্য ভূমিকা রয়েছে। এখন ও সমাজে বিদ্যমান অনেক বিষয় রয়েছে যা জনপরিসরে আলোচিত হওয়া দরকার, নারী পাতা সেই সুযোগটি দেয়। তবে নারী পাতার পাঠক যে শুধু নারীর জন্য এমন চিন্তাও করা ঠিক নয়। কারণ নারীর উন্নয়ন চিন্তা শুধু নারীর মঙ্গল করে আনবে না -এটা গোটা মানবজাতির জন্য হিত কর। তাই পুরুষ সমাজকেও এ সম্পর্কে সচেতন হতে হব। জেন্ডার সমতা আনায়নে

---

[১৯] নাসিমুন আরা হক মিনু, প্রাগুক্ত, পৃ .৭।

Dhaka University Institutional Repository

নারী পুরুষ উভয়েরই ভূমিকা, সমস্যা, সম্ভাবনার দিকগুলো ক্রমাগত এমন ভাবে প্রকাশিত হওয়া দরকার যেন জেন্ডার নির্বিশেষে সবাই এ বিষয় গুলো সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

নারী-জীবনের সার্বিক সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরার জন্য দরকার সংবাদ মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করণ। কারণ নারীর যাবতীয় সমস্যাগুলো তুলে আনতে হলে নারীর কাছাকাছি যেতে হবে তার সাথে ঘনিষ্টভাবে মিশতে হবে এবং কথা বলতে হবে। এ জন্য সংবাদ মাধ্যমে দক্ষ নারী সংবাদ কর্মী বৃদ্ধির প্রয়োজন। একজন নারী সংবাদ কর্মীই পারে একজন নারীর সার্বিক সমস্যা সম্ভাবনা গুলো সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে। আর তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা একজন নারী সংবাদ কর্মীর কাছে অনেকটা সহজ ভাবে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে পুরুষের ক্ষেত্রে সেটা ততটা সহজ হয় না। বিটিভিসহ "আজকাল স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেগুলোর 'খবর' দর্শকদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে জনপ্রিয় হয়েছে টিভি রিপোর্টিং।

বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে মহিলা রিপোর্টাররা যেভাবে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন তা মহিলাদের ক্ষমতায়ণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।
(বন্ধ ঘোষিত) ইটিভির মাধ্যমে মহিলা সাংবাদিকরা টিভি রিপোটিং এর সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর সেই সুযোগে মহিলা সাংবাদিকেরা বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন আজ তারই ফল দেখা যায় বিভিন্ন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে। আমাদের সংবাদপত্রে দীর্ঘদিন যাবত মহিলারা কাজ করছেন। কিন্তু সাব এডিটর, সহকারী সম্পাদক, মহিলা পাতার সম্পাদক ছাড়া মহিলাদের অন্য কোন পদে তাদের দেখা যেতো না। কয়েককজন মহিলা 'রিপোর্টার' হিসেবে কাজ করলেও তাদের তেমন দায়িত্বপূর্ণ কভারেজের সুযোগ দেয়া হতো না। অধুনা সংবাদপত্রেও পরিস্থিতির কিছুটার পরিবর্তন হয়েছে। বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে মহিলা রিপোর্টাররা রাজনীতি, অর্থনীতি সহ বেশ ঝুঁকিপূর্ন অনুসন্ধানী রিপোর্ট লিখছেন। যা আগে দেখা যায়নি। তবে সংবাদপত্র ব্যবস্থাপকরা এখনো মহিলা রিপোর্টারদের উপর আস্থা রাখতে পারেন না। বেশির ভাগ সংবাদপত্র মহিলাদের 'রিপোর্টার' হিসেবে নিতেই আগ্রহী নয়।

এরকম পরিস্থিতিতে কয়েকটি টিভি চ্যানেলে মহিলা রিপোর্টাররা যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা শুধু অভিনন্দনযোগ্য নয়। অনুসরনযোগ্যও বটে। এখন টিভির 'খবর' মেয়েদের রিপোর্ট করতে দেখে অনেক মেয়ের মধ্যে 'টিভি সাংবাদিকতা' কে পেশা হিসেবে নেবার আগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

জন্মাচ্ছে। যারা নিয়মিত টিভির 'খবর' দেখেন তাদের সকলের কাছেই মহিলা টিভি রিপোর্টাররা খুব পরিচিত হয়ে উঠেছেন। যেমন, মুন্নী সাহা, শাহনাজ মুন্নী, ফারজানা রূপা, ফাহমিদা সুলতানা, নাদিরা কিরণ, মেহেরুন রুনী, জান্নাতুল বাকী কেকা, শারমিন রিনভী, শ্রীপলা তানজিন, ডঃ তাহমিনা ও আরো অনেকে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের মিডিয়ায় নারী টিভি রিপোর্টারদের উপস্থিতি ও দক্ষতা প্রদর্শন নারীর ক্ষতায়নে একটা বড় পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে।"[২০]

আজকাল বেশ কিছু তরুণ মহিলা রিপোর্টারকে বিবিসি, ভয়েস অব অ্যামেরিকাসহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী বেতারের খবরে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে বিবিসির কয়েক জন তরুণ নারী সংবাদ কর্মী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেশের বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সংবাদপত্র বিষয়ক আলোচনা পর্যালোচনা ও সাক্ষাৎকার পর্বে অংশগ্রহণ করছেন। নারী সুযোগ পেলে যে কোন ক্ষেত্রে সফলতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে এদেঁর কর্মকান্ড দেখলে তা অতি সহজে অনুধাবন করা যায়। সংবাদ মাধ্যমে নারী সংবাদ কর্মীদের এই সফল পদচারণা সমাজের গতানুগতিক মতাদর্শকে পরিবর্তণ করে দিচ্ছে একথা মানতেই হয়। সমাজে নারীর ইমেজ এ ক্ষেত্রে অনেকটা বদলে দিয়েছে সংবাদ মাধ্যমে।

"নারী পাতার সম্পাদকদের আগের তুলনায় নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। নারী পাতাগুলো এখন আর শুধু ফ্যাশন, সৌন্দর্য রক্ষার আর টিপসই ছাপে না, কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও মাঝে মাঝে সেখানে স্থান পায়। নারী পাতাগুলো নারী ইস্যুগুলো আরো পরিকল্পিতভাবে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে পারে। কোন ঘটনায় সিডো (CEDAW) লঙ্গিত হচ্ছে, লঙ্গন হচ্ছে নারীর মানবাধিকার, নারী পাতাগুলো এ বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারে। নারী রিপোর্টাররা এ বিষয়গুলো নিয়ে আরো অনেক বেশি রিপোর্ট লিখতে পারেন। সিডোর প্রতিটি ধারাকেই তারা জীবন ঘনিষ্ঠ ভাবে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সময়ে রিপোর্ট লিখতে পারেন। এ বিষয়ে নারী আন্দোলন যত সোচ্চার হবে যতো তারা কর্মসূচি পালন করবে ততোই বিষয়গুলো আলোচনায় আসবে। তাদের আন্দোলনই সংবাদপত্রে আসবে খবর হয়ে। এ ব্যাপারে আন্দোলন জোরদার করা জরুরি। জরুরি, সংবাদ মাধ্যমে নারীদের

[২০] নিজস্ব প্রতিনিধি, 'টিভির খবরঃ মহিলা-রিপোর্টারদের জনপ্রিয়তা,' জেন্ডার ইন মিডিয়া, বুলেটিন : ৬, অক্টোবর ২০০৫-মার্চ ২০০৬, পৃ.৪।

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণ্যভাবেবাড়া। সেই সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের নারী-বৈরী মানসিকতা পরিবর্তন করে নারী অনুকূল মানসিকতত গড়ে ওঠাও প্রয়োজন।

সবশেষে বলা যায়, নারী অধিকারের বিষয়গুলো আগের তুলনায় সংবাদপত্রে সামান্য বেশি প্রকাশ হচ্ছে। তবে নারী ইস্যুগুলো গুরুত্বের সঙ্গে সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমে আরো অনেক বেশি স্থান পাওয়া জরুরি।"[২১]

(CEDAW) সিডোর ৯ নং ধারায় নাগরিকত্ব আইনে নারী পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সংবিধানে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের তিনটি মৌলিক ভিত্তির সাথে সিডো সনদের মূল দর্শনের মিল পাওয়া যায়। যথা ঃ–

১। সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের সমতা [ধারা ২৬/১১]

২। আইনের দৃষ্টিতে সমতা [ধারা ২৭, ২৮ (১)]

৩। নারীর অনগ্রসরতা মোচনে বিশেষ সহায়ক বিধান প্রণয়ন [ধারা ২৮ (৩)]।

অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিধানের ক্ষেত্রে সংবিধান ও সিডো সনদের মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকলেও লিঙ্গ সমতা স্থাপনের পূর্বশর্ত হিসেবে দুটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা আমাদের সংবিধানে প্রতিফলিত হয়। প্রথমত, বৈষম্যকে বেআইনি বা অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়নি এবং দ্বিতীয়ত, পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনে নারী-পুরুষের সমতা বিধান করা হয়নি। সংবিধানে এ দুটি বিধানের অনুপস্থিতির কারনে বাংলদেশে সিডো সদন পূর্ণ বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব রয়ে গেছে এবং সব নাগরিকের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান সত্ত্বেও নারী আইনগত ও প্রকৃত সমতা লাভ করতে পারছে না।"[২২]

এক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণিত হওয়া দরকার। বার বার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও এবং জাতিসংঘের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সরকার এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। "জনকণ্ঠ নারী রিপোর্টার বিষয়টি নিয়ে স্টোরি লিখলেও রিপোর্টটি কিন্তু পত্রিকার একেবারে ভেতরের একটা কম গুরুত্বহীন পাতায় ছাপা হয় গুরুত্বহীন রিপোর্টের সঙ্গে। ওই পত্রিকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের নারীর প্রতি বা নারী ইস্যুর গুরুত্ব সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে। ....

আসলে এই সব কর্তা ব্যক্তিরা পত্রিকার পাঠক বা ক্রেতা বলতে মানসচক্ষে পুরুষদেরই দেখতে পাচ্ছেন। এটা তাদের আদ্যিকালের মানসিকতা। এই মানসিকতার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি।"[২৩]

---

[২১] নাসিমুন আরা হক মিনু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

[২২] ঝুমা হালদার, 'মিথ ও নারী অধিকার', জেন্ডার ইন মিডিয়া, বুলেটিন -৮, আগষ্ট-অক্টোবর ২০০৭, পৃ . ৮।

[২৩] নাসিমুন আরা হক মিনু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে, তার উপর হামলা হলে, স্বীয় ঘরে অত্যাচারিত হলে সংবাদ মাধ্যম গুলোর সক্রিয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা প্রয়োজন। নারীর সম্ভ্রম হানিকর ঘটনা ঘটলে কিংবা নির্যাতন হলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে কোন অপরাধী যেন পার পেয়ে যেতে না পারে সে ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যমগুলোর ব্যাপকভাবে সক্রিয় প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার আবশ্যক। স্বীয় গৃহে নির্যাতন সহ্য করে এদেশের অনেক নারী মুখ বুজে থাকেন। এটিকে ব্যক্তিগত সমস্যা মনে না করে একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখার উপর জোর দিতে হবে। অত্যাচারি পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ৯৯৯ জাতীয় বিশেষ ভিজিট টেলিফোন নম্বরে জানানোর মত ব্যবস্থা সরকারের গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সংবাদ মাধ্যমগুলি ব্যাপক প্রচার চালাতে পারে।

আবার কর্মজীবী নারীর মাতৃত্ব কালীন ছুটির নির্দিষ্ট সময় সীমা সরকারী ভাবে ঘোষিত হলেও অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তা মানা হয় না। এ ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যমগুলো ভূমিকা রাখতে পারে। প্রসূতি মাতার ছুটি শেষে সদ্য পিতাকেও পিতৃত্ব (নিদিষ্ট সময়ের) ছুটি দেয়া জরুরী যাতে পুরুষ সমাজের মধ্যে সন্তানের প্রতি সমান দায়িত্ব বোধ তৈরী হয়। আবার কর্মজীবী নারীর সন্তান লালন পালনের অসুবিধা দূর করার জন্য নারী কর্মী প্রধান প্রতিষ্ঠান গুলোতে দিবা যত্নকেন্দ্রর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সব কর্ম ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় বলে সরকারীও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে শহরের প্রতিটি এলাকায় জন সংখ্যার ঘনত্ব ও প্রতিষ্ঠানের ঘনত্ব অনুপাতে দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করার দিকে জোর দিতে হবে। এতে নারী লেখাপড়া ও কর্মক্ষেত্রে আরো বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে। সংবাদ মাধ্যম গুলো এ ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর হলে নারীর কর্মক্ষেত্রে গমনের প্রতি সামাজিক যে নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে তা দূর হবে। তবে কোন তাৎক্ষনিক পরিবর্তন সমাজে আসবে এরকম আশা কেউ করে না। তবে সংবাদ মাধ্যম গুলোর জেন্ডার সংবেদনশীল প্রচারণাই পারে সমাজে নারীর 'ইমেজ'কে আরো ইতিবাচক করে তুলে ধরতে বদলে দিতে পারে কার্যকর উন্নয়ন তথা নারী উন্নয়নের সঠিক পথ।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

৭.১ বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিরীক্ষণঃ জেন্ডার বিশ্লেষণ

৭.১.১ মতাদর্শ ও ইমেজ নির্মাণে নারী

৭.২ চলচ্চিত্র মাধ্যমে নারী

৭.২.১ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারী

৭.৩ চলচ্চিত্রে নারীবিরোধী ভাবনাঃ অতীত ও বর্তমান

৭.৪ চলচ্চিত্রে পুঁজি বিনিয়োগকারী ও পরিচালকদের মানসিকতা

৭.৫ টেলিভিশন ও নারী

৭.৬ আকাশ মাধ্যমে প্রাপ্ত নারী ইমেজ ঃ দেশীয় সংস্কৃতির সংকরায়ন

৭.৭ বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ণ

৭.৭.১ বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ণঃ গবেষণার আলোকে

৭.৮ বাংলাদেশের চিত্রকলায় নারী

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

৭.১ বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিরীক্ষণ ঃ জেন্ডার বিশ্লেষণ ।

মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনার মধ্য দিয়ে সামাজিক মতাদর্শ নির্মাণ, প্রণয়ন, উত্থাপন, জ্ঞাপন ও বহাল রাখার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি সমাজের চিত্রের পূর্ণ উপস্থাপন ও রূপায়ণ গণমাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বলে সে সমাজের নারী পুরুষ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম নিরীক্ষণ জরুরী। আবার এভাবেও বলা যায় গণমাধ্যম নিরীক্ষনের মাধ্যমে একটি দেশের জেন্ডার বিশ্লেষণ সম্ভব গণমাধ্যম নিরীক্ষনের সাধারন ধারা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। "প্রথমত, গণমাধ্যমের সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে একটি দ্বিবিধ সম্পর্ক (two way relationship) রয়েছে। যা বর্তমান, মিডিয়া তার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে আবার সামাজিক বাস্তবতার উপর প্রভাব ফেলে। গণমাধ্যম কি এবং কিভাবে দেখাবে/তুলে ধরবে, তা বাছাই করে, এবং এই বাছাই করণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবতা ব্যাখ্যা করে এবং সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ গণমাধ্যম নিরীক্ষণের অন্যতম আলোকপাত হচ্ছে, নারীর যৌনবাদী (Sexist) চিত্রায়ন, নারীর ইমেজের বিকৃতি, এবং ষ্টিরিওটাইপ প্রচার। তৃতীয়ত, এটা বলা হয় যে গণমাধ্যম অদৃশ্যভাবে কাজ করে এবং এর ব্যাপ্তি সর্বব্যাপী। এটা সাধারনত ধরে নেয়া হয় যে, গণমাধ্যম যা উন্নততর প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত এবং উন্নয়নশীল দেশের শহুরে এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ কারণেই ধরে নেয়া হয় যে এর প্রভাব গ্রামীণ এবং/ অথবা দরিদ্রদের মধ্যে কম। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদীদের মতে 'উন্নয়ন যোগাযোগ গণমাধ্যম, (development communications media) যা সরকার ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে বিস্তার লাভ করছে, এবং এর প্রভাব অনুল্লেখিত থেকে যায়। চতুর্থত, সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারণে নারীদের পৃথকীকারণ, পর্দা প্রথা গণমাধমকে প্রভাবিত করে। এর ফলে নারীরা গণমাধ্যমে খুব বেশী প্রতিফলিত হয় না, হলেও তাদের দুঃখ-দুর্দশাকে 'অরাজনৈতিক' বিষয় হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়। একে মনে করা হয় পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপার" ।[১]

---

[১] রেহনুমা আহমেদ, 'পাশ্চাত্য ও তৃতীয় বিশ্বের গণমাধ্যম নিরীক্ষণের পর্যালোচনা, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সুরাইয়া আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত গণমাধ্যম ও নারী, নারী সংহতি, পৃঃ ৬-৭।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১.১. মতাদর্শ ও ইমেজ নির্মাণে নারী

বাংলাদেশের মত একটি ব্যাপক নিরক্ষর, অশিক্ষিত ও আধাশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দেশে সাধারনত গণমাধ্যমে যাই প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়, তার অনেক কিছুই মানুষ অনেক সহজে গ্রহণ করে বা বিশ্বাস করে এবং ব্যক্তি জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করে। সাধারনত ছাপার অক্ষরে কোন কিছু লেখা দেখলে এই শ্রেণীর জনগন তা তীব্রভাবে বিশ্বাস করে। আবার শ্রবণ দর্শন মূলক কোন প্রচারণায় ও এই ব্যাপক জনগোষ্ঠী দারুন ভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং প্রচার মাধ্যমের চরিত্রের উপর সামাজিক মনোভাব, আদর্শ বা মতাদর্শ গড়ে উঠে। আর এই প্রচার মাধ্যম বা গণমাধ্যম গুলো সব সময় কেন্দ্রে অবস্থান করে ধর্ম, শ্রেণী, গোষ্ঠী বা নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতার বোধ তৈরী করে এবং সাথে সাথে প্রান্তিকতার ভিত রচনা করে।

মতাদর্শের মধ্যে ক্রিয়াশীল ঃ প্রতীকী ক্ষমতা, প্রতীকী সন্ত্রাস, ভাষাগত পুঁজি। মতাদর্শ শব্দ এবং মতাদর্শের মধ্যে এইসব উপাদানের গঠনের মধ্যে ভিন্নতা আছে। মতাদর্শ শব্দ থেকে যেক্ষেত্রে প্রতিবাদী/বিকল্প/বিরোধি মতাদর্শের খোজঁ মেলে, সেক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়ায় মতাদর্শের মধ্যে কিংবা প্রতিবাদী/বিকল্প/বিরোধি মতাদর্শের মধ্যে প্রতীকী ক্ষমতা, প্রতীকী সন্ত্রাস, ভাষাগত পুঁজি লুকানো থাকে তার কিংবা তাদের খোঁজ মেলে না। এক ঘর পুরুষের মধ্যে একজন নারীর উপস্থিতি; কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজারের সামনে একজন গরীব কৃষকের উপস্থিতি; গোয়েন্দা সংস্থার অধিকর্তার সামনে একজন প্রতিবাদী যুবকের উপস্থিতিঃ সব ক্ষেত্রে (নারীটি, কৃষকটি, যুবকটি) অন্যপক্ষে একটি প্রতীকী সন্ত্রাসের অধীন, অন্যপক্ষের ভাষাগত পুঁজি তুলনামূলকভাবে কম, অন্যপক্ষ ক্ষমতার মাত্রায় তুলনামূলকভাবে দুর্বল। এ ভাবে ব্যক্তি, গ্রুপবিচ্যুত ব্যক্তি কিংবা অন্য শ্রেণী প্রান্তিক হয়।"[২] এভাবে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের মাধ্যমে যে মতাদর্শ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে কিংবা হচ্ছে তার দ্বারা নারীকে প্রন্তিকতারও প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

প্রান্তিক ব্যক্তি, প্রান্তিক গ্রুপ কিংবা প্রান্তিক শ্রেণীর প্রতিরোধের যোগ্যতা চেতনার যোগ্যতা মনে করা ঠিক নয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র, যে-গ্রুপ কিংবা শ্রেণী দরিদ্র তারা অনেক কিছু মেনে নেয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক কিছু না জেনে মেনে নেয়। জীবনের সিদ্ধি তারা প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা বলে মাণে। যারা জীবনে (ব্যক্তি গ্রুপ, শ্রেণী) অধিকতর সিদ্ধ, সার্থক, তারা

---

[২] বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, "প্রান্তিকতাঃ সংস্কৃতি এবং মতাদর্শ", সমাজ নিরীক্ষণ, ৪৬, নভেম্বর ১৯৯২, পৃঃ ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকতর প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাবান। এভাবে তারা নিজেদের বহির্ভূততা মেনে নেয়। প্রান্তিকতা, কোন কোন ক্ষেত্রে বহির্ভূততার ফল। বহির্ভূততা উদ্ভুত অবস্থা থেকে তৈরি হয় হতাশা, উদ্যমহীণতা, বিদ্যমাণতার স্বীকৃতি (বিদ্যমানতার অন্তর্গত নির্যাতন, শোষন, অন্যায়, মিথ্যা)। প্রান্তিকতা সেজন্য কর্তৃত্বহীনতা।[৩]

বাংলাদেশের সমাজে লিঙ্গ ভিত্তিক ইমেজ (Gender based image) গঠনে বিদ্যমানতার মধ্যে এসব উপাদান (কর্তৃত্ব, কেন্দ্র ও প্রান্তিকতা) কাজ করে। এ খানে শুধুমাত্র নারীর ইমেজ শব্দটি ব্যবহার না করে লিঙ্গ ভিত্তিক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; "যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ের ইমেজ এবং তাদের মধ্যে বিরাজিত সম্পর্ক, এই সম্পর্কসমূহ সামাজিক প্রতিষ্ঠান যথা পরিবার রাষ্ট্র ইত্যাদিকে কি ভাবে প্রভাবিত করে বা তাদের দ্বারা কি ভাবে প্রভাবিত হয় এ সকল বিষয় বিশ্লেষণের পরিধিকে প্রসারিত করে। আমি ইমেজগুলোকে চারটি বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে বিনির্মাণহীন (deconstruct) করব। এ গুলি একটি অপরটির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তবে তা আবশ্যিক বা নির্ধারকভাবে নয়। এ চারটি ক্ষেত্র হল ঃ (১) প্রযুক্তি (technology), (২)) ভোগ (consumption), (৩) মতাদর্শ (ideology) (৪) নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা (controlling institutions)।[৪]

এ পর্যায়ে এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইমেজ নির্মানে লিঙ্গীয় পক্ষপাতিত্ব (gender bias) কি ভাবে বাংলাদেশের কর্তৃত্বশীল গণমাধ্যমে ক্রিয়াশীলতা চিত্রায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।
মেঘনা গুহঠাকুরতা তাঁর 'বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিরীক্ষণে লিঙ্গীয় বিশ্লেষণ' -প্রবন্ধে বলেছেন প্রযুক্তিগত এবং ভোগ পদ্ধতিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তিনি গণমাধ্যমে লিঙ্গীয় পক্ষপাতিত্ব এ সকল পদ্ধতিতে কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন এ ভাবে ঃ

---

[৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮-৯৯।
[৪] মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, "বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিরীক্ষণে লিঙ্গীয় বিশ্লেষণ, মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম ও অন্যান্য সম্পাদিত গণমাধ্যম ও নারী, নারী সংহতি, পৃঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

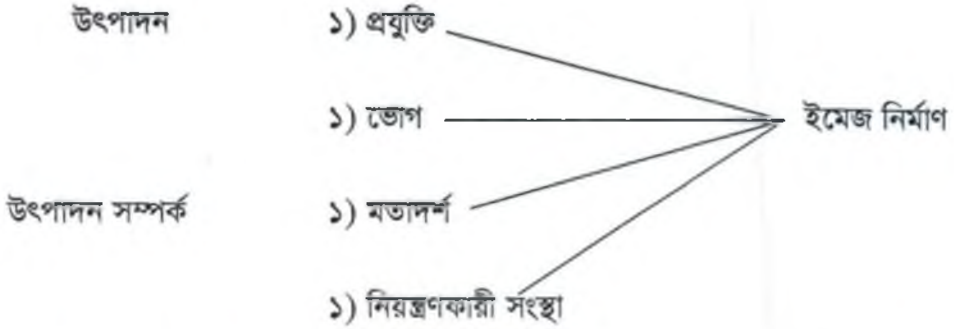

(সূত্র ঃ মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিরীক্ষণে লিঙ্গীয় বিশ্লেষণ, গণমাধ্যম ও নারী, নারী সংহতি, পৃঃ ৯)।

প্রযুক্তি ঃ

বাংলাদেশে লাঙ্গল, ট্রাকটর, হতে মুঠোফোন, কম্পিউটার পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত মাধ্যম পাশাপাশি অবস্থান করে। প্রযুক্তির বিভিন্ন ধরন ও পর্যায়ের সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নারী গৌণ ভূমিকা পালন করে বলে মনে করা হয় এবং পিতৃতান্ত্রিক আইনের কারণে উৎপাদনের উপকরণের উপর তাদের কোন মালিকানা (থাকে না বা) থাকলেও তা অস্বীকার করা হয়। "কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে (লাঙ্গল প্রযুক্তি) একটি জনপ্রিয় শ্লোগান এই পুরুষ পক্ষপাতিত্বকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলেঃ 'লাঙ্গল যার জমি তার'। কৃষিতে বর্তমান লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের ফলে একজন নারী জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছে সেটা কল্পনা করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং কার্যত এই দাড়াঁয় যে শুধুমাত্র পুরুষই জমির মালিক, এমনকি শোষনমুক্ত সমাজেও। অপরপক্ষে এটাও সত্য নয় যে নারী প্রথাগত কৃষি উৎপাদন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে না। কৃষি উৎপাদন এবং প্রক্রিয়ারণের সিংহভাগ কাজ নারীই করে থাকে যেমন-বীজ সংরক্ষন, ধান ভেজানো, ধান ভানা, ধান ঝাড়া, মুড়িভাজা ইত্যাদি। কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ন্যায় শক্তিশালী গণমাধ্যম কর্তৃক এসব তথ্য স্বীকৃতি পায়নি। অধিকন্তু শ্রমের ধারনাটিকে গণমধ্যমে পুরুষমুখী করা হয়েছে।"[৫] বাংলাদেশ টেলিভিশনকে বেশি শক্তিশালী মনে করা হয় এ কারণে যে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ও এর প্রচার রয়েছে। এবং গ্রাম-গঞ্জের দরিদ্র শ্রেণীর পক্ষে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয় এবং সর্বত্র এর সুবিধাও মিলেনা। আবার প্রত্যন্ত এলাকার বিটিভির অধিকাংশ দর্শকই পুরুষ, যুবক ও শিশুরা। নারী তার দৈনন্দিন গৃহকর্মের ফাঁকে টেলিভিশন দেখার অবসর খুব কমই পেয়ে থাকে। আর টিভির কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠানে এর সঙ্গে নারীর

[৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পৃক্ততা খুব কমই স্বীকার করা হয়। এক্ষেত্রে বিটিভির কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান কৃষি বিষয়টিকে একমাত্র পুরুষের অধীন এবং পুরুষকেই কৃষক হিসেবে পৌনঃ পুনিক ভাবে প্রচার করে। এ ভাবে প্রচার মাধ্যম পুরুষের প্রভূত্ববাদীতা টিভির মাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে (নারীকে) কৃষি, জমি ও সম্পত্তির মালিকানা থেকে নারীকে প্রান্তিকতা ও বহির্ভূততার দিকে ঠেলে দেয়, যা মতাদর্শগতভাবে নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে। "শ্রম ও কষ্টসাধ্য কাজ শুধুমাত্র পুরুষই করতে পারে বলে মনে করা হয়; যেমন কৃষক এবং জেলে বলতে আমরা শুধু পুরুষদেরই বুঝে থাকি। অন্যদিকে নারীদের শ্রমকে শুধু খাটো করেই দেখা হয় না, বরং 'রোমান্টিসাইজ' (romanticise) ও করা হয়। বাংলা সাহিত্যের সাধারন প্রবাদের কথাই ধরা যাক ঃ 'ছেলের হাতে মোয়া' যা প্রতিকী অর্থে সহজলভ্য দ্রব্যকে বোঝায়। এটা কি অতই সহজ? মুড়ি ভাজা যে কোন গৃহকর্ত্রীর জন্যে একটি অত্যন্ত শ্রম ও সময় সাপেক্ষ কাজ যেখানে তাপ ও ধোঁয়ার সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা প্রয়োজন, আবার এই প্রবাদ মা ও ছেলের (এ খানে লক্ষ্যনীয় যে 'ছেলেকে' উল্লেখ করা হয়েছে) আদর্শিক ও রোমান্টিক সম্পর্কের প্রতীক; যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাঙ্গালী শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি বিরাট অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গল্প, কবিতা ও সিনেমায় প্রায়ই দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে পুত্রের ঘরে ফিরে আসা এবং তাদেরকে প্রিয় খাবার পরিবেশনের প্রতীক্ষায় মায়েরা অপেক্ষা রত। এ ভাবে নারীদের শ্রম বিশেষ করে রান্নাবান্নার শ্রমকে প্রশংসিত ও রোমান্টিকতাপূর্ণ করা হয়েছে। অথচ সেভাবে পুরুষের শ্রমকে করা হয়নি।[৬]

রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে নারীশ্রমের একটি বিশেষ দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তা হচ্ছে সমাজের পুনরুৎপাদক হিসাবে নারীর ভূমিকা। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যবস্তু নারী। রেডিও টেলিভিশনে উন্নয়নের মূল স্রোতে নারীর শ্রমকে উপেক্ষাও অস্বীকার করা হলেও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে নারীকেই মূল টার্গেটে পরিণত করা হয় এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিশু লালন পালন সম্পর্কিত আলোচনায় অনেকটা সময় ব্যয় করা হয়। এ সম্পর্কিত নাটক-নাটিকা গুলিতে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের সাথে নারীকে রোমান্টিসাইজ করে এ সংক্রান্ত পুরুষের দায়িত্বকে প্রচ্ছন্ন ভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

শহর ভিত্তিক এলাকায় যেখানে উন্নততর প্রযুক্তি বিদ্যমান, সে ক্ষেত্রেও নারীদেরকে উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গৌণ হিসেবে দেখান হয় আর পুরষকে মূখ্য অবদানকারী হিসেবে

[৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায়। প্রথাগত ভাবে শিল্প শ্রমে খুব কম সংখ্যক নারীকে নিয়োগ করা হয়। অবশ্য ইদানিং কালে এদেশের অর্থনীতিতে প্রধান শিল্প হিসেবে পোশাক শিল্পের যে বিকাশ হয়েছে সে ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় নারীদের নিয়োগের মাধ্যমে এক নতুন মাত্রার সৃষ্টি হয়েছে। এ জাতীয় সাব-কন্ট্রাকট ব্যবসার বিকাশের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে সস্তা শ্রম, যে শ্রম তৃতীয় বিশ্বের রিজার্ভ নারী শ্রমিক ছাড়া অন্য কোথাও দৃশ্যমাণ নয়।

পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের স্বল্প বেতন এবং কাজের প্রতিকূল পরিবেশ সাময়িকী, সংবাদপত্র এবং ডকুমেন্টারীর জন্য অত্যন্ত প্রিয় সংবাদে পরিনত হয়েছে। বর্তমানে তামাক বিড়ি শিল্প, চা-শিল্প, সৎস্য শিল্প, নির্মাণ শিল্প, জুতা ও চামড়া শিল্প, যাতায়াত ও রাস্তাঘাট মেরামত ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ থাকলেও ততটা দৃশ্যমানতা লক্ষ্য করা যায় না। তবে চা-বাগানের শ্যামল প্রকৃতির সাথে নারীকে একাকার করে একে রোমান্টিসাইজ করতে মিডিয়া গুলি ভুল করে না। বর্তমানে মুঠোফোন, রেডিও, টিভি, কম্পিউটার এ ইত্যাদি উন্নত প্রযুক্তির উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বাজার জাতকরণ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে তবে তা অবশ্যই কেন্দ্রীয় অবস্থান নয়। বীমা কোম্পানীর কয়েকটি বিজ্ঞাপন ব্যতীত সাহিত্য, নাটক, গান, কবিতা সমগ্র জগতে নারীকে হয় অনুপস্থিত নয় প্রান্তিক অবস্থানে দেখা যায়।

ভোগ

পুঁজিবাদী অর্থনীতি সর্বত্র ভোগবাদের (Consumerism) বিকাশ সাধন করেছে। ভোগের পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে কম বেশী বাজার সম্প্রসারনের (market peretration) ক্ষেত্র এবং ভোগের ধরনকেই সুস্পষ্ট করে তোলে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজার সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরন পরস্পর পরিপূরক ও ক্রীয়াশীল। এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ভোগবাদ বিকাশের নির্দেশক হিসেবে ক্রীয়াশীল থাকে। বিজ্ঞাপন শিল্পের জন্যে খোলা বাজার এবং মুক্ত প্রতিযোগীতায় পন্য বাজার জাতকরনের চমকপ্রদ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেছে। উন্নততর যোগাযোগও প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে এই শিল্পের ব্যাপ্তি এবং বিকাশ উভয়ই প্রষ্ফুটিত হয়।

"ধনতন্ত্রের উত্তব ও বিকাশের লজিক অনুসারে ভোক্তা গোষ্ঠীর (consumer group) সৃষ্টি হয়, সেখানে গৃহস্থলী দ্রব্য সামগ্রীর (household goods) ভোক্তা হিসেবে গৃহ বধু, অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

নারীর স্থান উল্লেখযোগ্য। খোলা বাজারের নিয়ম পনায়ন পদ্ধতির (commoditisation process) জন্ম দেয়, নারী বিশেষ করে তার যৌনতা (sexuality) এই পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত। উদাহরণ স্বরূপ, কোন একটি জিনিসকে চিত্রিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞাপনে নারীর দেহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পশ্চিমা সমাজে এ দুটি উপাদানই অত্যন্ত চরম অবস্থায় বিদ্যমান। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ করে রাষ্ট্র প্রণীত মালিকানা এবং বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ নীতিতে উৎসাহ দানের কারণে এ ধরনের প্রবণতার ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এখানে উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে না যে বাংলাদেশ সরকারের ঔষধনীতির ফলে কতিপয় বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানী অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে টয়লেট্রিজ ও প্রসাধনী দ্রব্যাদি তৈরীর শিল্পে পরিণত হয়েছে যেখানে নারীই প্রধান ক্রেতা। ব্যক্তি মালিকানাধীন দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।[৭]

এখনও বাংলাদেশের বাজার নিয়ন্ত্রণ মূলত; পুরুষের হাতে। পূর্বে প্রযুক্তির প্রসারতা যখন সীমিত ছিল তখনও একথা সত্য ছিল, এখনও সত্য। গ্রামীণ সামাজিক নিষেধাজ্ঞার কারণে দৈনিক বা সাপ্তাহিক বাজারে নারীর উপস্থিতি খুবই স্বল্প। কিন্তু বর্তমানে দারিদ্রের প্রসারতা অনেক নারীকে গৃহের বাইরে শ্রম বাজারে টেনে এনেছে। এদেশের হাট বাজারে পুরুষের দৃশ্যমানতা অপেক্ষাকৃত বেশী হলেও ভোক্তা হিসেবে নারীকে টার্গেট করা হয়। বাস্তবতা হল এই বাংলা গল্প, কবিতা-নাটক, লোকগীতি এবং আধুনিক গান কল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ যে খানে স্ত্রী বিভিন্ন প্রকারের পণ্য সামগ্রী যেমন, শাড়ী-গয়না, আয়না, চুলের সুগন্ধী তেল, সাবান, পাউডার ইত্যাদি আনার জন্যে বিভিন্ন রকম মিষ্টি কথায়, ছলনায় অথবা অভিমানে তার স্বামীকে প্রলুব্ধ করে।

তবে নারীর চাওয়া পাওয়াকে তুচ্ছ করে এবং বিদ্রুপাত্মকভাবে উপাস্থাপন করা হয়ে থাকে। এ সব প্রচার নারীর পরনির্ভরশলতা, ক্রয় ক্ষমতার অনুপস্থিতি ও বাইরে বেরুনো সীমাবদ্ধতার কথাই বলে এবং এ সবের উপর জোর দিয়ে এক ধরনের রমনীয় মতাদর্শ চালু রাখে। নারীর বাজারে প্রবেশের সমস্যা উপলব্ধি করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'ফ্যামিলি প্লানিং এ্যান্ড সোশ্যাল মার্কেটিং প্রজেক্ট।' এরা এমন ভাবে জন্ম নিরোধক (কন্ট্রাসেপটিভস) দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপন নির্মাণ করে যাতে পুরুষকে ক্রেতা হিসেবে তৈরী করা হলেও 'টার্গেট' বা ভোক্তা হচ্ছে নারী।

---

[৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

"আধুনিক বিজ্ঞাপন প্রযুক্তি নারীদেরকে স্বাধীনতার একটি মিথ্যা অনুভূতি বা ধারণা দেয় যে তারা অসংখ্য পণ্যের মধ্য হতে সবচেয়ে ভালো পণ্যটি বাছাই করেন। এর ফলে এটা তাদের জন্যে কোন কোন সময় বুঝতে কষ্ট হয় যে তারা কিভাবে একটি বাজারমূখী সমাজের কয়েদীতে পরিনত হয়। ভোগবাদ এবং পণ্যায়ন, এই দ্বিবিধ বিষয় কিভাবে নারীকে প্রভাবিত করে তা নারীবাদী চিন্তা ও চর্চার আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।[৮]

এখন 'মতাদর্শ' এবং 'নিয়ন্ত্রণকারী' বিশ্লেষণের এ দুটি ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, যে দুটি ক্ষেত্র উৎপাদন সম্পর্কের অন্তর্ভূক্ত।

মতাদর্শ

গণমাধ্যমে কিভাবে মানুষের মনে মতাদর্শগত প্রভাব ফেলে ইতোপূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গণমাধ্যম একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধের নিরিখে দর্শক বা গ্রহণকারীদের কাছে প্রযোজক/নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রচলিত তথ্য সমূহ পৌঁছে দেয়। সুতরাং নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় তথ্য সমূহ জনসাধারনের কাছে গৃহিত হয় যা নিয়ন্ত্রণ কারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান /প্রযোজক বর্গের দ্বারা জনসাধারনের উপর এক ধরনের কৃত্রিম মূল্যবোধের বারতা পৌঁছে দেয়। এর মাধ্যমে দর্শক বা গ্রহণকারীদের নিয়ন্ত্রিত করা হয় অর্থাৎ গণমাধ্যমের বিষয় সমূহ স্বাভাবিক বা 'প্রকৃত' নয় বরং তা হচ্ছে চলমানতার পূননির্মাণ, গঠন বা এক ধরনের চাপিয়ে দেওয়া মতাদর্শ যা আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান। গল্প, নাটক, উপন্যাস, মুদ্রিতাকারে বেতার বা দৃশ্যমান মাধ্যম যে কোন প্রকারেই হোক না কেন, "এমন সব বার্তা বা তথ্যে পূর্ণ যা সামাজিক সম্পর্কের একটি বিশেষ ধরনকে 'নির্দেশ' বা পুনরুৎপাদন করে।[৯] আর এই সামাজিক সম্পর্কের একটি বিশেষ ধরন হচ্ছে প্রচলিত লিঙ্গীয় সম্পর্ক। দৃশ্যমান মাধ্যমগুলো এই লিঙ্গীয় সম্পর্ক গুলিকে এর ব্যাখ্যা সহ দর্শকের অন্তরে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের দৃশ্যমান গণমাধ্যমগুলি নারী সম্পর্কে প্রচলিত গৎবাঁধা ধারনাকে দর্শকের মনে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সদা তৎপর। টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র অত্যন্ত প্রভাবশালী গণমাধ্যম। এ দেশের এ ধরনের মাধ্যমগুলির মধ্যে জেন্ডার সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

---

[৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।
[৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের টেলিভিশন নাটক, ছায়াছবির একটি প্রিয় বিষয় হল যুবক যুবতীর প্রেম। বর্তমানে এর সাথে যুক্ত হয়েছে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি মোবাইল ফোন ও (কম্পিউটারে) ইমেইল। এসব ক্ষেত্রে উঠতি বয়সের তরুন-তরুনীদের প্রেমে পড়ার গল্প, পিতা-মাতা কিভাবে এর বিরোধতা করে এবং কিভাবে কৌশলে পিতামাতার চোখ এড়িয়ে এসব সমস্যার সমাধান করা যায় ইত্যাদি। "পরিবারের স্তরভিত্তিক কাঠামোতে লিঙ্গীয় সম্পর্ক কিভাবে উপলব্ধ ও প্রবিষ্ট, সেটিই পরিস্ফুটিত হয় এসব ছায়াছবিতে, নাটকে। এই বিষয় বস্তুর প্রকার ভেদে সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য যে সকল মূল্যবোধ আমরা 'গ্রহণ' করে থাকি তার একটি তালিকা তৈরী করা যায়। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানকে খুব কমই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, ভবিষ্যত জামাতা কিংবা পুত্রবধুর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড বরাবরই বাবা মা অথবা 'মুরুব্বীগন' কর্তৃক নির্ধারিত হয় পুরুষ কেন্দ্রীক বা পুরুষমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে। প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের সংগে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের আবেগ প্রবন সংঘর্ষ হয়, তবে শেষ মেষ সন্তানের মঙ্গল কিসে তা অভিভাবকেরাই যথার্থ বোঝে। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা দেয়া হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যমান বা প্রচলিত নিয়মে তারা পরাভূত। নারীর এই পরভিবতাকে তার জন্য চূড়ান্তভাবে মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করা হয়। নারী যতই শিক্ষিত, ক্ষমতাবান কিংবা বুদ্ধিমত্ত সম্পন্ন কিংবা জ্ঞানী-গুনী হোক না কেন এক পর্যায়ে পুরুষের কাছে আত্মসমর্পন তাকে করতেই হবে। সে ক্ষেত্রে পুরুষটি তার চেয়ে অনেক নিম্নমানের মানবিক গুন সম্পন্ন হলেও তার পৌরুষ অম্লান, অক্ষয় ও নারীর জন্য পূজনীয়। একজন নারীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম যে সামাজিক এবং ধর্মীয় আচরণ বিধি মেনে চলা তার চরম উদাহরণ বিটিভির 'উজ্জীবন' নামক ধর্মীয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের একটি নাটিকায় উপস্থাপন করা হয়। এখানে রগচটা শাশুড়ীর সাথে বসবাসরত একটি তরুন দম্পতিকে দেখানে হয়েছে। শাশুড়ী প্রায়ই ছেলের বউকে অত্যাচার ও মারপিট করে। এক পর্যায়ে শাশুড়ীটি ছেলের বউয়ের চরিত্র সম্পর্কে কলঙ্ক রটায় এবং এর ফলে স্বামী রেগে যায় এবং লাথি মেরে তার স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেয়। স্ত্রীটি সর্বশেষ আশ্রয় হিসেবে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে পুকুরের দিকে দৌড়ে যায়। এ কথা শুনে স্বামীও সেখানে দৌড়ে যায় এবং পুকুর ঘাটে তাদের পূর্ণমিলন হয়। সব কিছু মাফ করে দেয়া হয়। সবকিছু ভুলে যাওযা হয় বিশেষ করে বউয়ের প্রতি শাশুড়ীর দুর্ব্যবহার। আর স্বামীর লাথি সে তো অতি স্বাভাবিক হিসেবে নিয়ে এসংক্রান্ত কোন প্রশ্নই তোলা হয় না। এমন ভাব-স্বামী ভুল বুঝে স্ত্রীকে লাথি মারতেই পারে। স্বামী তার স্ত্রীকে যুক্তি দিয়ে বোঝায় যে প্রত্যেকেরই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়া বাঞ্ছনীয়। হাজার হোক, তার মা একজন মুরুব্বী। স্ত্রীটি স্বামীর বুকেই তার আশ্রয় খুঁজে নেয়। এমনিতর সমর্থনে কোরানের বানী উদ্ধৃত করে নাটিকা শেষ হয়। এখানে উল্লেখ্য এখানে স্ত্রীটিকে অত্যচার সহিষ্ণু, পরনির্ভরশীল, আশ্রয়হীনা, ব্যক্তিত্বহীনা, স্বীয় মতামত প্রকাশে অক্ষম, অবুঝ, প্রেমময়ী সর্বোপরি দুর্বল চিত্র ও মানসিকতা সম্পন্ন হওয়ার পক্ষে মতাদর্শিক প্রচার চালান হয় যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ নারী চরিত্রের প্রতীক।

নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ

'এখানে এই প্রশ্নটাই সামনে এসে দাড়ায় যে এধরনের ইমেজের নিয়ন্ত্রণকারী কে? বাংলাদেশে কিছু গণমাধ্যম যেমন টেলিভিশন, রেডিও এবং কতিপয় সংবাদপত্রের উপর রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। এসব মাধ্যমে, কিছু অনুষ্ঠানে, লেখায় বিশেষ ধরনের Stereotype লক্ষ্যনীয়' বলে মেঘনা গুহঠাকুরতা উল্লেখ করেন। কিছু কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিংবা দিবসে নারীকে, (বাধ্যতামূলক) ঘোমটা মাথায় উপস্থাপন করা হয়। আবার অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেত্রীকে ভোটের আগে ঘোমটা মাথায় ছবি তুলে মানুষের মনে তার ধর্মীয় আনুগত্য সম্পর্কে সন্ধেহাতীত প্রমানকরণের চেষ্টা দেখা যায়। কাউকে বা মোনাজাতরত, তজবী হাতে কিংবা হজ্জ, কিংবা পীরের মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে প্রচার শুরু করতে দেখা যায়। এ সবই পুরুষতান্ত্রিকতার নিয়ন্ত্রণ। নারী সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন প্রচার মাধ্যমে যে ভাবমূর্তি উপস্থাপন করা হয় তা হল নারী বিবাহ, পরিবার এবং সমাজের অন্যান্য 'আদেশ' সমূহ নিস্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করবে। যদিও সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আবার নারী জন্মনিয়ন্ত্রণ করবে -এ ক্ষেত্রে তার মাতৃত্বের উপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণকে ও নিয়ান্ত্রিত করা হয়। তার সক্রিয় অংশগ্রহণ মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এবং কখনোই সমাজের নিয়ম অর্থাৎ বিবাহ, পরিবার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে না, বা এসব প্রতিষ্ঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে না।

"রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত Stereotype ছাড়াও নারীদের সম্পর্কে আরো অনেক Stereotype রয়েছে যা সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রচার করতে আগ্রহী। অনেক সময় এসব Stereotype এর সঙ্গে রাষ্ট্র প্রবর্তিত Stereotype এর সংঘাত সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বহুজাতিক কোম্পানীর বিশেষ বিজ্ঞাপনে ছিলো পশ্চিমা পোষাক পরীহিতা নৃত্যরতা নারী। একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী জনসভার মাধ্যমে এই বিজ্ঞাপনের ভীষন বিরোধীতা করে। পরে একটি বাদ দেওয়া হয় এবং একটি অপেক্ষাকৃত "বাঙালী শালীনতার' বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ছবি আনা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। যা হোক বর্তমানে এসব Stereotype শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে। বিরোধের সম্মুখীন হলে অত্যন্ত চাতুর্য্যের সঙ্গে করপোরেট ইমেজ (Corporate image) বদলানো হয় কেন না প্রকৃত উদ্দেশ্য হল তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রি, সেটা পশ্চিমা পোষাক পরিহিতা আকর্ষণীয় মডেলের মাধ্যমেই হোক অথবা কোরানের আয়াতে আবৃত্তির মাধ্যমেই হোক।[১০]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে যে অসমতা আছে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ অসমতা গণমাধ্যমের বিভিন্ন ধরনের (প্রিন্ট, দৃশ্যলব্ধ ইত্যাদি) এবং গণমাধ্যমের প্রযুক্তির উৎকর্ষতার পর্যায় উভয় ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ গরুমার্কা ঢেউটিনের মত অশৈল্পিক বিজ্ঞাপনের পাশাপাপিশ ঔশ্বরিয়া রাই-এর লাক্স সাবান ব্যবহারের গ্লামারপূর্ণ আহবান সচরাচর দেখা যায়।

'এই সমাজে নারীর কাজ হয়ে দাঁড়ায় জৈবিক পূর্ণউৎপাদনের ভূমিকা পালন। সামাজিক ভাবে তার পশ্চাৎপদতার কারণ হিসেবে 'সংস্কারক' এর ভূমিকায় অবতীর্নরা বড় জোর 'ভূমিহীন ও যুবকদের মতো সামাজিক ভাবে বঞ্চিত গোষ্ঠী হিসেবে নারীকে বিবেচনা করেন এবং কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন 'নিজের অবস্থান সম্পর্কে অসচেতনাতা' কে। বিভ্রান্ত নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে নারীকে অধস্তন প্রমানের প্রচেষ্টা প্রায় গণমাধ্যমসমূহে পরিষ্ফুটিত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার প্রমান সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি, সিনেমা, সর্বত্রই সহজে দৃষ্ট।[১১]

ইদানিং গণমাধ্যমে ক্রমবর্ধমান হারে পেশাজীবী ও কর্মী হিসেবে নারীর উপস্থিতি -নারীদের প্রতি পুরুষ সহকর্মীদের ইতিবাচক মনোভাব, গণমাধ্যমে নারীর ব্যাপক উপস্থিতি ও তাদের ইতিবাচক রূপায়ন এবং গণমাধ্যম নীতিকে নারী বান্ধব করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি নির্ধারণী অবস্থানে নারীদের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি ব্যাপক ভাবে বাড়ানো দরকার, নইলে সত্যিকারের পরিবর্তন বা উন্নয়ন সাধান করা সম্ভব হবে না। এখনও গণমাধ্যমের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের যে অর্জনগুলো আছে তার ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে মেয়েদের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করনের মাধ্যমে সেগুলো মোকাবেলা করার প্রেক্ষিত তৈরী করা প্রয়োজন। আর এখনই তার উপযুক্ত সময়।

---

[১০] মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

[১১] আলী রীয়াজ, "রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমে নারী প্রতিমা", গণমাধ্যম ও নারী, মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, সুরাইয়া আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী সংহতি, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

৭.২. চলচ্চিত্র মাধ্যমে নারী ঃ

কল্পনা, বাস্তবতা, সত্য-অসত্য, সুন্দর-অসুন্দর, অভ্যস্ততা-সৃজনশীলতা, ন্যায়-অন্যায়, স্থূলতা-বিচক্ষণতা, মননশীলতা ইত্যাদি বিভিন্নমুখিনতার এক বিচিত্র সমন্বয় হল চলচ্চিত্র। মানুষের জীবনে এর প্রভাব অত্যন্ত প্রগাঢ়। চলচ্চিত্র একটি অত্যান্ত প্রভাবশালী গণমাধ্যম। এক শতাব্দীর মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্প- 'বিকাশের যে স্তরে এসে পৌঁছেছে-সেই স্তরে সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য, সাহিত্যের মত প্রপিতামহ শিল্পের পৌঁছতে সময় লেগেছিল অনুর্ধ কয়েক হাজার বছর। জনজীবনের একান্ত যে বিনোদন-সেই যাত্রার বয়স ও কম যে কম পাঁচশত। তবে সে যাই হোক, জন্মমুহূর্তেই, সিনেমা "এলাম জয় করলাম" এর মত বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের হৃদয় মন হরন করে নেয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হওয়ার সংগে সংগে ভারতবর্ষেও চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়। ১৮৯৬ সালের ৭ই জুলাই তারিখে বোম্বের ওয়াটসন হলে ফ্রান্সের লুমীয়ের ভাতৃদ্বয় নির্মিত ছবি দেখে বোম্বে বাসী একেবারে মাতোয়ারা হয়ে পড়েছিল। আরও দু'বছর পর (১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিল) ঢাকাবাসীরাও পৃথিবীর 'অষ্টম আশ্চর্য বায়োস্কোপ দেখার প্রথম সুযোগ পায়।"[১২] এদিক থেকে দেখলে এ দেশের জনগনের কাছে চলচ্চিত্র মাধ্যম নতুন কিছু নয়। সে কালে চলচ্চিত্র মাধ্যম এদেশের মানুষের কাছে দেবদূতের মত আবির্ভাব হয়ে ছিল। তাই এর সব বাণী, প্রচার দৃশ্যায়ন মানুষের মনে এক ব্যাপক মোহজাল বিস্তার করতে পেরেছিল। শিল্পকলার এই কনিষ্ঠ সদস্য চলচ্চিত্র শিল্পের সবচেয়ে সুবিধাজনক দিক হল "এর বায়োপলব্ধির জন্য অক্ষর জ্ঞানের ও প্রয়োজন হয় না। দর্শন শ্রবনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপালী পর্দায় নিক্ষিপ্ত দৃশ্য প্রতিমা (Image) ও ধ্বনি (sound) এর সংগে নিরক্ষর শ্রেণীও অনায়াসে একাত্ম হয়ে যেতে পারেন। এছাড়া একত্রে প্রচুর লোক ছবি দেখতে পারে বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের উপর চলচ্চিত্রের প্রভাবও প্রচুর। কার্যত ঃ তথ্য, সংযোগ শিক্ষা ও বিনোদণের জন্য সিনেমার মত পরাক্রমশালী দ্বিতীয় কোন গণমাধ্যম আছে বলে মনে হয় না। চলচ্চিত্রের এই অপরিসীম ক্ষমতা লক্ষ্য করেই ১৯১৭ সালে লেলিন বলেছিলেন-Of all art Cinema is the most important.

[১২] মাহমুদা চৌধুরী, 'চলচ্চিত্র মাধ্যমে নারী', গণমাধ্যম ও নারী, নারী সংহতি, পৃঃ ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর এই অভিমত নিছক কথার কথা ছিল না। সেটা বিপ্লোবোওর রাশিয়ায় নির্মিত 'স্ট্রাইক' 'ব্যাটলশীপ, পটেমকীন', 'অক্টোবর', 'মাদার', 'আর্থ'-ছবিগুলো দেখলেই অনুমান করা যায়।[১৩]

নব্য সাম্রাজ্যবাদী যুগে গোটা বিশ্বব্যাপি পুঁজিবাদের প্রসার ঘটেছে তার প্রভাব চলচ্চিত্রের উপরে পড়েছে ব্যাপকভাবে। মুনাফা লাভের আশায় চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ মেধা মননশীলতার উপর জোর দেয়ার পরিবর্তে এর বাণিজ্যিক কাটতির উপর বেশি জোর দেন। 'চলচ্চিত্র যেমন মানুষের গভীর চেতন্যে নাড়া দিতে সক্ষম তেমনি তার মননশীলতাকে চটুল ও হালকা পর্যায়ে নিয়ে আসতেও সবচাইতে বেশি পারদর্শী। বিশেষত যেদিন থেকে বোঝা গেল চলচ্চিত্র মানুষকে বিনোদন দিতে সক্ষম, মুনাফামুখী প্রযোজকরা এতে ব্যাপক ভাবে বিনিয়োগ করা শুরু করে এবং চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির একটি প্রডাক্ট হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে।[১৪]

এ কারণে চলচ্চিত্র মাধ্যমে আমরা যেমন একদিকে পাচ্ছি উচু মানের শিল্প, মোটামুটি মাঝারি মানের বিনোদন পাচ্ছি, আবার স্থুলমানসিকতা সম্পন্ন মানুষের জন্য নিম্ন শিল্প মানের যৌনতা নির্ভর অশ্লীল ছবিও পাচ্ছি। সমাজ পরিবর্তনে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধিতে চলচ্চিত্র অসাধারণ অবদান রাখলেও পুঁজিবাদী বা আধা পুঁজিবাদী সমাজে চলচ্চিত্র নন্দনের শৈল্পিক প্রভাব পড়ে অতি টিমা লয়ে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর। সমগ্র ভারতবর্ষে 'পথের পাঁচালী'র জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৫৯ বছর। "(১৮৯৬ থেকে ১৯৫৫) ঠিক যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রকাশ শক্তিকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে বয়ে চলেছে বিশুদ্ধ চিন্তার নান্দনিক প্রবাহ। এই সময়ের মধ্যে, বাংলাদেশের মাটিতেও চলচ্চিত্রের প্রথম বীজটির অংকুরোদগম হয়। চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রথাগত কোন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই কেবল দেশপ্রেম ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ চৈতণ্যে মূলধন করে স্বদেশের মাটিতে চলচ্চিত্রের বীজ বপন করেছিলেন কয়েকজন তরুন তুর্কী। কিন্তু হলিউড ও ভারতীয় আফিম (প্রমোদ ছবি) ছবির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা বাংলাদেশের দর্শকদের অভ্যস্থ চোখে, যেসব ছবি রং ধরাতে ব্যর্থ হয়। দুঃখের বিষয় হল, চলচ্চিত্রে আসক্তি ছাড়া এই অগ্রদূতদের আপন সমাজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশেষ কোন ধারণা ছিল না, এর ফলে, নতুন সমাজর নতুন সিনেমার অবয়ব সন্ধানে প্রবৃত্ত না হয়ে, নির্বিবাদে তারা প্রতিবেশী দেশের প্রতিষ্ঠিত

---

[১৩] প্রাগুক্ত।
[১৪] ফাহমিদুল হক, নারী ও চলচ্চিত্র, মিডিয়া ও নারী, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের ফর্মূলার জাবর কাটা শুরু করে দিলেন। ভূমিষ্ঠ হতে না হতে, বাংলাদেশের নতুন চলচ্চিত্র হয়ে দাঁড়াল স্থুল, সস্তা, তুচ্ছ বিষয় নির্ভর, পচাগলা, ব্যাধিগ্রস্ত সংস্কৃতির মুখপাত্র।[১৫]

চলচ্চিত্রে পুঁজি লগ্নিকারকদের অধিকাংশই যেহেতু পুরুষ (পুরুষরাই যেহেতু এ সমাজে বহুলভাবে অর্থের মালিক), সেহেতু পুরুষ প্রয়োজক ও পুরুষ পরিচালকের দ্বারা তৈরী চলচ্চিত্রে নারীকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে অধস্তন, হেয়, দুর্বলভাবে এবং যৌনতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ধীমান দাশ গুপ্ত (১৯৯৪ : ৪৫৫-৪৫৬) সম্পাদিত 'চলচ্চিত্রের অভিধান' গ্রন্থে কেবল ব্যবসায়িক কারণে পুরুষ শাসিত চলচ্চিত্র মাধ্যম ভাবনাগতভাবে ও কী ভাবে পুরুষনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত হাজির করা হয়েছেঃ

- নারী-পুরুষ উভয়েই পোশাক বদলায়, কিন্তু মেয়েদের কাপড় খোলা, স্নান বা ব্যায়ামের দৃশ্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।
- পুরুষ পুরুষকে, নারী নারীকে, নারী পুরুষকে হত্যা করে ও জখম করে। কিন্তু চলচ্চিত্রে বাস্তবের তুলনায় অনেক বেশি আঘাত ও রক্তপাতের শিকার হয় নারী।
- ব্লু বা স্যাডিস্ট ফিল্মে মেয়েদের পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে মাংসপিন্ডের মতো দেখানো হয়, পুরুষের চাইতে নারীদের প্রত্যঙ্গ বেশী মাত্রায় দেখানো হয়। কিন্তু পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ পরিচালকের ছবিতেও তারই কাছাকাছি ঝাঁঝের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এর কারণ লুকিয়ে থাকে পুরুষ পরিচালকের কোনো আদিম গহনে। গড়পড়তা ছবিতে যখন নারী-বিরোধী ভাবনা জাঁকিয়ে বসে তখন ততটা ক্ষতি করে না, সিরিয়াস ফিল্মে নারী বিরোধী ভাবনা যতটা করে।
- ব্যভিচার বা চরিত্রস্খলনের ইঙ্গিত যে প্রায়ই মেয়েদের দিকে করা হবে বা তাদের সায় পাবে, সরলতম মুখশ্রীর অধিকারিণীই যে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যে পড়বে এবং নগ্নতা, যৌনতা, আতঙ্ক, অত্যাচার, হিংসা, ট্রাজেডি যত বেশি সম্ভব, মেয়েদের কেন্দ্র করে যে আবর্তিত হবে, তা চলচ্চিত্রের একটি অতি সাধারণ প্রবণতা।

---

[১৫] মাহমুদা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া জনপ্রিয় বাণিজ্যিক ছবিগুলোতে নারীকে সম্মান বিকিয়ে নিজেদের যৌনাবেদন তুলে ধরতে হয়, উপমহাদেশীয় ছবিগুলোতে তাকে কসরৎ করে নৃত্যগীত করতে হয় কিন্তু নায়িকাদের পারিশ্রমিক নায়কদের ধারে কাছে আসে না। পেটের কারণে এক্সট্রা হিসেবে কাজ করতে আসা নিম্নবিত্তের নারীদের প্রযোজক-পরিচালক থেকে শুরু করে অ্যাসিস্ট্যান্টদের হাতে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হবার ঘটনাও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অহরহ ঘটে থাকে।[১৬]

দেখা যায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই বেশিরভাগ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রে তাই নারীকেও ব্যবহার করা হয় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে। পুরুষের ভোগবাদী মানসিকতার আর একটি দিক উন্মোচিত হয় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে, যা নারীর মানবিক মূল্যবোধকে তুলে ধরার চেয়ে তার রূপাশ্রয়ী যৌনাবেদনকে লাভজনক মনে করে। চলচ্চিত্রের নারীর নেতিবাচক রূপায়ণ সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে; আবার ইতিবাচক রূপায়ণ ও নারীর উন্নয়নকে তরান্বিত করতে পারে ব্যাপকভাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক গবেষনায় নিমগ্ন চিন্তাবিদ গাঁস্তরোর্বেজ এর মতামত স্মর্তব্য। তার মতে, সমাজ জীবনে চলচ্চিত্র (ক) ফ্যাশন চালু করে; (খ) ধ্যান ধারণায় সমর্থন জোগায় (গ) সেন্সর শীপের ছকে বাঁধা কিছু যৌন আচার অনুষ্ঠানের সংগে তরুণদের পরিচয় ঘটায়, (ঘ) ক্ষমতাবান সরকার যাকে সুরুচি বলে মনে করে তার বিস্তৃতি ঘটায়; (ঙ) এবং সাধারনভাবে দর্শকের রুচিবোধকে ব্যাধিগ্রস্থ করে তোলে।

স্বাধীনাত্তোর চলচ্চিত্র শিল্পের কয়েকটি ছবির প্রতি একটু নজর বুলালেই উল্লেখিত মতামতের সারবত্তা প্রমাণিত হয়ে যায়। বস্তুত সাম্রাজ্যবাদী, সামান্তবাদী, পুঁজিবাদী দেশসমূহের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রকদের অনুগত বংশবদরের কুক্ষিগত চলচ্চিত্র শিল্পের শেষ কথা হয়ে দাড়াঁয় মনোরঞ্জন ও মুনাফা। পাক জঙ্গী শাহী পতনের পর, স্বাধীন দেশের নতুন চলচ্চিত্র সম্পর্কে স্বভাবত নতুন প্রত্যাশা জেগে ওঠে। চলচ্চিত্র হবে আর দশটা বিপ্লবোত্তর দেশের মতন-সমাজের নির্ভরযোগ্য দর্পন। মুক্তচিন্তায়, বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে সমৃদ্ধ কাংখিত চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবে দেশ -সমাজ-সংস্কৃতির আসল চেহারা। তাতে জীবন ও জীবনের কোন না কোন দিক আলো ফেলে উন্মোচিত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চলচ্চিত্র শিল্পের সেই সুদিন আর এল না।"[১৭] ধনীক শ্রেণীর উদ্ভব ও ব্যাপক দুর্নীতির কারণে এক শ্রেণীর মুনাফাখোর পুঁজিবাদের

[১৬] দাশগুপ্ত, ধীমান (১৯৯৪), চলচ্চিত্রের অভিধান, ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত, বাণীশিল্প, কলকাতা, পৃঃ ৪৫৫-৪৫৬।
[১৭] মাহমুদা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশের এক নিরাপদ ক্ষেত্র হিসেবে চলচ্চিত্রকে বেছে নিল। এক্ষেত্রে নারীর অপরূপায়ণকে পুঁজি করে তাদের অর্থের ভান্ডার পরিপুষ্ট হলেও সমাজে নারী অবমূল্যায়নের শেকড় আরও গভীরে বিস্তার লাভ করে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে সব বাণী প্রচার হয় তা নারী সম্পর্ক মানুষের ধারণাকে আরো নেতিবাচকতা দান করে। তবে সমাজ সচেতনতামূলক অনেক ছায়াছবিও নির্মিত হয় সচেতন শ্রেণীর প্রয়াসে। তবে তার সংখ্যা এ সব মূনফাভিত্তিক বাণিজ্যিক ছবির তুলনায় খুবই সীমিত। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে আকাশ পথে চলে আসছে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। দেশীয় চলচ্চিত্র সাংস্কৃতির সাথে বিদেশী সাংস্কৃতির মিশ্রনের ফলে এ শিল্প চরমভাবে মান বিবর্জিত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে চলচ্চিত্রে অশ্লীলতার মাত্রা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। এছাড়া আকাশ পথে ইন্টারনেটের মাধ্যমেও নারী অবমূল্যায়ন মূলক বিভিন্ন অশ্লীল ছবি যুব সমাজের মধ্যে নারীর প্রতি নেতিবাচক ধরনা জন্ম দিচ্ছে। তবে কিছু কিছু টেলিফিল্ম, শর্টফিল্মও তৈরী হচ্ছে যে গুলো সমাজ সচেতনতামূলক এবং নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

৭.৩. বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারী ঃ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মাহমুদা চৌধুরী তার 'চলচ্চিত্র মাধ্যমে নারী' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন-"শিল্পবোধ শূন্য দুর্নীতিবাজদের কালো টাকা সাদা বানানোর চারণক্ষেত্র-চলচ্চিত্র শিল্পে, অতি দ্রুত সংক্রামিত হল মূনাফা লোটার হীন মানসিকতা, চিন্তাহীন নকল আর অন্তঃসারশূন্য বিষয়ে 'মানুষ' হিসেবে গো-মূর্খ মাস্তানদের আধিপত্য সবল হলেও 'মানুষ' নারীর কোন অস্তিত্বই সেখানে দৃষ্ট হয় না। মুনাফা শিকারীদের স্থুল চিন্তায় নারী কেবল 'বস্তু'। প্রথমত ঢাকার একটি বহুল প্রচারিত সিনেমা পাক্ষিকে, চলচ্চিত্রের প্রথিতযশা পুঁজি বিনিয়োগকারী জনাব জাহাঙ্গীর খান অকপটে স্বীকার করেন যে চলচ্চিত্রে নিয়োজিত নারীরা তার কাছে কাঁচামালের সমতুল্য অর্থাৎ পুরো দস্তুর বাণিজ্যিক পণ্য। বস্তুত: এই ধরনের মনুষ্য গুনাগুনবর্জিত ক্রীতদাসসুলভ মনোবৃত্তি কেবল একজন জাহাঙ্গীর খানের নয়।"[১৮] অধিকাংশ পুঁজিবিনিয়োগকারীই এ ধরনের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পোষন করে থাকেন। একদিকে যখন জাতিসংঘ সরকার নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিচ্ছে, (শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে)

[১৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নারী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও নীতি প্রনয়ণ করছেন একই সময় অপর দিকে চলচ্চিত্র মাধ্যমে অবিমার প্রচার হচ্ছে নারী অবমূল্যায়ন কারী ও নারী বিরোধী ভাবনা।

৭.৩.১. চলচ্চিত্রে নারী বিরোধী ভাবনা ঃ অতীত ও বর্তমান

লাস্যময়ী সুন্দরী লাবন্যময়ী নায়িকা, মমতাময়ী মা, ভ্যাম্প বা কুটিল চরিত্রের রমনী ইত্যাদি কয়েকটি ইমেজের মধ্যে বাংলাদেশী চলচ্চিত্রের নারী চরিত্রগুলোকে আবর্তিত হতে দেখা যায়। এ ছাড়া মাস্তান, অশিক্ষিত, অপদার্থ বহুগামী নায়ক বা পুরুষকে পথে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক সময় ত্যাগী নারী চরিত্রকে নিয়োগ করা হয় যারা আপন মান-মর্যাদা, সামাজিক অবস্থান সবকিছু বিসর্জন দিয়ে পুরুষকে ফিরিয়েে আনে যে ক্ষেত্রে এ ধরণের পুরুষের অসংখ্য অবমাননাকর উক্তি ও আচরণ তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। তবু পুরুষকে পথে ফেরানোর জন্য তার 'ধনুকভাঙ্গা পণ' শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়। তার নারী জন্ম ধন্য হয়। আর অনেক ছবির কেন্দ্রীয় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় নারী কৌমার্য যা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারা, যে ক্ষেত্রে বহুগামী দুশ্চরিত্র পুরুষকে পথে আনার ক্ষেত্রে নারীর কৌমার্যকে বিনিয়োগ করা হয়, এবং এভাবে পুরুষের লাম্পট্যকে রোমান্টিক আবারণ প্রদান করা হয় এবং বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় বিভিন্ন ভাবে। পুরুষের জীবন ধারাকে আরো সুখকর, আরও সুন্দর, আরো মসৃন, আরো সফল করার জন্যই যেন নারীর জন্ম এবং পুরুষের জীবন থেকে সব রকম কষ্টের ছায়া মুছে দিয়ে, তার চলার পথের সব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য নারী তার জীবনকে বিনিয়োগ করবে। স্বীয় জীবন বলি দিয়ে হলেও সে পুরুষের সুখ সম্ভোগের পথ নিঃষ্কন্টক রাখবে। 'নারীর জীবনের কিই বা মূল্য?' চলচ্চিত্র গুলির মাধ্যমে এধরনের সামাজিক মতাদর্শ গড়ে তোলা হয় প্রতিনিয়ত। না হয় আমি তোমার কাছে, ছিলেম অতি নগণ্য', 'আমি তোমার বধূ তুমি আমার স্বামী-খোদার পরে তোমায় আমি বড় বলে জানি'- জাতীয় সুরেলা গানের আড়ালে নারীকে প্রতিনিয়ত পুরুষের দাসী হয়ে উঠার দীক্ষা দেওয়া হয়।

নারী শিক্ষার দ্রুত প্রসার, নারীর আত্মসচেতনতা, অর্থনৈতিক স্বানির্ভরতা, নারী অধিকার আন্দোলন, জাতিসংঘ ঘোষিত নীতি সমূহ, নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচী ইত্যাদি সামন্ত ভাবধারায় আচ্ছন্ন পুরুষ শাসিত সমাজের ভিতকে নাড়িয়ে দিতে পারে বলেই নারী প্রগতির জন্য ক্ষতিকর এসব অনৈতিক কুসংস্কার ও মধ্য যুগীয় বিশ্বাস জিইয়ে রাখার সবরকম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় চলচ্চিত্রের চিত্র প্রতিমা ও আরোপিত ভাবনার মধ্য দিয়ে। নারী

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতাকে বিকৃতরূপে চলচ্চিত্র মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় বাস্তবের সাথে যার বিস্তার তফাৎ রয়েছে। নারী স্বাধীনতাকে উশৃঙ্খলতা, বেলেল্লাপনা, অমার্জিত এবং সর্বোপরি ধ্বংসাত্মকরূপে চিহ্নিত করা হয়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রেম কানন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রকে এমন ভাবে চিহ্নিত করা হয় যেখানে শহুরে তরুনী নারী স্বল্প বসনা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কথায় কাজে অমার্জিত ও অনৈতিক আচরণ প্রদর্শন করে আর অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাব তাদের চরিত্রে অনিবার্য। আরও যা দেখানো হয় তা হল শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও পাঠ গ্রহণের চেয়ে যুবক যুবতীর প্রেমের মহড়াটাই আসল। তবু নায়ক খেলা ধুলা, গান বাজনা, মারামারি, আবৃত্তি, বক্তৃতা, বিতর্ক সব কিছুতেই প্রথম। আর শত বাধা বিপত্তি টানা-পড়েনের মধ্যে হলেও নায়ক প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবেই। আর নায়িকা যত চেষ্টাই করুক না কেন, যত বিদ্যা বুদ্ধি, পড়ুয়া-মেধাবী হোক না কেন, ধনী-গরীব নির্বিশেষে নায়কের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে সে অতি নগণ্য। এক পর্যায়ে তার সার্বিক বুদ্ধিমত্তা, মান সম্মান, অর্থ-প্রাচুর্য ইত্যাদি সকল সামর্থ নায়কের পায়ে বিসর্জন দিবে। যত হোক সে তো নারী। তার তো কোন দিক থেকে বড় হওয়া চলবে না। তার একমাত্র সম্পদ তার রূপ ও যৌনতা। আর এই রূপের কারণেই নারী কোটিপতি বাবার একমাত্র সন্তানকে বিয়ে করে, আত্মমর্যাদা বোধের অভাবেই (যাকে এদেশের সিনেমায় রমনীয়, কমনীয়, নারীর জন্য শোভনীয় মনে করা হয়) সে একজন অলৌকিক গুণের অধিকারী পুরুষের সঙ্গী বা সহধার্মিনী হতে পারেন। একজন নিরেট মূর্খ নারীও একজন বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীর স্ত্রী বা প্রেমিকা হতে পারে তার তথাকথিত রমনীয় গুন ও রূপমাধুর্যের জোরে। এ সব চলচ্চিত্র গুলিতে নারীর মানবিক মূল্যকে কখনও সংজ্ঞায়িত করা হয় রূপবতী গুণবতী অথবা নিরেটমূর্খ, পাগলাটে, অবলা, অসহায়, পরনির্ভরশীল হিসেবে। আবার আতিধনী বা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকে ড্রাইভার, রিক্সাওয়ালা অশিক্ষিত, ক্যানভাসার, ঠেলাগাড়ি চালক মুটে মজুর ইত্যাদি যে কোন ধরণের নিম্নমানের পুরুষের সাথে প্রণয়ের মাধ্যমে আসক্ত হয়ে পরিণয়ের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অতঃপর সে স্ত্রীকে স্বামী হইল মাথার মুকুট জাতীয় ডায়ালগ আওড়াতে দেখা যায়। এ সবই নারীর অবমাননার মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিকতার অন্ধগলির পথ, সভ্যতা যেখানে এসে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে।

প্রতিটি ছবিতেই প্রধানতম মন্ত্র : নারী অবলা, স্বামীর কথায় উপর স্ত্রীর কথা বলতে নেই। দ্বিতীয়ত : নারী যত শিক্ষিত হোক না কেন সে পুরুষের অধীন। স্বামীর হাতে মৃত্যু হওয়া সৌভাগ্যর লক্ষণ (ফুলশয্যা)। এর সঙ্গে আরও যুক্ত হয় (ক) নারীর যোগ্যতম স্থান চুলার

Dhaka University Institutional Repository

পাড় (সাত রাজার ধন) (খ) সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে (ধন-দৌলত) (গ) স্বামীর ঘরই মেয়েদের আসল ঘর (নাজমা, ঘরের বৌ), (ঘ) পতি বিনা নারীর কোন গতি নেই (মান সম্মান, নতুন বৌ, স্বামীর ঘর, মানসী) (ঙ) স্বামী মূর্খ, গুন্ডা, বদমাশ, অত্যাচারী, উজবুক, মাতাল, গাঁজাখোর যাই হোক না কেন-তিনি স্ত্রীর কাছে দেবতা। স্বামীর পায়ের তলাতে স্ত্রীর বেহেশ্‌ত। (তালাক, কাল গোলাপ, চেনামুখ, শুভদা, মা ও ছেলে, সময় কথা বলে), (চ) যায় যাক প্রাণ তবু সতীত্ব রক্ষাই হচ্ছে নারীর পরমধর্ম (শরীফ বদমাশ, আর্শীবাদ, প্রেম নগর, উছি লা), বস্তুত সামন্তভাবধারায় আচ্ছন্ন হয়েই থাকার ছবির চিত্র নির্মাতারা নারীর বিরুদ্ধে অমর্যাদাকর মতবাদ প্রচার করে পুরুষের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছেন।

বর্তমানে বাংলা চলচ্চিত্রে অশ্লীলতার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তা সর্বসাধারণের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে। সাম্প্রতিক এই ছবিগুলোতে সেসব কাহিনীচিত্র প্রদর্শিত হয় তাকে স্রেফ পর্নোগাফি বললেও ভুল হবে না। দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ গুলোতে ছবির মূল অংশে বা প্রদর্শনকালে 'কাটপিস' আকারে যা দেখানো হয় তাতে পর্নোগ্রাফির মত নানা রকম উপাদানই থাকে। স্বল্পবসনা নারী বা নারীদেহের উন্মুক্ত প্রদর্শনী, স্বচ্ছ ও সিক্ত আবরণে বিভিন্ন অঙ্গ ক্যামেরায় ক্লোজ শটে উপস্থাপন, যৌনকর্মের অঙ্গভঙ্গি সহ নৃত্য, বাসর ঘরে নরনারীর অবস্থানের দীর্ঘ চিত্রায়ণ, পুরুষের প্রতি যৌনাবেদনময়ী অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি সব ধরনের অশালীল দৃশ্যই আজকাল বাংলা সিনেমায় পাওয়া যায় যা নারীকে দেহ সর্বস্ব অমার্যাদাকর প্রাণী রূপে উপস্থাপিত করে।

সেকালের চলচ্চিত্রে নারী ঃ

একটু পেছনের দিকে তাকালে দেখা যায় স্বাধীনতা উত্তর এদেশের ছায়াছবিগুলির নির্মাতাদের মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায়, অধিক মুনাফা লাভের আশায় নির্বিবাদে প্রতিবেশী দেশের প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক ছবির ফর্মূলার নকল করতে শুরু করে।

'আসিয়া,' 'আকাশ আর মাটি,' 'মাটির পাহাড়', 'এদেশ তোমার আমার', 'রাজধানীর বুকে', 'হারানো দিন', 'নতুন সুর', 'জোয়ার এল', 'রাজা এল শহরে', 'যে নদী মরু পথে', 'নাচঘর', 'অধিকার', 'পীচ ঢালা পথ' ইত্যাদি ছিল সেই ধারারই চিন্তাহীন অনুসরণ, বিষয়, চরিত্র ভাবনা, ছাড়াও নায়িকার সাজ পোশাক, ফ্যাশন মায় কেশসজ্জাতেও প্রতিবেশী দেশের ভাবাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারল না। ক্রমশ : দেখা গেল, ভারতীয় সিনেমায় দেখা

Dhaka University Institutional Repository

কিছু প্রথা, বাঙালী শিক্ষিত মুসলমান সমাজেও প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন বিয়েতে মালা বদল, ফুল সজ্জা, মুখে চন্দন কুমকুমের আল্পনা, মাথায় লালচেলী ইত্যাদি। একইভাবে পাকিস্তানী সংস্কৃতির অঙ্গ সেহরা পরার প্রথাও এক সময় চালু হয়ে যায়।[১৯]

চলচ্চিত্রের শৈল্পিক মান যতনিম্নমুখীই হোক না কেন- ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নির্মিত ছবি গুলির মধ্যে মোটামুটিভাবে একটা গল্প বলার বা তৈরির চেষ্টা থাকতো। আরও থাকতো চরিত্র ভাবনা ও পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ। সামাজিক, বৈপ্লবিক, লোকগাঁথা, রূপকথা এসব জাতের ছবি ছাড়াও থাকতো উর্দ্দু ভাষায় নির্মিত বাংলাদেশের ছবি। প্রতিটি ছবিরই গল্প তৈরি হত সুন্দরী কোন নারীকে কেন্দ্র করে, প্রেমজ সমস্যা যাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিল। "সমস্যার সৃষ্টিকর্তা কোন না কোন দূর্যোধন অথবা রাবন। পৌরানিক যুগের আদি নারীর রূপকল্পে সৃষ্টি করা হত ঘরোয়া ছবির চরিত্র, দুঃখ কষ্ট বঞ্চনা ও দুর্দশার শিকার হয়ে তারা দর্শকের সহানুভূতি কুড়াতেন। তবে সুখের ব্যাপার ছিল একটাই-এই মহিমা-মন্ডিত দেবীত্বের অধিকারিনীরা কখনও দেহ প্রদর্শন, বা যৌনতা, অশ্লীলভংগী সর্বস্ব যৌন উদ্দীপক নৃত্য প্রদর্শন করতো না (যা এখানকার নায়িকারা ডাল-ভাতের মত অবলীলায় পরিবেশন করে যাচ্ছেন)। এর জন্য ছিল অপেক্ষাকৃত অখ্যাত অভিনেত্রীরা। বাইজী, ক্যাবারে ডান্সার, খল নায়িকা হয়ে তারা যৌনতা প্রদর্শন করতেন। তবে এসব ছবির সবচাইতে ক্ষতিকর দিক হল -নারীর শিক্ষাকে খারাপভাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা। শিক্ষিত মেয়ে হলেই-সে ভ্যাম্প বা খল নায়িকা। খাঁট প্যান্ট ও টাপসপরা এই শিক্ষিতা মেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল, পুরুষ ঘেষাঁ, লোভী, হিংসুক, রূঢ়, কুট দজ্জাল চরিত্রের অধিকারিনী হওয়াটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নায়ক -নায়িকা ছাড়াও মা ও ভাবী চরিত্রের দর্শন মিলতো। যৌথ পরিবারে যদি একাধিক ভাবী থাকতো তো তাদের একজনকে হতেই হতো মহা দজ্জাল। অপরজন মাদার তেরেসা-সেবা পরায়ন ও দেবর ও ননদের দরদী মাতৃসমা। ছোট দেবরকে পুত্র মনে করে এমন স্নেহ দেখান যা পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় -স্বজনরা মনে করেন ঢলাঢলী, প্রেম। মূলত : শরৎ সাহিত্যই এই সব ভাবাশ্রয়ী চরিত্রের উৎস। আমাদের বহমান সমাজ ব্যবস্থায়, বড় বড় পরিবারগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও সিনেমায় সেই স্বপ্ন নিয়ে এখনও চলছে অর্থহীন বিলাসিতা"।[২০]

---

[১৯] মাহমুদা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১-৪২।
[২০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে এবং বর্তমানেও এ ধরনের ভাবীদের সামাজিক ছবিতে দেখান হচ্ছে বিভিন্নভাবে। 'পরান পাখী', 'চাপা ভাংগার বৌ', 'বদনাম', 'চাচা ভাতিজা', 'সাতরাজার ধন', প্রভৃতি ছবিতে জোয়ান ভাবী-দেবরের ঢলানী -ঘনিষ্ট মুহূর্ত -নাচ-গান দেখে এদের মধ্যে মা-সন্তানের সম্পর্ক এ কথা কেউ অন্তত বলবে না। তবু এসব ক্ষেত্রে প্রতিবারই প্রিয় সংলাপ হচ্ছে- মায়ের মত ভাবী'। ঢাকার ছবিতে এ এক অদ্ভুত ব্যাপার যে ভাবীকে ভাবীর মত কখনও দেখানো হয় না। কিছু সংখ্যক ভাবী আছেন উশৃঙ্খল, শিক্ষিত কিন্তু ভদ্রতার বালাই নেই, কেউবা জটিলা-কুটিলা। তারা যৌথ সংসারের সর্বনাশ করে আলাদা সংসার পাতেন, স্বামীকে বিপথগামী করেণ। স্বামীর সম্পত্তি হাতিয়ে নিজের মা-বোন ভাই কিংবা আত্মীয় স্বজনকে পোষেন। এক সময় এ জাতীয় ভাবীদের কুটিলতা কারসাজি ধরা পড়ে স্বামীর কাছে এবং হঠাৎ করেই গোবেচারা স্বামীটি রেগে গিয়ে স্ত্রীর আচরনের উচিত শিক্ষা দেন। (উচিত শিক্ষা বলতে এখানে স্ত্রীকে চড় থাপ্পর এমন কি মারপিট ও বাদ যায় না)- এ জাতীয় চলচ্চিত্র সমাজে নারীকে শুধু অমর্যাদাই করে না নারীর ভার্বমূতি সম্পর্কে সমাজে একধরনের নেতিবাচক ধারণা চাপিয়ে দেয়। এও বুঝানো হয় যে শাসন না করলে নারী কুটিল ও জটিল হয়। এ ধরণের ছবিগুলি। পুরুষকে প্রশ্নভাবে নারী শাসনের লাইসেন্স দিয়ে থাকে। যার প্রভাবে মমাতো নারী নির্যাতনের পথ উন্মোচিত হয়।

এ কালের সিনেমায় নারী ঃ

স্বাধীনতা উত্তর কালে-মুক্তিযুদ্ধের বেনামে নির্মিত নিম্নমানের ছায়াছবিতে বিকৃত-চিন্তা থেকেই নারী ধর্ষণ, খুনোখুনি, হত্যা, মারদাংগা, রক্তপাত বিভীষিকাময় দৃশ্যগুলো জায়েজ করার প্রবণতা, মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ছবি বা স্বাধীনতা উত্তর কালে রাষ্ট্রের অস্থিতিশীলতার ছবি প্রদর্শন করতে গিয়ে নারী অবমাননা কর দৃশ্য নিয়মিত প্রদর্শিত হতে থাকে।

"দেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা ছাড়াও এই নতুন ট্রেন্ডের শেকড় গজায় ৭০ দশকের প্রথম দিকে। মারপিট, ভায়োলেন্স, নায়কের শৌর্য্য বীর্য, বীরত্ব প্রদর্শনের লক্ষ্যে বোম্বেতে স্নায়ু উত্তেজক ছবি নির্মানের হিড়িক পড়ে। তারপর বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও ভিসিআর এর কল্যানে উল্লেখিত ট্রেন্ডের ছবির নিম্নমানের অনুকরণ শুরু হয় 'মর্ডান সুপার এ্যাকশন ড্রামা'র নামে। এসব ছবিতে গল্পের কোন বালাই নেই। মার কাট-লুট মার্কা, রাস্তার মাস্তানদের শারিরিক শক্তি ও রূপকথার মত কেরামতী প্রদর্শনই প্রতিটি ছবির একমাত্র

লক্ষ্য। ছবির প্রায় আশিভাগ জুড়েই থাকে নায়কের উদ্ভট কেরামতির মাজেজা। বাকী বিশ ভাগ নায়িকা তার দেহ প্রদর্শন ও অশ্লীল ইঙ্গিতময় নৃত্য গীত করা ছাড়া, অভিনয়ের কোন সুযোগ পান না।[২১] প্রথম শ্রেণীর নায়িকা বলে খ্যাত অভিনেত্রীগন চটুল ও অশালীন কথার গানের সাথে যে সব স্বতঃস্ফূর্ত কুরুচিপূর্ণ অঙ্গ ভঙ্গী করে নাচ গান করে থাকেন তা দেখে কে বলবে তারা সমাজের সম্মানিত নারী। এ ক্ষেত্রে পরিচালকগন যুক্তি দেখান এসব নাচ-গান না থাকলে ছবির কাটতি থাকে না। আর চলচ্চিত্রে আগমনের প্রাথমিক অবস্থায় অভিনেত্রীগণ আর্থিক অসংগতির কারণে নির্মাতাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে বাধ্য হন। অনেকে আবার আফসোস করে বলে থাকেন ভাল চরিত্র অভিনয় করার সুযোগ না পাওয়ার কারণে। কেউ বা আর্থিক সংগতি হলে প্রডাকশন গড়তে পারলে অবশ্যই ভাল কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে ভাল ছবি নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। ভাল চরিত্রে অভিনয় করবেন বলে আশা বাদ ব্যক্ত করে থাকেন। কিন্তু এদেশের চলচ্চিত্রে পুরোণ ব্যক্তিদের এ ধরনের সুযোগ হওয়ার পরও দেখা গেছে নারীকে যথেষ্ট সম্মান জনকভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি তারা। এক্ষেত্রে একে আত্মমর্যাদার অভাব, অর্থলোভ বা দাসত্ব সুলভ মানসিকতা ইত্যাদি বিশেষনে বিশেষিত না করে একে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব বলা যায়।

বর্তমানে চলচ্চিত্রে অশ্লীলতার মাত্রা বেড়ে গিয়ে অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। 'আর এই অশ্লীলতা বিষয়ক আলোচনায় প্রায়ই নারী অভিনেত্রীদের দায়ী করা হয়। ১৯৯৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত রাঙাবউ ছবি ও তার পরবর্তী বেশ কিছু ছবিকে ঘিরে চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা বিষয়টি ব্যাপক আলোচনায় রূপ পায়। চলচ্চিত্রাঙ্গনের লোকজন চলচ্চিত্রে অশ্লীলতার জন্য রাঙাবউ ছবির ভারতীয় নায়িকা ঋতুপর্নাকে দায়ী করতে থাকে। কয়েক বছর পরে ফায়ার ছবিটিকে নিয়ে অশ্লীলতার আলোচনা আবার তুঙ্গে ওঠে। এক্ষেত্রেও অশ্লীলতার জন্য নায়িকা পলিকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু দুটি ছবির পরিচালকই ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন। তিনি বরাবরই অভিযোগের বাইরে থেকে যান। নারী এখানে অশ্লীলতার উপাদান, আর অশ্লীলতার হোতা পুরুষ পরিচালকটি এবং তার প্রযোজক, যিনি যৌনতা বিক্রি করে মুনাফা করতে চান। অথচ অশ্লীলতার জন্য কেবলই নারীকে দায়ী করা হয়। চলচ্চিত্রের লোকজন থেকে শুরু করে পত্র পত্রিকার রিপোর্টার সম্পাদক সবাই এক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দোষ দুষ্ট।[২২]

---

[২১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।
[২২] ফাহমিদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

অশ্লীল ছবিতে ক্যামেরার কারসাজিতে নারীকে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে নারীটি পুরুষতান্ত্রিকতার ঊর্ধ্বে উঠে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করতে পারছে না। এবং এ ক্ষেত্রে নারীটি প্রবল আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন হলে কখনও এ ধরনের ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হত না। ইদানিং ছবিতে জুড়ে দেয়া হচ্ছে গালিগালাজ, বিকৃত নির্যাতন, ধর্ষণদৃশ্য, যৌন উত্তেজক সংলাপ, নায়ক-নায়িকার শয্যাদৃশ্য ইত্যাদি। পাশাপাশি সেন্সর বোর্ডকে ফাঁকি দিয়ে (বিশেষ করে মফস্বলের সিনেমা হলে) বিভিন্ন সময় পর্দায় ছবি দেখানোর সময় চলছে দেশী কিংবা বিদেশী পর্নোছবির কাটপিস প্রদর্শনী। সিনেমা হলের সামনে কিংবা পথে ঘাটে বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞাপন বা পোস্টারের সিংহ ভাগ জুড়েই থাকছে নারীর অশ্লীল পোট্রেট। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি ইদানিং নতুন উপসর্গ হিসাবে অশ্লীল মিউজিক ভিডিও, ভিসিডি ও ডিভিডিও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে হলিউড-বলিউডসহ গোটা পৃথিবীর সর্বত্র নারীদেহকে পুঁজি করে চলচ্চিত্র নির্মাণের যে হুজুগ চলছে তাতে এখন আমাদের ঢালিউড ও ভালোমতোই মেতেছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

এদেশে ফায়ার ছবির পরেও আরও অনেক ছবি, বলতে গেলে কয়েক বছরের সিংহভাগ ছবি পর্নোগ্রাফিক হয়ে উঠেছে এবং এসবের জন্য অভিনেত্রীদেরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী করা হয়েছে। অভিনেত্রীরা যদিও এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে এড়াতে পারেন না-কিন্তু এক্ষেত্রে নিমার্তাদের নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই বেশি দায়ী। দৈনিক প্রথম আলো চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদন ছেপে বেশ প্রশংসাযোগ্য কাজ করেছে। তারা বিনোদন বিষয়ক 'আনন্দ' পাতায় ধারাবাহিকভাবে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত নায়িকা ময়ূরী, পলি, ঝুমকার সাক্ষাৎকার ছেপেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব চেয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় এই কাঠগড়ায় কোন পরিচালক বা প্রযোজককে দাঁড় করানো হয়নি-কিংবা তাদের এ সংক্রান্ত জবাবদিহিতা কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপানো হয়নি। ফলে দেখা যাচ্ছে অশ্লীলতা বিষয়ক আলোচনাগুলো ব্যাপকভাবে পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত বা আক্রান্ত, যা প্রকৃত সমস্যাগুলোকে অনেক সময় আড়াল করে দিয়েছে, কখনো বা নারীকে দোষী করে নিজের সব অন্যায় ও অপচিন্তার দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। চলচ্চিত্রের মান নেমে যাওয়ায় এবং বিকল্প অনেক বিনোদন মাধ্যম থাকায়, মানুষের কর্মব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় কিংবা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে যে কারণেই হোক মানুষ এখন আর সিনেমা হলে গিয়ে ছবি তেমন দেখে না। কেবল প্রত্যন্ত অঞ্চলে, কিংবা শহরে কর্মব্যস্ত গরীব শ্রমিক শ্রেণী

Dhaka University Institutional Repository

(যেমন রিক্সাওয়ালা, গার্মেন্টস কর্মী, বাস-ট্রাক ড্রাইভার যারা পরিবার থেকে অধিকাংশ সময় দূরে থাকে) যাদের সিনেমা ছাড়া আর তেমন কোন বিনোদন মাধ্যম নেই তারাই সিনেমা হলে গিয়ে ছায়াছবি দেখে। কিন্তু এই দর্শকের ও শতকরা প্রায় ১০০ ভাগই পুরুষ। সিনেমার বিষয় বা আধেয়ই এর কারণ। এতে পুরুষ শ্রেণী আরও নারী বিদ্বেষী, আরও হিংস্র, আরও অশালীন আরও মানবিকবোধশূন্য হয়ে পড়ছে এবং সেই সাথে সাথে তারা নারীর মানবিক মূল্যবোধকে গুরুত্বহীন ভাবে গ্রহণ করছে। এতে তরুন সমাজ প্রচন্ড ভাবে মূল্যবোধহীণ হয়ে পড়ছে। মানবিকতার পরিবর্তে অশ্লীলতার চর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠছে এবং বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এবং এই সিনেমার প্রভাবেই তরুন সমাজ মাদকাশক্তি ও অস্থিতিশীলতায় ভুগছে। তারা জীবন গঠনের সুন্দর সময়টা অশ্লীলতা ও নারী দেহের অপরূপায়ণ মূলক চিত্রের প্রভাবে সুস্থ চিন্তা চেতনা ও বিবেকবোধ শূন্য হয়ে পড়ে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলে। এতে সমাজ উন্নয়নের পথ আরও দূরবর্তী হচ্ছে। এক্ষেত্রে আরও ভীষন ক্ষতি হয়েছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির। এর কারণ, এক সময় দর্শকদের এক বিরাট অংশই ছিল নারী। তারা কাজের অবসরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সিনেমা দেখতে যেত। তারা প্রাত্যাহিক কাজ কর্মের অবসরে চিত্ত বিনোদনের সুযোগ পেত। কিন্তু বর্তমানে নারীর সিনেমা বিমুখতা তাকে আরও গৃহাশ্রয়ী করে তুলছে। যারা নিতান্তই গৃহিনী তাদের ঘর থেকে বাইরে আসার যে একটা উপলক্ষ্য বা উপায় ছিল তা ও বন্ধ করে দিয়েছে এই মাধ্যমটি।

৭.৪ চলচ্চিত্রে পুঁজি বিনিয়োকারী ও পরিচালকদের মানসিকতা ঃ

আগের দিনের সামাজিক বা রোমান্টিক ধারার ছবিগুলোতে নায়িকা চরিত্রের বিস্তার ছিল বেশ খানিকটা আয়তন জুড়ে। কিন্তু বর্তমানে চলচ্চিত্র গুলোতে ভায়োলেন্স ও সেক্স ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় নারী চরিত্রগুলোর পরিসর আরও সীমিত হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রতিশোধস্পৃহ নায়ককে পুরো ছবি জুড়ে নিজের হারানো অধিকার ফিরে পেতে নানা রকম কর্মকান্ডে ব্যস্ত থাকতে হয়। এর জন্য চুরি চামারি পকেটমার, গুন্ডামী-ভন্ডামী, চোরাচালানী, খুন-রাহাজানি, মাস্তানি সব কিছুই তার জন্য জায়েজ করা হয়। পুরোটা সময় তাকে শত্রুনিধনে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে নায়িকার সঙ্গে রোমান্স করার সময় থাকে কমই। সে কারণে রোমান্স পুর্বে দুয়েকটি ব্যতিব্যস্ত গান ছাড়া তাকে জোরালো ভূমিকায় তেমন দেখা যায় না। তাই এ সমাজের পুরুষকে তার সুন্দর স্বপ্নমুখর মানবিক সম্পর্ক, ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সুকুমার বৃত্তি

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে এই চলচ্চিত্র মাধ্যম। আর তাই পর্নোগ্রাফিক ছবিগুলোতে নায়িকার ভূমিকা গুরুত্বের নিক্তিতে নর্তকীর ভূমিকার কাছাকাছি নেমে এসেছে। এভাবে এদেশের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজে প্রতিনিয়ত নারীর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক প্রচার প্রচারণা চলছে। পুঁজি বিনিয়োগ কারীদের চটজলদি মুনাফালাভের মানসিকতা এক্ষেত্রে বহুলাংশে দায়ী। শিক্ষার অভাব, সামন্তবাদী মনোভাব, প্রচলিত সামাজিক গৎবাধা ধারণা নারী প্রতীমা নির্মাণের ক্ষেত্রে অপরূপপায়নকে উৎসাহিত করছে।

"বাংলা ছবিতে নারী প্রায়ই-সহিংসতার শিকার হয়। বিশেষত ধর্ষণের মাধ্যমে এই সহিংসতা নিয়মিত এক রূপ পায়। সাম্প্রতিক কিছু ছবিতে [বিদ্রোহী সালাউদ্দিন (২০০৪), বাঘের বাচ্চা (২০০৪)] নায়িকার কোন 'বেয়াদবীর' কারণে নায়ক কর্তৃক প্রহৃত হয়, যদিও পরবর্তী সময়ে নায়কের কোন মহানুভবতা দেখে সে নায়কের প্রেমেও পড়ে যায়। এ ভাবে নারী প্রতি সহিংসতার বৈধকরন ঘটে।"[২৩]

'চলচ্চিত্রের বর্তমান দুরবস্থা নিয়ে সাধারণ দর্শকের পাশাপাশি খোদ চলচ্চিত্র মহলেই গভীর হতাশা ও চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। চলচ্চিত্রের শিল্পী কলাকুশলী নির্মাতা প্রযোজক পরিচালক পরিবেশক ইত্যাদি বিভিন্ন সমিতির পারস্পারিক মতবিরোধ সৃষ্টি করছে অচলাবস্থা। এ পরিস্থিতিতে সুস্থ বিনোদনমূলক ছবির নির্মাতারা কোনঠাসা হয়ে পড়েছেন। অনেক শিল্পী কুশলী অশ্লীল চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করবেন না বলে ঘোষনা দিয়েছেন। তারা চলচ্চিত্রে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলন, সমাবেশ, কর্মবিরতি ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছেন।'[২৪]

'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারী পরিচালকের অভাব নারীর অপরূপায়ণকে স্বাভাবিক ঘটনায় পরিনত করেছে। ইরানের মতো ইসলামিক দেশে শতকরা ২৫ ভাগ পরিচালকই নারী এবং চলচ্চিত্রের অন্যান্য ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগ নারী কাজ করছে।[২৫] আমাদের প্রতিবেশী ভারতে অপর্ণা সেন, মিরা নায়ার, দীপা মেহতার মতো নন্দিত পরিচালক রয়েছেন। অথচ আমাদের দেশে কোন নিয়ামিত নারী পরিচালক নেই।

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।
[২৪] স্টেপস নিবন্ধ 'গণমাধ্যমে নারী', উন্নয়ন পদক্ষেপ, বর্ষ-১০, সংখ্যা-৩৫, পৃঃ ৪২। (মুহম্মদ আলী রেজার 'ইনফরমেশন কার্ড অন ওমেন ইন মিডিয়া' থেকে অনূদিত)।
[২৫] সুলতানা মাহমুদা (২০০২), 'ঢাকার চলচ্চিত্রে নারীঃ দানব দেবতা ও পতির রাজ্যে নারী, এস্ত্রী ও সতী, গণমাধ্যম ও জনসমাজ, গীতিআরা নাসরীন ও অন্যান্য সম্পাদিত, শ্রাবণ প্রকাশনা, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যত জন পরিচালক ছিলেন তা হাতে গুণে ফেলা যাবে। ইরানের নারী চলচ্চিত্রকাররা নারীদে সমস্যা নিয়ে ছবি করেন, অপেক্ষাকৃত রক্ষনশীল সমাজে বাস করেও। বস্তুত নারীর সমস্যা ভিত্তিক ছবি নারীরাই ভালো করতে পারবেন। তাদের নির্মিত ছবিতে নারীর অপরূপায়ণ হবার সম্ভাবনা কমই থাকবে। শামীন আখতার, ইয়াসমিন কবির, নার্গিস আখতারের মতো কয়েকজন আছেন যারা বিকল্প ধারার ছবি নির্মাণ করেন। এদের মধ্যে নার্গিস আখতার মূলধারায় নিয়মিত ছবি করছেন, স্টেপস, টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট নামক উন্নয়ন সংগঠন বেশ কযেকজন নারী চলচ্চিত্রকারের প্রমাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। মূলধারায় সুচন্দা, মৌসুমীর মতো করেকজন পরিচালনায় এসেছেন, ববিতা শাবানা করেছেন প্রযোজনা। কিন্তু নিয়মিতভাবে তাদের ছবি পরিচালনায় দেখা যায় না। রেবেকা সেই ষাটের দশকে নির্মাণ করেছিলেন বিন্দু থেকে বৃত্ত। অথচ চলচ্চিত্র নির্মাণে আজও নারীর উল্লেখযোগ্য স্থানে যেতে পারেননি। বাংলা চলচ্চিত্রের আবহ মারাত্মকভাবে পুরুষতান্ত্রিক।[২৬]

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারী ঃ গবেষণার আলোকে

ঢাকার চরচ্চিত্রে নারী: দানব, দেবতা ও পতির রাজ্যে-নষ্টা একস্ট্রা ও সতী' শীর্ষক গবেষনায় শেখ মাহমুদা সুলতানা (মাহমুদা, ২০০২) ঢাকার চলচ্চিত্রে নারীর রূপায়ণকে যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার এরকম ঃ

- এফ ডিসির চলচ্চিত্রে সতীত্ব একটি ধ্রুব ধারনা। পৌরানিক, রূপকথাভিত্তিক চলচ্চিত্রে ত্যাগের মাধ্যমে নির্দোষ একটি মেয়েকে সারাজীবন সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয় আর আধুনিক জীবনের চলচ্চিত্রে স্বামীর ওপর নির্ভরতা ও পরনারীতে আসক্ত স্বামীকে সুপথে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে তা করতে হয়।
- গৃহ এবং বিয়েই হলো নারীর আরাধ্য। তাই উন্মুক্ত রাজপথে সংক্ষিপ্ত পোশাকে নায়িকা নৃত্য করলেও সকল অত্যচার ও দুর্নীতি গুঁড়িয়ে দেয়া বিজয়ী নায়কের স্ত্রী হিসেবে ঘোমটা দিয়ে সলজ্জ হয়ে নায়কের পিতা-মাতার পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়েই তার পরিচয় নির্দিষ্ট হয়।

---

[২৬] ফাহমিদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

- ঢাকার চলচ্চিত্রে নারীর জন্য একমাত্র পূজনীয় রূপ তার মাতৃত্ব, যেখানে কেবলমাত্র পুত্রবতী মাতৃত্বই স্বীকৃতি অর্জন করে। বন্ধ্যা ও অপুত্রক নারী সবসময়ই হীনম্মন্যতায় ভোগে।
- নারীরাই নারীদের শত্রু। বিমাতা, সতীন, শাশুড়ি, জা, ননদ ইত্যাদি সম্পর্কগুলোর ওপর এক ধরনের কূট নারীরূপ আরোপ করা হয় যারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে।
- ঢাকাই চলচ্চিত্রে নারীরা প্রহার, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি সহিংসতার শিকার। ধর্ষণ খুব আবশ্যক ঘটনা, আর ধর্ষনের শিকার হয় সাধারনত নিম্নবিত্তের নারী, বিধবা, যুবতী, নায়কের বোন বা মাতা। নায়িকাকে কখনোই ধর্ষনের শিকার হতে দেখা যায় না, যদি কখনও ধর্ষনের মুখোমুখি সে হয়, বীর নায়কের আবির্ভাবের মাধ্যমে সেখান থেকে তার মুক্তি ঘটে। নারী ধর্ষিতা হবে, না ধর্ষণ থেকে রক্ষা পাবে তা পুরুষ চরিত্রগুলোর বিন্যাসের ওপরে নির্ভর করে।
- এসব ছবিতে নারী গনিকার ভূমিকায় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত না থাকলে ও খলনায়কের সহচরী বা ভ্যাম্প এবং মদ ও জুয়ার আসরের নর্তকী যে সব নারীরা বাংলা চলচ্চিত্রে 'এক্সট্রা, পরিচয়ে অভিহিত তারা মূলত অকথিত পতিতা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।
- সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রে নারীর ওপর এক ধরনের কৃত্রিম পৌরুষ আরোপের প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যেখানে দস্যুবৃত্তিসহ নানা অপরাধ মূলক পেশায় নারীরা সহিংস প্রতিকৃতিতে নির্মিত হয়। কিন্তু সহিংসতা মানেই সক্রিয়তা নয়, তাই পুরুষের পোশাকে সজ্জিতা, পুরুষের নৃশংসতায় অংশগ্রহণকারী নারীত্বে আসলে কোনো নিজস্বতা থাকে না। বহিস্থরূপে পুরুষালি আচরণ আরোপ করলেই পুরুষ শক্তি ও কর্তৃত্বের যে চর্চা করে তাতে নারীর দখল আসে না বরং নারীত্ব আরো কৃত্রিম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৭.১

২০০২ সালের পাঁচটি ছবিতে নারীর পেশার বিন্যাস (পারভীন, ২০০৫;১৮০)

পেশা সমূহ	মূল নারী চরিত্র	অতিরিক্ত নারী চরিত্র
উকিল	১	---
ব্যবসায়ী	১	১
নর্তকী	২	---
দস্যু	১	---
গৃহপরিচালিকা	----	১
পতিতা	----	৬
পুলিশ	----	৩
অতিরিক্ত	----	১

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মূল নায়িকা চরিত্রগুলো মূলত নায়কের প্রেমের বা সংসারের সঙ্গী হিসেবে থাকে, তার পেশা থাকে না বললেই চলে। মমতাজ পারভীন (২০০৪) 'বাংলা চলচ্চিত্রে পেশাজীবী নারী চরিত্র' শিরোনামে ২০০২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ৫টি ছবি নিয়ে যে গবেষণা করেন তাতে বাংলা চলচ্চিত্রে নারীর পেশার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে নারীকে সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে পতিতা চরিত্রে। (সারণি দ্রষ্টব্য)।

তবে উকিল, ব্যবসায়ী এসব সম্মানজনক পেশায় নারীকে দেখানো হলেও তাকে তার পেশাক্ষেত্রে কর্মরত তেমন দেখা যায় না। "মূলত ছবিতে এসব পেশাজীবী নারীরা নিয়োজিত থাকে মূলত দুটি পেশায়। প্রধানত সংসার ধর্ম পালনেই তাদের বেশি আগ্রহী দেখা যায় আর পেশাগত দায়িত্ব থাকে অবসরের সঙ্গী হিসেবে। কারণ পেশাগত দায়িত্বের চেয়ে পরিবারই তার কাছে প্রধান।"[২৭] (পারভীন : ২০০৪)

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে তরুনী চরিত্রের সমাগম হয় নিম্নের চারভাবে।

(ক) দরিদ্র, বিত্তহীন কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারের আদর্শ মেয়ে। যারা কোন প্রলোভনের কাছেই আত্মসমর্পন করে না (বিচারক, রোজিনা)।

[২৭] পারভীন, মমতাজ (২০০৪)।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) ধনীর দুলালী। টাইট প্যান্ট, হাফ প্যান্ট, সার্ট গেঞ্জী, স্কার্ট ইত্যাদি তাবৎ দুনিয়ায় যত ফ্যাশন আছে বেমানান হলেও তাতে সে অভ্যস্ত। পরচুলা পরে সে ডিসকো নাচে (সুখ দুখের সাথী, প্রতিহিংসা চ্যালেঞ্জ এ ববিতা), বারে গান গায় মদ্য পানেও কম যায় না, বদ মেজাজী বাড়ির চাকরদের কিংবা গাড়ি চালিয়ে থাকে এ্যাক্সিডেন্ট করে তাকে চড় মারা তাদের অভ্যাস, চিৎকার চেচামেচি করে ঘরের সবাইকে তটস্থ রাখা আর সময় অসময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দিয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফেরা ইত্যাদি সব উশৃংখল চরিত্র তার জন্য অপরিহার্য আবার কেউ কেউ ডানপিটে। জগিং ক্রীড়াকমপ্লেক্সে ব্যায়ামও ব্যাট হাতে ব্যাডমিন্টন, টেনিস কিংবা বিলিয়ার্ড খেলায় অভ্যস্ত।

(গ) গ্রাম্য, অশিক্ষিত মেয়ে। দুষ্টু কিন্তু সরল। অনেকটা রবীন্দ্র নাথের সমাপ্তি'র মৃম্ময়ীর ছাঁচে এদের প্রকৃতি গড়ে উঠে। জাগতিক কোন রহস্যই তাদের বোধগম্য নয়। 'বদনাম,' 'তালাক', মানে না মানা', নাগ পূর্নিমায় -ববিতা ঢাকাই মৃম্ময়ী সাজেন।

(ঘ) চতুর্থ ধরনের পুরুষ খোকা, কুটিল ভ্যাম্প। ভিলনের কারণে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টাকার লোভী (সময় কথা বলে)। বড় লোকের মেয়ে এবং ব্যাংকক স্টাইলের ক্লাব নৃত্য করে। (আঘাত এ জুলিরা অন্ত ঃসত্ত্বায় অবস্থাতেও ক্লাবে গিয়ে ডিসকো নাচে)। আর নায়িকা যদি গরীব হয়, বড় লোকের মেয়ে তখন অবশ্যই হবে ভ্যাম্প, এরা ভালবাসে না ভালবাসার উগ্র ভান করে। যদি তার ভালবাসা সত্যি হয় সে আত্মহত্যা করে বা নায়ককে বাঁচাতে গিয়ে মারা যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাবার নির্বাচিতা শিক্ষিত পাত্রীই ভ্যাম্প হয়। এবং তাদের করুন পরিনতি হয। মৃত্যুর সময় সে নায়িকার কাছে ক্ষমা চেয়ে ইহজগত ত্যাগ করে।

মা-চরিত্র

বাংলাদেশের যে কোন শ্রেণীর সামাজিক পরিবেশে মা এক অপরূপ প্রকৃতি নিয়ে বিরাজমান। শুধু এ দেশেই নয় গোটা বিশ্বের সর্বত্রই মা হচ্ছেন মমতাময়ী, আত্মত্যাগী, সময় বিশেষে শাসন কর্ত্রী। আমাদের চলচ্চিত্রে সাধারনত দু'ধরনের মায়ের দেখা মেলে। দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত মা, ধনবতী মা।

এই দু'ধরনের মায়ের চরিত্রই গৎবাঁধা। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মা-সর্বংসহা ধরনীর মত। দুঃখ দারিদ্র আর অর্থকষ্টের সাথে একাই লড়তে গিয়ে কাশি যক্ষা বাঁধান। জীবিকা হিসেবে থাকতে পারে সেলাইকল ও শিক্ষকতা। এ ভাবেই সন্তানদের বড় করেন। স্বামীর আদর্শ

Dhaka University Institutional Repository

বুকে ধারণ করে মুক্তিযোদ্ধার কিংবা আদর্শ-শিক্ষকের কিংবা আদর্শ কোন ধনী মানুষের বিধাবা স্ত্রী হিসেবে বহু কষ্টে ছেলে মেয়েকে লেখা পড়া শেখান। কখনো গ্রাম্য মোড়ল কেড়ে নেয় তার জমিজমা বা শেষ আশ্রয় ভিটে-রাড়ীটিও। ফলে বাধ্য হয়ে সন্তানদের নিয়ে শহরে পাড়ি জমান। কখন ও শহরে এসে সন্তানকে হারিয়ে ফেলেন। দরিদ্র, অশিক্ষিতা মায়ের জন্য নির্ধারিত পেশা -ঝি গিরি, ইট ভাংগা। তবে যে কাজই করুক না কেন, ঘরের বাইরে গিয়ে তাদের পড়তে হয় নারী মাংস লোভী হায়েনা পুরুষের কবলে। (কসাই, কাবিন, উছিলা, নসীব, গলি থেকে রাজপথ)।

দ্বিতীয় ধরনের মায়েরা অবশ্যই আধুনিক ও ধনবতী। এদের বকছাঁটা চুল। এরা হাতাকাটা ব্লাউজ পরে। প্রকট সাজে বিগত যৌবন ধরে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস । মদ্য পান করে। চাকর বাকরদেরকে ধমক চড় থাপ্পরের উপরে রাখে। বাস্তবে হতে পারে কিছু চরিত্র এ রকম। কিন্তু সব ছবিতেই শিক্ষিতা, আধুনিকা, বিত্তবান নারী, সমাজ সেবিকা নারীর চোখে সান গ্লাস আর হাতে ব্যাগ নিলেই ধরে নিতে হবে সে ভয়াবহ মা-এটা ঠিক নয় (মান-সম্মান, সুখের সংসার, মাইলাভ)। এ ধরনের মায়েদের সন্তানদের প্রতি বিশেষ দায়িত্ববোধ ও দেখা যায় না- যা বাস্তবে খুব কমই আছে। আর দরিদ্র মধ্যবিত্ত হলেই, সেই মা বিছানায় শুয়ে 'খোকা এলো' বলে ঘুম থেকে উঠে বসেন। তিনি স্নেহময়ী মা।

বাস্তব জীবনের মত পুরুষ নিয়ন্ত্রিত চলচ্চিত্রেও তাই নারী সব চাইতে শোষিত। নারী বাস্তব জীবনের দুর্ভাগ্যকে জয় করেন লেখাপড়া শিখে, অফিস আদালতে চাকুরী করে। অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধিও আজ বিস্তৃত। পুলিশ, পিয়ন, সেলস গার্ল থেকে গাড়ীর ড্রাইভারী পর্যন্ত মেয়েরা করছেন। পাশাপাশি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলো তো আছেই। কিন্তু পর্দার নারীদের আত্মজয়ের দুটি পথই খোলা আছে। এক দস্যুফুলন হওয়া, দুই মদ্যশালায় নর্তকী বনে যাওয়া। জীবন থেকে দূরে -সমাজচেতনাহীন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত মাধ্যম যেখানে 'নারী শোষণ' খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।[২৮]

রুশ শিল্পতাত্তিক নি গা চেরনি শেভস্কির মতে "যাবতীয় শিল্পের মূল্য নির্ধারিত হয়, তা সমাজকে কি পরিমান শিক্ষানীয় জিনিস দিল তদ্বারা শিল্প সমাজের মধ্যে এক মহায়তন চেতনা ও জ্ঞান প্রসারিত করে।" কিন্তু আমাদের দেশের চলচ্চিত্র শিল্প এখনও কিছু বাস্তবতা বিরোধী চিত্র উপস্থাপন করে যাচ্ছে এবং কিছু গতবাঁধা অবাস্তব, প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যা

[২৮] মাহমুদা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র মাধ্যম নারী সম্পর্কে প্রতিনিয়ত নেতিবাচক পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে উন্নয়নকে পিছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখানে মহায়তন জ্ঞানের প্রসারের পরিবর্তে জ্ঞান বিরোধী প্রচারণা চলছে। তবে চলচ্চিত্রকে এই অধঃপতন থেকে উদ্ধার করার জন্য বর্তমানে বোদ্ধা সমাজ, শিল্পী, কুশলী, অর্থলগ্নীকারক অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে ফিরিয়ে আনার জন্য সুস্থ্য ধারার চলচ্চিত্র নির্মানের প্রয়োজনীয়তা উপলক্ষে তারা বিভিন্ন ধরনের আলাপ আলোচনা, সভাসমিতি করছেন এবং ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। ইদানিং অনেক সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। অশ্লীলতা বিবর্জিত ভালো গল্প ও ভালো চরিত্র নিয়ে ছবি তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠ পোষকতায় কিছু ছবি নির্মিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যুবক শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা, দেশ প্রেম, আত্মসচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্য ইতোমধ্যে বেশ কিছু ছবি তৈরি হয়েছে যা মানুষ প্রেক্ষাগৃহে গিয়েই উপভোগ করেছে। অশ্লীলতা ছাড়া যে ছবি বাণিজ্যিক ভাবে সফল হবে না এ ছবিগুলো প্রদর্শনের পর নির্মাতাদের এতদিনের এই দুর্বলযুক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিছু কিছু পূর্ণদৈর্ঘ ছবিও টেলিফিল্ম (লালসবুজ, চাকা, স্বপ্নডানা, আমার আছে জল, নয় নম্বর বিপদ সংকেত, দারুচিনি দ্বীপ মাটির ময়না, আহা, শঙ্খ নীল কারাগার, মোল্লা বাড়ীর বৌ, সাঝঘর, দুখাই, শ্রাবন মেঘের দিন) জনসাধারনকে আবার সিনেমা হলে ফিরিয়ে এনেছে। এগুলি জনসাধারনের মনে সিনেমা সম্পর্কিত নেতিবাচক ধারণা বদলে দিয়েছে। কিন্তু 'ব্যাচেলর' ছাবিটির গল্প প্রশ্ন সাপেক্ষ যেখানে ঠাট্টারছলে যুবসমাজকে মিথ্যার চর্চা শেখান হয় -এরকম অধুনিক গল্প আমাদের কাম্য নয়। 'রং নম্বরের' মধ্যে হাসির খোরাক যথেষ্টই আছে, কিন্তু প্রথম দিকে হোস্টেলের ছাত্রীদের মোবাইল ফোনে মিস্ কল দেবার যে খেলা দেখা গিয়েছে সে গুলি ছাড়াও তারুন্যদীপ্ত ছেলে মেয়েদের আনন্দ-ফুর্তির রসদের অভাব থাকার কথা নয়। বাস্তবতার সাথে মিল রেখে সমাজ সচেতনতামূলক ছবি তৈরি হলে, নারীর সঠিক মূল্যায়ণ হলে সমাজের মধ্যে বিরাজমান কুসংস্কার দূর হবে। এখন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের যে অর্জনগুলো আছে তার ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে মেয়েদের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার প্রেক্ষিত তৈরি করা।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫ টেলিভিশন ও নারী

বর্তমানে আমাদের দেশের গণমাধ্যম সমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় মাধ্যম হলো টেলিভিশন। শুধু আমাদের দেশে বললেই ভুল হবে গোটা বিশ্বেই গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। টেলিভিশনে একই সঙ্গে দেখা ও শোনার কাজটি হয়ে থাকে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন বক্তব্য ও মতাদর্শ প্রচারিত হয়ে থাকে যা জনমনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে সক্ষম। এছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে সিনেমা বিমুখীতা, বিনোদনের উপকরণের অভাব, সময়ের অভাব, কর্মব্যস্ততা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে এখন টেলিভিশন বিনোদনের একটি বিরাট খোরাক। এর মধ্যে নাটক, খবর, বিভিন্ন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, সিনেমা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে দর্শকদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে টেলিভিশন আসলেই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় মাধ্যম কিনা? আমাদের দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। টেলিভিশন দেখার জন্য প্রয়োজন টেলিভিশন সেট ও বিদ্যুৎ। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামেও আজকাল বিদ্যুৎ পৌছে গেছে। অনেক গ্রামাঞ্চলে আজকাল সৌরশক্তি ও বায়োগ্যাস প্লান্টের সাহায্যে মানুষ বৈদ্যুতিক সুবিধা পাচ্ছে। যে সব স্থানে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে এবং যেখানে বায়োগ্যাস প্লান্টের সুবিধা রয়েছে সেসব এলাকায় টেলিভিশনের প্রভাব কার্যকরী। অবশ্য টিভি সেট কেনার ক্ষেত্রে আর্থিক স্বাচ্ছন্দের প্রশ্ন এখানে বড় হয়ে দেখা দেয়। তবে একথা ও সত্য যে টেলিভিশন আজকাল আর বিলাসী সামগ্রী নয় বা ঘরসাজানো জিনিস পত্রের লিষ্টের শেষের দিকে তার অবস্থান নয়, বরং যে কোন প্রকারে কষ্ট করে হলেও একটা সেট কেনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এটা বিশেষভাবে নগর কিংবা উপজেলা এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শহুরে লোকজন যারা চাকুরী নিয়ে উপজেলায় যান তারা গ্রামীণ জীবনের মাঝে টেলিভিশনকেই বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে প্রাধান্য দেন। আর গ্রামের ক্ষেত্রে একটি টেলিভিশন শুধু একটি পরিবারের সদস্যদের, মাঝে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর দর্শক সংখ্যা ব্যাপক। কারণ পাড়া প্রতিবেশীরাও তা দেখতে আসে, বিশেষ করে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা বা তরুণ তরুণীরা। এই নতুন প্রজন্ম যেহেতু ভবিষ্যৎ জাতির কর্ণধার সুতরাং তাদের মাঝে টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। তাছাড়া ছেলেমেয়েরা টেলিভিশন সহ যে কোন মাধ্যমের দ্বারা খুব সহজে প্রবাভিত হয় এবং এসব মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন মতাদর্শকে আত্মস্থ করে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। টেলিভিশনে প্রচারিত প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানমালা তাই তাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

অবদান রাখে। এ দিক থেকে দেখলে বলা যায় টেলিভিশন একটি অত্যন্ত শক্তিশালী গণমাধ্যম যার দ্বারা জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ প্রভাবিত হন। পূর্বে এদেশে শুধু সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন এর মাধ্যমে মানুষ প্রভাবিত হত। কিন্তু বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এবং স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশীয় বিভিন্ন চ্যানেলগুলির পাশাপাশি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালা ও মানুষ উপভোগ করছে। যার ফলে সমগ্র বিশ্বের শিল্প-সংস্কৃতির সাথে মানুষ পরিচিত হচ্ছে। বিশ্ব বাজার অর্থনীতির প্রভাবে টেলিভিশন অনুষ্ঠানমালা বাণিজ্যিকরণের আওতায় আনা হয়েছে। আর বিশ্বায়নের একটি বড় প্রভাব হচ্ছে পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে নারীকেও পুঁজিহিসেবে ব্যবহার করা। যার ফলে টেলিভিশন অনুষ্ঠানমালায় নারীর উপস্থিতি সৌন্দর্যের খোলসে বাণিজ্যের হাতিয়ার হয়ে ধরা দেয়।

সমগ্র বিশ্বে টেলিভিশনের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সম্পর্কের একটা সার্বজনীন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। শ্রবণ-দর্শন সম্বন্ধীয় মাধ্যম হবার কারণে এতে সৌন্দর্যও যৌনতার প্রতীক হিসেবে নারীকে উপস্থাপন করা হয় পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিভূ হিসেবে। টেলিভিশনের সংবাদ, টেলিফিল্ম, সোপ অপেরা, টক শো, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে নারীকে অনেকটা সমাজ আরোপিত চরিত্রের রূপায়ণ করতে দেখা যায়। যদিও নারীকে সংবাদ, টেলিফিল্ম এবং অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়ও দেখা যায়।

টেলিভিশনের নাটক, গান, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে নারীকে প্রায় সব সময়ই দেখা যায় সাজসজ্জা করে দর্শকদের আকৃষ্ট করার একটা অলিখিত প্রতিযোগ, সুন্দরী হওয়ার জন্য নানান চেষ্টা, কিংবা রান্নাবান্না ধোয়ামোছা, বাচ্চার দেখাশোনা ইত্যাদি গৃহস্থালী বিষয় নিয়ে মেতে থাকছে। বর্তমানে নারী যে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করে, সব ধরণের পেশায় যে তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে, গৃহস্থালী কাজের বাইরে কিংবা রূপচর্চার বাইরেও তার যে অনেক কর্মকান্ড রয়েছে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলিতে তার প্রতিফলন ততটা চোখে পড়ে না। নারী ঘরের বাইরে কাজ করছে এমন দেখালেও তার মূল জায়গা যে রান্নাঘর কিংবা মূলকাজ স্বামী-সন্তান ও সংসারের পরিচর্যা করা সেটি দৃশ্যায়নে কখনো ভুল বা কসুর করে না টেলিভিশন। বিশেষ করে টেলিভিশনে প্রচারিত নারী বিষয়ক অনুষ্ঠান, নাটক, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে সব সময় নারীর গৃহস্থালী ভূমিকাকেই বেশি দেখানো হয়। এ হল নতুন সাজে পুরানকে সংরক্ষণ। আবরণে আভরণে নারীকে আধুনিক ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করা হলেও ব্যক্তিগত, সামাজিক ইত্যাদি সার্বিক দিক থেকে তাকে সনাতনীরূপে দেখাতেই টেলিভিশন গুলো বেশি উৎসাহী। চলচ্চিত্রের তুলনায় অনেকটা পারিবারিক মিডিয়া হওয়ায় টেলিভিশনে নারীকে যৌন প্রতীক হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার করা হলেও, সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে তাকে ব্যবহার করার প্রবণতা সর্বত্রই দৃশ্যমান। কিন্তু টেলিভিশনে প্রচারিত চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রের গান, মিউজিক ভিডিও, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপকভাবে যৌন প্রতীকরূপেও উপস্থাপন করতে দেখা যায়। তবে আজকাল স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলোর খবর দর্শকদের কাছে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মেয়েদের "টিভি রিপোর্টিং"। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের নারী রিপোর্টারগণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন।

এটি ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের পথে নারীকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। টেলিভিশন সংবাদে অনেক নারীকে দেখা গেলেও তাদের বেশিরভাগের ভূমিকাই নিজউ-প্রেজেন্টার বা সংবাদ উপস্থাপকের। রিপোর্টিং এ তাদের অবস্থান পুরুষের তুলনায় অনেক কম। তবে আজকাল টিভি সাংবাদিকতায় নারীর আগ্রহ যথেষ্ট বেড়েছে। আবার সংবাদ উপস্থাপক বা পাঠকদের মধ্যে পুরুষের চাইতে নারীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে থাকে। এতে প্রমাণ হয় যে, টেলিভিশনের সংবাদ বিভাগে নারীর সৌন্দর্যকে বেশি মূল্য দেয়া হচ্ছে। রিপোর্টিং একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা এবং রিপোর্টিং মেয়েদের কাজ নয় এমন মানসিকতার বশবর্তী হয়ে এক্ষেত্রে মেয়েদের আসতে খুব একটা উৎসাহিত করা হয় না। এখনও সমাজের অনেকে মেয়েদের সাংবদিকতাকে পেশা হিসেবে নেওয়াটাকে তাই সমর্থন করে না বা নিরুৎসাহিত করে। তবে ইটিভি নারীর টিভি সাংবাদিকতা বা রিপোর্টিংকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিল-যেখান থেকে নারী এক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ও অবস্থানটি পাকাপোক্ত করে নিয়ে সারাদেশের স্যাটেলাইট চ্যানেল গুলিতে ছড়িয়ে পড়েন। আবার দেখা যায় খুব কম ক্ষেত্রেই নারীর সংবাদ প্রাধান্য পায়। প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে অবশ্য যাঁরা আসেন তারাও আসেন পুরুষ তান্ত্রিকতার প্রতিভূ হিসেবে। তবে বিভিন্ন মেলা; অনুষ্ঠান আয়োজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খেলাধূলা ইত্যাদি খবরের দর্শক হিসেবে নারীর উপস্থিতি বা দৃশ্যায়নকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হলেও খবরের বিষয়বস্তু হিসেবে নারীকে ততটা প্রাধান্য দেওয়া হয় না বলতে গেলে তাকে গুরুত্বের বাইরে বা প্রান্তিকতায় রেখে দেওয়া হয়। এর কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষের সনাতন মনোভাব বা মতাদর্শকে দায়ী করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

'টেলিফিল্ম বা নাটক এবং সোপ অপেরা বা মেগা সিরিয়ালগুলোতে নারীকে কিছু গৎবাঁধা চরিত্রে দেখা যায়। পাশ্চাত্যের সোপ অপেরা এবং ভারতীয় মেগা সিরিয়ালগুলোর মূল বিষয়বস্তু প্রেম, পরকীয়া প্রেম, পরনারীতে আসক্তি ইত্যাদি। আর বাংলাদেশের টেলিভিশনের নাটকগুলোতে বহু আগেই থেকে নারীকে সীমিত কিছু ভূমিকায় দেখা যায়।"[২৯]

'নাটকে প্রতিফলিত বিত্তশালী ঘরের মেয়েরা সাধারণঃ কি ধরণের হয়? .... উচ্ছৃঙ্খল, প্রাচুর্যের মোহগ্রস্থ, খেয়ালী মধ্যবিত্তের প্রতি ঘৃণা বিত্তশালী নারীর প্রকৃতি। ধরেই নেওয়া হয় যে প্রাচুর্য্যের মধ্যে বড় হওয়া নারী এই চরিত্রের হবে। ------------------------------- অথচ সব বিত্তশীল শ্রেণীর নারীই যে এমনটি নয় তার প্রচার অনুল্লেখ্য। এই যে ছক বাঁধা নারী চরিত্র এর বাইরে বের হয়ে আসার প্রয়াস টেলিভিশন নাটকে কম।"[৩০] তবে ইদানিং কিছু কিছু নাটক বা টেলিফিল্ম এর মধ্যে এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। টেলিফিল্ম ও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলিতে আজকাল নারীর ভূমিকাকে বেশ গুরত্বপূর্ণ হিসেবে ও দেখা যায়। আজকাল অনেক নারীকে নাট্যশিল্পের সাথে জড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। নারীরা নাট্যকার, প্রযোজক, নির্মাতা, নির্দেশক ইত্যাদি ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে বলে টেলিভিশনে আজকাল নারীকে অনেকটা ইতিবাচকরূপে দেখা যাচ্ছে।

আবার নাটকে 'মধ্যবিত্ত মায়ের চরিত্র একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ------------------- তারা সহজ, সরল, সন্তানঅন্ত প্রাণ, সব সময় শান্তি রক্ষায় অগ্রণী, সমঝোতায় আসার প্রয়াসী, অর্থাৎ একটি সুবোধ চরিত্র। এরা অপমানকে সহজে গায়ে মাখে না ইত্যাদি। আমাদের সমাজে নারী সম্পর্কে দুটি বোধ কাজ করে। ১. পুরুষের প্রয়োজনের সামগ্রী, রমনীয় ও যৌন বিষয় (Sex object) ২. মাতৃত্বের সুষমায় মন্ডিত। ---------- নারীর ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা ইমেজ প্রধান ভূমিকা রাখে। অথচ মা'রাও যে নারী তাদেরও যে ব্যক্তি সত্ত্বা বিদ্যমান, তারাও যে দোষেগুণে মানুষ এমনটা দেখানো হয় না। -------------- নাটকে সাধারণতঃ নারী চরিত্রগুলো এমনভাবে অংকন করা হয় যে, নারী যতই বিত্তশীল শ্রেণীর, রূপে গুণে অন্যান্য, আত্মমর্যাদাশীল, ব্যক্তিত্ববান হোক না কেন একটা পর্যায়ে তারা পুরুষের কাছে সমর্পিত হবেই। বিয়ের পর নারী স্বামীর ঘর এবং মর্যাদার সংঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে এবং সেই শ্রেণীভুক্ত হওয়া ও সেই শ্রেণীর মূল্যবোধের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা

[২৯] ফাহমিদুল হক, মিডিয়া ও নারী, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ২০০৬, পৃঃ ১৪।

[৩০] সুরাইয়া বেগম (১৯৮৭); বাংলাদেশ টেলিভিশন নাটকে নারীর ইমেজ; গনমাধ্যম ও নারী; নারী সংহতি; ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

করে। এটাই উচিৎ বলে মনে করা হয়। এর বিপরীত হলেই সেই নারী সমাজের চোখে 'আদর্শ' নয়।[৩১] নাটকে সাধারণত তুলনামূলক বিচারে সবসময় পুরুষের ভূমিকাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখানো হয়। এরা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ় চরিত্র সম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল, মর্যাদার প্রশ্নে অটল। স্বীয় ব্যক্তি সত্ত্বাকে অক্ষুন্নরাখার জন্য তারা যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে সংকল্পবদ্ধ, দৃঢ়চেতা। সেখানে স্ত্রী বা বৈবাহিক সম্পর্ক কোন প্রভাব রাখে না বা তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় না। পুরুষ তার সুবিধামত বা নিজের মত করে স্ত্রীকে গড়ে নিতে চায় এবং সেভাবে আচরণ করে। এক্ষেত্রে ভালবাসার চেয়ে প্রভুত্বের মানসিকতা বেশি কাজ করে। তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নারীকে আদেশ নির্দেশ করে। তারা নিজেরা যদিও পাশ্চাত্য পোশাক যেমন স্লিপিং স্যুট ইত্যাদি পরে স্বীয় শারীরিক আয়েশকে অক্ষুন্ন রাখে-তবু নারীকে বারো হাত শাড়ী পেচিয়ে থাকার মধ্যে বাঙ্গালীত্ব খুঁজে পায়। এটি টেলিভিশন নাটকের একটি বিপরীত মুখী প্রবনতা যা বিদ্যমানতার প্রভাবকে মজবুত গাঁথুনি দেয়। নাটকগুলোকে নারীর শারীরিক আরাম-আয়েশ, ক্লান্তি, বিশ্রাম এসবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিস্পৃহ দেখা যায়। আবার নারী যতই দৃঢ় চরিত্র বা প্রতিবাদী হোক না কেন তাকে দেখা যায় প্রিয় পুরুষের প্রণয়াকাংখিনী। অর্থাৎ প্রায় সব নাটকেই দেখা যায়, যে নারী পুরুষের আরাম আয়েশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সব কিছু ত্যাগ করবে, পুরুষের ভালবাসা পাওয়ার জন্য উন্মুখ থাকবে এবং সেজন্য সে সব রকম ছলা-কলা কৌশল অবলম্বন করতে রাজী থাকবে।

সিতারা পারভীন (২০০২ ঃ ৩৯) বলেন, আজকের মহিলাদের আসল সমস্যা আবাসিক সমস্যা, শ্রমজীবী মাতার বাচ্চা লালন-পালনের সমস্যা, বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য, কর্মস্থলে অসুবিধা-খুব কমই টেলিভিশন নাটকে তুলে ধরা হয়। অধিকাংশ নাটকে নারী সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো হয়ে অথবা স্বামী বা শাশুড়ি বা পারিবারিক, রাজনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সত্তার। এদের বিদ্রোহের শেষ পরিণতি হয় সন্তান ধারণ ও সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি অনুগত্য প্রকাশে। এসব নাটকে সমাজ রূপান্তরের কথা আসে না; বলা হয় না সমাজ রূপান্তরে নারীর ভূমিকা কী হতে পারে প্রচলিত মুল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নারীর চরম পরিণতি হয়। বরং একাকিত্বে, বিচ্ছিন্নতায় বা আত্মকেন্দ্রিকতায়- টেলিভিশনে প্রচারিত এই 'সত্য' বাস্তব জগতের বিদ্রোহী সত্তাকে ভীত করে তোলে।

---

[৩১] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে কিংবা টক শো গুলোকে নারীদের ভূমিকা গৌণ। এসব ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা শোভাবর্ধক বা সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপস্থাপকের সহকারী হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে পুরো অনুষ্ঠানের উপর তার বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আবার কখনও কোন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাদের সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। নারীদের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি দেখা যায় রান্নাবিষয়ক অনুষ্ঠান, ফ্যাশন কিংবা রূপচর্চা কিংবা সিনেমার গান ও অন্যান্য বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠান উপস্থাপন এর ক্ষেত্রে।

"অপেক্ষাকৃত সিরিয়াস ধর্মী অনুষ্ঠান, কিংবা যেকোন ধরণের অনুষ্ঠান নির্মাণের ভূমিকায় নারীর উপস্থিতি নগণ্য। এসব প্রবণতায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে, তবে সব মিলিয়ে টেলিভিশনে নারীর উপস্থিতি এরকমই অশিক্ষিত লোকেরা সংবাদপত্র পড়তে পারে না। কিন্তু টেলিভিশন গ্রামীণ নিরক্ষর ও মধ্যবিত্তের লোকজনও দেখে থাকে। অথচ টেলিভিশনের সব অনুষ্ঠানই যেন শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের জন্য নির্মিত হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় টেলিভিশনের নাটক, সংবাদ, টক-শো এবং বিনোদধর্মী অনুষ্ঠানে গ্রামীন ও নিববিত্তের নারীদের প্রবল অনুপস্থিতি। আর যেসব শহুরে নারীদের দেখা যায় তাদের বয়সও অপেক্ষাকৃত তরুন। শেষ পর্যন্ত টেলিভিশন হয়ে দাঁড়ায় বিনোদনধর্মী ও গ্ল্যামারাস একটি মিডিয়া হিসেবে।[৩২] মানবজীবনকে পূর্ণতাদানে ও সুখী করতে বিনোদনমূলক মিডিয়ার অবশ্যই প্রয়োজন। তবে সে বিনোদন অবশ্যই এমন হওয়া উচিত যা সমাজের বসবসারত সকল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সবার জীবনের জন্য সমানভাবে গ্রাহ্য হয়। নারী পুরুষ ভেদাভেদকে যেন তা আরও দূরবর্তী না করে-সেদিকে বিশেষ দৃষ্টিদান করা প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল টেলিভিশন গ্লামারাস আবরণে বিভিন্নভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা এবং নারীর অপরূপায়ণে ও অবমূল্যায়নে ভূমিকা রাখছে। মানুষের মনোজগতে প্রতিষ্ঠা করে চলেছে তথ্য সাম্রাজ্যবাদ। তবে একথা সত্যি যে টেলিভিশন ক্ষেত্র বিশেষে নারীর অবমূল্যায়ন করলেও জাতীয়, পরিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে নারীর প্রতি সমাজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সহায়তা করেছে। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে সমাজে নারী আজ যে উন্নতর অবস্থানে, অবস্থান করছে, সেক্ষেত্রে টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

---

[৩২] ফাহমিদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৬ আকাশ মাধ্যমে প্রাপ্ত নারী ইমেজ ঃ দেশীয় সংস্কৃতির সংকরায়ন

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে পুঁজিবাদের প্রসার বিশ্বব্যাপি বিস্তার লাভ করেছে। অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশগুলো ঋণের নামে গোটাবিশ্বে কায়েম করেছে এক নব্য সাম্রাজ্যবাদ বা আধিপত্যবাদ; এর জন্য তাদের প্রয়োজন হল ঋণ গ্রহণকারী অঞ্চল বা দেশগুলির ওপর মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খল আরোপ করার একধরণের প্রবণতা যা পরোক্ষভাবে মানুষের মনোজগতে উপনিবেশ স্থাপন করে। আর এই মনোজাগতিক প্রভূত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ব্যবহার হতে থাকলো সকল ধরণের যোগাযোগ মাধ্যম। পুজিবাদী অর্থনীতির অন্যান্য শাখার মতোই গণমাধ্যমগুলোকে এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোকে আদর্শিকভাবে অধীন করে রাখার লক্ষ্যে শোষেনের হাতিয়ার হিসেবে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করার তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

এটা ঠিক যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে মানুষে মানুষে দেশে দেশে যোগাযোগ সহজ ও সস্তা হয়েছে। ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, ফ্যাক্স এটা সম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু বিশ্বায়ন সৃষ্ট নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই অমিত সম্ভাবনা সত্ত্বেও তা কাঙ্খিত মানব উন্নয়ন ঘটাচ্ছে না। বরং নতুন করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং দেশের অভ্যন্ত রে মানুষে মানুষে বৈষম্য বেড়েই চলেছে। আর এই বৈষম্য নানামাত্রিক ভৌগলিক, শ্রেণীগত, শিক্ষাগত, জেন্ডারগত, ভাষাগত।[৩৩]

বাজার অর্থনীতি বিশ্বায়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিগত যত উন্নতিই করুক না কেন নারীর জন্য তা তেমন কোন সুখবর বয়ে আনছে না। 'তথ্য- প্রযুক্তির উন্নতি ইতোমধ্যেই পর্ণোগ্রাফি এবং যৌনতায় বিনিয়োগ ও ব্যবসাকে চাঙ্গা করেছে। এ ব্যবসাকে সহায়তা করছে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো। এই ব্যবসায় নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চাইতে বরং নারীকে পণ্যে পরিণত করতে সহায়তা করছে। -------------------- মানবাধিকার কর্মীদের হিসাব মতে, প্রতিমাসে অন্তত ২০০ থেকে ৪ হাজার নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদন মতে, শুধু পাকিস্তানেই প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশী শিশু বর্তমানে পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত আছে। ------------- বিনোদন ও সংস্কৃতি শিল্প

---

[৩৩] 'চিররঞ্জন সরকার, 'নারীর ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব', উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, মার্চ ২০০৭, পৃষ্ঠা ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে নারী এবং তার শরীরকে একেবারে খোলামেলা ও নগ্নভাবে উপস্থাপন করছে, নারীকে পণ্যে রূপান্তরিত করছে।[৩৪]

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিশ্বায়ন মানুষের সামনে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির প্রবাহ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে। এই সংস্কৃতির প্রবাহ ধনীদেশগুলি থেকে গরিব দেশের দিকে এক মুখীভাবে প্রবাহ মান। হলিউড সংস্কৃতি এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে চলেছে। আমাদের দেশের সংস্কৃতির সাথে তাই হলিউড, ভারতীয়, পাকিস্তানী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতি এক অদ্ভুত সংকারায়ন ঘটেছে। যেহেতু আমাদের আকাশ খোলা তাই স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে নানা মুখী শিল্প ও সংস্কৃতির বাজার জাতকরণ সহজতর হয়েছে। নারীকে ক্রেতা হিসেবে টার্গেট করে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো নারী উন্নয়ন ও সচেতনতার নামে তাদের মনোজগতে সংস্কৃতিগত দাসত্বের ভিত রচনা করে চলেছে। এ সংস্কৃতি নারীকে কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে পর্দার আড়াল থেকে বের করে এনে বাজার অর্থনীতির মহাসড়কে চলতে শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু এপথ নারীর জন্য বড়ই পিচ্ছিল। একটু অসচেতন হলেই এখানে হোচট খাওয়া বা পিছলে পড়ার ভয় আছে। ফ্যাশন চ্যানেলগুলি প্রতিনিয়ত তাদের পন্য বিক্রির উদ্দেশ্য নারীকে ফ্যাশন দুরন্ত আকর্ষনীয় করে তৈরি করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এতে নারী একই সাথে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলছে এবং বহুজাতিক কোম্পানী গুলোর মুনাফা লাভে সাহয়তা করছে। সংস্কৃতির সংকরায়নের ফলে নারী দেশী পোশাকের চেয়ে বিদেশী পোশাকে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে। বারো হাত শাড়ীতে শরীর জড়িয়ে কষ্টসাধ্য পথ চলার চেয়ে স্যালোয়ার কামিজ, জিন্স-ফতুয়া, প্যান্ট-সার্ট, মিডি, স্কার্ট, ম্যাক্সি ইত্যাদি তাদের কাছে সুবিধা জনক পোশাক হিসেবে পরিগনিত হচ্ছে। কেউ বা উৎসাহের আতিশয্যে সম্পূর্ণ ওয়েষ্টার্ন পোশাক পরিচ্ছদ পরে নিজেকে ফ্যাশন জগতের একজন দুর্দান্ত সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাচ্ছে। অনেকে সুতি বা পাটের তৈরি পোশাকের পরিবর্তে সিনথেটিক বা নাইলনের পোশাকের প্রতি এর স্বল্পমূল্য ও চাকচিক্যের কারণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। ফলে দেশীয় শিল্প বিশেষ করে পাট শিল্প আজ হুমকির সম্মুখীন। এছাড়া দেশীয় গান-বাজনা আজ বিদেশী সংস্কৃতির ছোঁয়ায় রিমিক্স 'নামক' এক জটিল সংকরায়নের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। ফলে আজকাল গান-বাজনা শ্রবণ অপেক্ষা শ্রবণ দর্শন মাধ্যম হিসেবে অধিক বিবেচিত। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পশ্চিমা ধাঁচে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য

---

[৩৪] প্রাগুক্ত।

প্রদর্শনের এক ধরণের প্রচলন। সিনেমা, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, টক শো ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে চলছে পশ্চিমা সংস্কৃতির সংকরায়ন। উন্নত দেশ গুলোতে বিদ্যমান এই ব্যবসা এখন সবচেয়ে বিকাশমান খাত। হলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মুনাফা বর্তমানে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার। বিমান বা মোটর গাড়ি শিল্প নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় রপ্তানীমুখী খাত এখন এই বিনোদন বা এন্টারটেইনমেন্ট শিল্প। এভাবে মিডিয়া নেটওয়ার্ক, স্যাটেলাইট চ্যানেল, প্রাইভেট টিভি চ্যানেল ইত্যাদির মাধ্যমে ইউরোপ, আমেরিকা সংস্কৃতি তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সারা দুনিয়ার গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি হাজার মানুষের মধ্যে এখন কমপক্ষে ২৫০ জনের নিজস্ব টিভি রয়েছে।[৩৩]

ফলে বিভিন্ন বিদেশী টিভি সিরিয়াল, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্যে যে সংকরায়ন ঘটেছে তা অনেক ক্ষেত্রেই নারী সম্পর্কে একধরনের নেতিবাচক ইমেজ মানুষের সামনে তুলে ধরছে। নারী আজ সর্বত্র তার দক্ষতা ও বিচক্ষণতা প্রমাণে সক্ষম হয়েছে, বিশ্বব্যাপী সর্বত্র তার কর্মক্ষেত্র এ ধরণের ইমেজ যেমন স্যাটেলাইট মাধ্যম প্রচার করতে সক্ষম হয়েছে,- তেমনি আবার টিভি সিরিয়াল, নাটক সিনেমায় তাদের কুটিল, মনোরঞ্জন কারিনী, নির্বোধ, লোভী, হীন মানসিকতা সম্পন্ন, কপট, ভ্যাম্প ইত্যাদি নেতিবাচক ইমেজ নির্মাণে ও পিছপা হয়নি। এসব মাধ্যমগুলো নারীকে সৌন্দর্য ও যৌনতার প্রতীক হিসেবে প্রচার করে তার মহিমান্বিত রূপকে ধামাচাপা দিয়ে অসম্মানজনক ইমেজ নির্মানে লিপ্ত রয়েছে। এসব মাধ্যম গুলো নারীকে পণ্য হিসেবে গণ্য করে বিশ্বজুড়ে যে স্থূল ভোগবাদী সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছে তার সংশুদ্ধি আবশ্যক। এবং এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে গণমাধ্যম।

৭.৭ বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ণ

অর্থনীতির ভাষায় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ‘ক্রেতাই রাজা’। অর্থাৎ ক্রেতার আসক্তি, ভাল লাগা-না-লাগা, পছন্দ-অপছন্দের উপর একটি পণ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। সে অর্থে পণ্য উৎপাদনকারীর ভাগ্য নিয়ন্তা, অর্থনীতির ভাষায় বাজার কিংবা মার্কেট এবং সেই মার্কেটের ভাগ্য নির্ধারক হচ্ছে ক্রেতা। ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য তাই সর্বত্র চলেছে বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতা। যোগাযোগ- তাত্ত্বিক রেমন্ড উইলিয়ামস্ থেকে শুরু করে আমাদের দেশের জাদুকর জুয়েল আইচ, বিশ্লেষক-গবেষক সবাই বিজ্ঞাপনের ‘যাদুকরী’ ভূমিকা বা শাক্তির

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

কথা স্বীকার করেন। বর্তমান যুগে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক পরিচিতি ও কাছে আসার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে বিজ্ঞাপন। এর সাহায্যে উৎপাদনকারী পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে বর্ণনা করে ক্রেতা-ভোক্তা বা দর্শকদের আকৃষ্ট করার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্ঠায় লিপ্ত থাকে আর ক্রেতা পণ্য সম্পর্কে জানতে পারছে। সুতরাং উৎপাদক বা বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েই বিজ্ঞাপনের উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল।

বিক্রেতা নিজের পণ্যের প্রতি ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য, নতুন ক্রেতা সৃষ্টির জন্য এবং অপরের ক্রেতাকে নিজের ক্রেতায় পরিণত করার জন্য পণ্যের গুনাগুন পরিবর্তন না করেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতার মনোজগতে নিজের স্থান করে নেওয়ার চেষ্টা করে। সমগ্র বিশ্বেই তাই বিক্রেতা তার বিজ্ঞাপনে 'আমরাই শ্রেষ্ঠ' 'আমরাই একমাত্র উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদন করি তাই আমার পণ্যই ক্রয় করুন' ইত্যাদি বিভিন্ন রকম মনোহরণকারী বিজ্ঞাপন দিয়ে বাজার সৃষ্টির জন্য শ্রোতা-দর্শকদের মনে বিশেষ স্থান দখল করে নেন। ক্রেতার তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়।

'ক্রেতাকে তুষ্ট রাখার দুটো উপায় আছে। একটা হচ্ছে পণ্যের গুণাগুণ বৃদ্ধি ও দাম ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, পণ্যটিকে আকর্ষণীয় করে তোলা যাতে পণ্যের প্রতি আকর্ষণের কারণে ক্রেতা তা কেনেন। দেখা গেছে, মানুফা প্রথম উদায়ের মাধ্যমে করা গেলেও দ্বিতীয় উপায়ের মাধ্যমে আরও বেশি করা সম্ভব। পণ্যের গুণাগুণ মোটামুটিভাবে রেখে তাকে নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তোলায় যে মানুফা তা অনেক বেশি। তাই দেখা গেছে পণ্যের মোড়ক ও পণ্যের বিজ্ঞাপন এসব বিষয় ব্যবসা জগতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করছে। ক্রেতা পণ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাচ্ছে না। নানাভাবে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পণ্যটি সম্পর্কে তার আকর্ষণ সৃষ্টি করা হচ্ছে।"[৩৬] বর্তমানে বাজার অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না, তবে বিজ্ঞাপনের কিছু নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে যেমন- বিজ্ঞাপন অতিরঞ্জিত ও অসত্য তথ্য উপস্থাপন করে, মানুষকে ভোগবাদী করে তোলে, অপ্রয়োজনীয় চাহিদার জন্ম দেয়, নারীর অধস্তন ইমেজ তুলে ধরে, শিশুদের প্রলুব্ধ করে, পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে, কখনো কখনো মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে তোলে, কখনো কখনো ভয় দেখায়, কখনো লোভ দেখায়, মানুষের অভাব জাগ্রত করে। মন-ভুলানো বক্তব্য হাজির করে, নারীকে যৌনসামগ্রী হিসেবে উপস্থাপন করে, ত্রুটিপূর্ণ ভাষা পরিবেশন করে ইত্যাদি।

[৩৬] ফরিদা আখতার, পণ্যের বিজ্ঞাপন ও নারীঃ নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা, গণমাধ্যম ও নারী, নারী সংহতি পৃঃ ৬৭-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞাপন তৈরিই হয় মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা এমনভাবে বদলে দেয়া হয় যেন তেষ্টা পেলে তার চোখের সামনে একগ্লাস ঠান্ডা পানি ভেসে না উঠে, তার মানসচক্ষে ভেসে ওঠে বরফ শীতল ঠান্ডা কোকাকোলা বা অন্যকোন পানীয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে এই ভোক্তা সংস্কৃতির বিকাশ সর্ব প্রকীর্ণ বলেই বিজ্ঞাপন সর্বত্রসঞ্চারী। বিজ্ঞাপনের কল্যানে মানুষ এখন রান্না শিখে, নির্দিষ্ট প্রকাশনার গাইড বই পড়লে ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল রেজাল্ট করে, কদুর তেল মাথায় দিলে মেয়ে ক্লাসে প্রথম হয়। "আম্মু যে কত লক্ষী তা এ্যাংকরের কাছেই শেখে শিশুরা। দিবস উদ্‌যাপনে বা অনুষ্ঠানের কো-স্পন্সর হয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলা-বিতর্ক সব জায়গাতেই বিজ্ঞাপন উপস্থিত। আন্তর্জাতিক নারী দিবস কখনো হয় স্কয়ার, কখনো জুঁই নারী দিবস। --------------- টেলিভিশন বা রেডিও তে আগে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হতো অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে এখন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে।[৩৭] রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, পত্রিকা, পোস্টার, বিলবোর্ড, হোল্ডিং, গাছের গায়ে ব্রীজের গায়ে, বাক্সের গায়ে, বাসের গায়ে, রিক্সার পিছনে, খেলার মাঠে ইত্যাদির মাধ্যমে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত সমগ্র দেশে বিজ্ঞাপন সঞ্চারিত হয়। বিজ্ঞাপন পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি ও চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের অবচেতন মনে সমাজ সম্পর্কে এক ধরণের ভাবমুর্তি গড়ে তোলে। আমাদের পারস্পরিক ও পারিবারিক সম্পর্ক কী হওয়া উচিত, পুরুষ কী, আর নারী কাকে বলে, সুখের অর্থ কী, সমৃদ্ধি কাকে বলে, কোনটি আমাদের ঐতিহ্য, কোনটি ইতিহাস বা কোনটি আধুনিকতা আর কোনটাই বা সচেতনতার লক্ষন ইত্যাদি সামাজিক বহু কিছুকেই বিজ্ঞাপন স্পর্শ করে। গবেষণা প্রমান করে যে প্রচার মাধ্যমে মানুষ সাধারণ যা দেখে তা তার অবচেতন মনে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষকরে শিশুদের মনে এই প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ভাবে কার্যকর। শৈশবে মিডিয়ায় প্রচারিত মতাদর্শ ও পৃথিবীর বাস্তবতাকে আলাদা করা খুবই কঠিন। সুতরাং মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচারিত মতার্দশ, ভাবমূর্তি বা বাণী কোন কিছুই উপেক্ষা করার মত বিষয় নয়।

বিজ্ঞাপন নির্মার্তারা বলে থাকেন সমাজে যা কিছু বিদ্যমান বিজ্ঞাপন তাই দেখাচ্ছে। নারীর-রূপায়ণ সম্পর্কেও তারা বলে থাকেন সমাজে নারীর অবস্থানটি যেরূপ, বিজ্ঞাপন তারই প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের কথা সত্য হলে বিজ্ঞাপন গুলি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পারি বিজ্ঞাপন কতটুকু বাস্তবের প্রতিনিধিত্ব করে কতটুকু সত্যানুরাগী।

---

[৩৭] গীতিআরা নাসরীন, 'বিজ্ঞাপনে নারীর (অপ) রূপায়ন' উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, বর্ষ-৯, ২৯তম সংখ্যা, ২০০৩, পৃঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেব করে দেখা যায়, বিজ্ঞাপনে যা দেখি তা বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র হলে ঃ

ক) শতকরা নব্বই ভাগ মানুষই হতেন ধনী, যা চান তাই তারা কিনে ফেলতে পারতেন।

খ) জনসংখ্যার শতকরা বাহাত্তর ভাগ হতো নারী আর আটাশ ভাগ পুরুষ।

গ) নারী সমাজের গড় আয়ু হতো উদ্বেগজনকভাবে কম। পঁচাশিভাগই মারা যেতেন ত্রিশের কোঠায়। কেন না চল্লিশোর্ধ নারী বিজ্ঞাপনে আসেন কদাচিৎ।

ঘ) নারীরা সবাই হতেন ফর্সা এবং নৃত্যগীতে পারদর্শী।

ঙ) পুরুষরা হতো বর্ণান্ধ এবং শুধুমাত্র ফর্সা নারী তাদের দৃষ্টিগোচর হতো। অদৃশ্য নারীরা ম্যাজিক সাবান বা ক্রিম ব্যবহার করে সাতদিনের ফর্সা হবার পর পুরুষের চোখে দৃশ্যমান হতেন।

চ) নারী জীবন হতো নির্ভাবনার, অথচ অবসরের নারীর একমাত্র কাজ হতো প্রসাধন, একমাত্র দুশ্চিতা হতো কাপড়ে দাগ।"[৩৮]

হাস্যকর মনে হলেও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নারী সম্পর্কে আমরা এ ধরণের ইমেজ গুলিই বেশি দেখি। (এখানে উল্লেখ্য নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত, সমাজ সেবা মূলক ও সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন গুলি এই আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি)। দেখা যায় যে মিডিয়াগুলো সমাজে নারীর যে অবস্থান, সেরকম চিত্রই তুলে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু মিডিয়ার অন্যতম উপাদান বিজ্ঞাপনে নারীর আরও অধস্তন হেয়, দুর্বল, অবমাননাকর চিত্র তুলে ধরে। মুনফাখোর অবিবেচতক পুঁজি বিনিয়োগকারী ও বিজ্ঞাপনদাতারা নারীকে আকর্ষণীয় রূপে বিজ্ঞাপনের সাথে একীভুত করে নারীর যৌনতাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে তাদের উৎপাদিত পণ্যে বিক্রি বৃদ্ধি করেন। বিজ্ঞাপন মানুষের সামনে সেটুকু চিত্রই তুলেধরে যেটুকু বিক্রয়যোগ্য, বা নারীকে সেভাবেই তুলে ধরা হয় যেভাবে তুলে ধরলে পণ্যে বিক্রি বাড়বে। বার বার বা ক্রমাগত একই বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন সমাজে শিক্ষকের ভুমিকায় অবতীর্ন হয়।

বেশিরভাগ বিজ্ঞাপন দেখলেই মনে হবে সংসার ও সৌন্দর্যচর্চা ছাড়া নারীর আর কোন জগত নাই, মমনশীলতা নারীর জন্য নয়, সৌন্দর্যচর্চা ছাড়া নারী আর কিছুতেই আগ্রহ নেই বা থাকতে পারে না সে পুরুষের তুলনায় নির্বোধ, কথায় কাজে অবিবেচক ও শিশু সুলভ,

[৩৮] গীতিআরা নাসরীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে ক্ষমতাহীন, শুধুই পুরুষের প্রেম প্রয়াসী ও যৌনবস্তু ফলে নারীর অপরূপায়ন বিজ্ঞাপনে একটি আবশ্যকীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

ধরা যাক কর্মক্ষেত্রে নারীর নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যাপার, আমরা জানি গত কয়েক দশকে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা বেড়েছে জ্যামিতিক হারে। শহরে গ্রাম-গঞ্জের অসংখ্য নারী এখন বহির্জগতের কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত। কিন্তু তারা সবাই সুন্দরী ফরসা কিংবা মুক্তঝরা হাসি কিংবা ভ্রমর কালো রেশমী কিংবা ঘন চুলের অধিকারী নয়। তাদের চাকরী প্রাপ্তির পূর্বের ইতিহাস এও বলে না যে ফেয়ার এ্যান্ড লাভলী মেখে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুন্দরী ও ফরসা হওয়ার পরেই তাকে কর্তৃপক্ষ তাদের চাকরী দিয়েছে। যথেষ্ট প্রতিযোগিতার মাধ্য দিয়ে নারী নিজের যোগ্যতার প্রমান দিয়েই তাকে চাকরীতে প্রবেশ করতে হয়। অনেকক্ষেত্রে অনেক পুরুষের চেয়ে ভাল ফলাফল করে নারী তার কর্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আর সুন্দরী ফরসা নারীরা ছাড়াও অনেক অসুন্দর কালো মেয়েরা ও তাদের মেধাশক্তির বলে সমাজের বিভিন্ন অবস্থানে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাদের 'সৌন্দর্যই শক্তি' নয় তাদের শক্তি তাদের মেধা ও মনন। সুতরাং এ ধরণের অপমান জনক কথামালা দিয়ে যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় তা সমাজের বুকে স্রেফ মিথ্যার জাল বিস্তার করে চলে এবং নারীর অপরূপায়ণমূলক ইমেজ তুলে ধরে।

থিয়েটারে দর্শক শ্রোতাকে আকৃষ্ট করার জন্য নারীকে শুধুমাত্র রং ফর্সকারী ক্রিম মাখালেই চলবে এক্ষেত্রে তার অভিনয় দক্ষতা প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হয়। ড্যান্স কম্পিটিশনে ফার্স্ট হতে হলেও তাকে চটজলদি রং ফর্সাকারী ক্রিম মেখে তবেই বিজয় মুকুট ছিনিয়ে আনতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশসহ বিশ্বের অনেক অভিনেত্রী বা নৃত্যশিল্পী আছেন যাদের গায়ের রং ফর্সা কিংবা ভুবন ভুলানো রূপ না থাকলেও দক্ষতা, সম্মান ও পুরস্কারের কোন কমতি নেই। দর্শকদের প্রশংসা কুড়াতে তাদের রং ফর্সাকারী ক্রিম মাখানোর প্রয়োজন হয় না।

আবার অধিকাংশ বিজ্ঞাপনে দেখা যায় নারী এখনও ঘরেই আবদ্ধ। শুধু আবদ্ধই নয়, নারী এখনও- 'খাঁটি রাধুনী' 'পাকা রাধুনী' বা 'আসল রাধুনী' মাত্র। বিজ্ঞাপন যদিও বা কখনও একজন নারীকে কর্মজীবী হিসেবে দেখায়, সেখানেও তার মূল পরিচয় হয় একজন গৃহিনীর কিংবা রাধুনীর। মশলা বাটার পরিবর্তে তাই গুড়া মশলায় রান্না করে বসের আগে অফিসে যেয়ে নারী কতই না আনন্দিত একজন পেশাজীবী নারীর সাথে সাথে তার পুরুষ স্বামীটিরও

যে সংসারের প্রতি কোন দায়িত্ব থাকতে পারে সে ধরণের কোন দৃশ্য বিজ্ঞাপন গুলির মধ্যে থাকে না। যদিও বা কখনও দেখান হয় তবে স্ত্রীর বাপের বাড়ী যাওয়া বা তার অনুপস্থিতিতে কিছু করতে গেলে তাকে গলধঘর্ম কর্ম হয়ে বা ব্যাঙ্গ রসাত্মক ভাবে তা সম্পন্ন করতে হয়। অফিস থেকে ফিরে সবার সুখের জন্য সবার পছন্দের রান্না অল্প সময়ে পরিবেশন করার কৌশল রপ্ত করতে হয় যেখানে সে 'স্বপ্নের সংসার' খুঁজে পাওয়ার সুখে বিভোর আর সেই আনন্দে একটি সুখ-নৃত্য বা সংগীত উপহার দেয়। ডাক্তার হলেও হাসপাতালের ডিউটি কোন রকমে সেরে বাড়ী ফিরে তাকে দেখা যায়, সন্তানের নিম সাবান দিয়ে গোসল নিশ্চিতকরণ, হরলিক্স খাওয়া বা বাড়ির মেঝে ডেটল দিয়ে পরিস্কারের কাজে তিনি ব্যস্ত আছেন, অথবা অফিসে বসে ঘর-সংসারের কথা ভাবছেন। এতে নারী সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারনাটি প্রচার হয় তা হল যে কোন পরিবেশেই নারী গৃহিনী এবং কর্মক্ষেত্রে তাই তার ঘর সংসারের চিন্তা-যা কর্মক্ষেত্র একটি অনুচিত বিষয় হিসেবে বিবেচিত। কর্মক্ষেত্রে স্বীয় কর্ম রেখে গৃহ ভাবনায় লিপ্ত থাকায় মধ্য দিয়ে বুঝা যায় নারী কর্মে আমোনোযোগী। কিন্তু এ প্রচারণা অত্যন্ত অসত্য। নারী স্বীয় কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট নিবেদিত প্রাণ। আরও দেখা যায় অবিবাহিতা হলে তার জীবন কেবল রোমান্টিক সম্পর্ক গড়ে তোলবার জন্য। নারীর জীবনকে দেখানো হয় সাধারণত বিবাহও রোমান্সকেন্দ্রিক ভাবে। কি কি কর্মকান্ড করলে পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, কি করলে বিয়ে হবে, এই যেন নারীর একমাত্র চিন্তা, ধ্যানজ্ঞান ও প্রতিজ্ঞা।

হাতে গোনা কিছু কর্মজীবী নারীকে বিজ্ঞাপনে চিত্রায়িত করা হলেও তাদের এখনও পর্যন্ত তথা কথিত কিছু 'মেয়েলী' পেশায় ও অধঃস্তন ভূমিকায় নিয়োজিত দেখা যায়।

কর্মক্ষেত্রে নারীর যতটুকু অর্জন বা সাফল্য তার অধিকাংশই কোন নির্দিষ্ট পাউডার মাখবার জন্য। এসব বিজ্ঞাপনে নারী মেধাও কর্মক্ষমতাকে হেয় এবং হাস্যকর রূপে উপস্থাপন করা হয়। নারী শুধু সন্তানও স্বামীর ডাক্তার, বাড়ির বস এবং শুধু কাপড় ও টয়লেট পরিস্কারে চ্যাম্পিয়ন, কাপড় কেচে পরিস্কার করার পরেও হাত এত কোমল থাকার কারণে শাশুড়ীর কাছ থেকে সোনার বালা উপহার পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের দৃষ্টিতে পরিবারের নারীর ক্ষমতায়ন হয় শ্বশুরকে চা খাইয়ে খুশি করতে পারার মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞাপনে নারীর গৃহশ্রমকে ও তুচ্ছ করে চিত্রায়িত করা হয়। কাপড় ধোয়ার মতো পরিশ্রম সাধ্য কাজটিও হয়ে ওঠে নৃত্যগীত মুখর যাতে তার ষোল আনা সাজগোজের কোন পরিবর্তন হয় না। কোন এক যাদুকরি শক্তির প্রভাবে তার তুলতুলে নরম হাতে নেইল পলিশ ও মেহেদী সজ্জিত অবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

আংটি চুড়ি সব কিছুঠিক রেখেও মসৃণ ত্বকের নিশ্চয়তা থাকে। বাস্তব জীবনের নারীর মত ঘাম, কালি-ঝুলি- তেল-হলুদে ব্যতিব্যস্ত হন না বিজ্ঞাপনের সুন্দরী নারী, চুলোর আগুন জ্বালাতে তার পাতা, খুঁটে, কাঠ-খড় কোন কিছুই পোড়াতে হয় না, ধোঁয়ামুক্ত নির্মল ঝক ঝকে তাদের রান্না ঘর, পানি ও গ্যাসের অভাব তাদের স্পর্শ করেনা কখনও। বাস্তব জগতের সাথে এসব ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। শত কাজের মাঝেও সৌন্দর্য চর্চাই নারীর প্রধান কাজ বিজ্ঞাপন আমাদের এ ধরনের ধারণা দেয়। পেশাজীবী নারী ছাড়াও যে নারী গৃহে উৎপাদন কিংবা পুনরুৎপাদন মূলক কর্মকান্ডে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন তার ঠোঁটের পেলবতা, ত্বকের রং বা চুলের মসৃনতা নিয়ে ব্যস্ত থাকার অবকাশ কমই থাকে। বিদ্যা, বুদ্ধি, শিক্ষা, কুশলতা, দক্ষতা কোন কিছুই নয়-নারীর জীবনের একমাত্র সম্পদ তার চেহারা, তার অর্জন সুগৃহিনী হতে পারা এবং ত্বক ও চুলের চর্চার মাধ্যমে পুরুষকে আকৃষ্ট করা ও বশীভূত করা, এসব বক্তব্য এবং মতাদর্শই আমরা বিজ্ঞাপন থেকে পাই পৌনঃপুনিকতার মধ্য দিয়ে।

নারীকে ছকে বাঁধা গৃহিনী, সেবিকা, প্রসাধন প্রিয় ইত্যাদি রূপে না দেখালে বিজ্ঞাপনতাদের পণ্য বিক্রি হবে না বলেই হয়তো তারা নারী অপরূপায়ণ ঘটিয়ে থাকেন। ক্ষেতের ফসল ভাল না হওয়ার করণে স্ত্রীর প্রতি তীব্র অসম্মান ও দুর্ব্যবহার আবার কোন বিশেষ পাম্প বা সার ব্যবহারের ফলে ফসল ভাল হওয়ায় স্বামীকে কাছে পাওয়ার আনন্দে স্ত্রীর হাস্যজ্জল লাজুক মুখ প্রদর্শন খুবই আবমাননা কর। নির্দিষ্ট ব্রান্ডের সাবানে কাপড় না কাচায় স্বামীর পদোন্নতি বাঁধা গ্রস্থ হওয়া স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করা; এধরণের বিজ্ঞাপন-নারীকে শুধুই পারিশ্রমিক বিহীন চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমিক বা দাস পর্যায়ভুক্ত করার মন্ত্রনাই সমাজকে দিয়ে থাকে। আবার রান্না মজা না হওয়ায় তরুনী বধুটির প্রতি পরিবারের সাবার মধ্যে 'বাঁধতে ও জানেনা' বলে স্বামীর প্রদত্ত তিরস্কার এবং সে কষ্টে অল্প বয়সী বধুটির কান্না এবং অবশেষে কোন বিশেষ গুড়ো মশলার আশ্রয়ে এ কষ্টের অবসান এটাই প্রমাণ করে দেয় জন্মগতভাবে নারী রাধুনী। এই ঘটনার ব্যত্যয় ঘটলে সে যতই অল্পবয়সী, সদ্য গৃহিনী, ধনীর দুলালী, বিদ্বান কিংবা কর্মজীবী হোন না কেন সেটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ এবং এ জন্য তিরস্কার ও অপমানই তার প্রাপ্য। অবমাননাকরভাবে বিভিন্ন ধরণের ভোগ্য পণ্যের শুধু ব্যবহারকারী নয়, ফেরিওয়ালা হিসেবেও দেখানো হয় যেখানে ফেরিওয়ালা এবং গৃহস্থ উভয় শ্রেণীর নারীকেই অপমানজনক অবস্থানে দেখানো হয়- যেখানে পরিবারের প্রধান পুরুষকে রাজকীয় মর্যাদা দান করা হয়েছে। অনেক সময় পণ্যটির সাথে নারীর সরাসরি সম্পৃক্তি না থাকলেও

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে বিজ্ঞাপনে উপস্থিত রাখা হয় শুধুমাত্র পণ্যটির বিক্রয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। নারী এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ছিপে গাথা টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সম্ভাব্য ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। এসব ক্ষেত্রে নারী বিজ্ঞাপিত পণ্যটির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের পণ্য হয়ে ওঠে।

গণমাধ্যম বিশেষত মার্শাল ম্যাকলুহান বিজ্ঞাপনকে 'নারীকে আলিঙ্গনরত পুরুষের শাস্ত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (Mcluhan, 1964: 226) বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হলো পণ্যের গুণাগুণ বর্ণনার মাধ্যমে পন্যটি সম্পর্কে অভিভেয়ন্সকে আকৃষ্ট করা। বিজ্ঞাপন শাস্ত্রে আছে সফল বিজ্ঞাপন নির্মাণ করতে হলে মানুষের মৌল প্রবৃত্তি ও বাসনাকে নাড়া দিতে হব। অর্থ লাভ, স্বচ্ছলতা অর্জন মানুষের অন্যতম বাসনা এবং যৌনতা মানুষের অন্যতম প্রবৃত্তি। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এসব বাসনা ও প্রবৃত্তিকে নাড়া দেবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়। এ কারণে নারীমুখ ও নারী শরীরকে ব্যবহার করা হয়, পুরুষ অভিয়েন্সকে আকৃষ্ট করার জন্য। যার ফলে বিজ্ঞাপনগুলোতে নারীর অবস্থান হয় সমাজে বিদ্যমান ধ্যান-ধারণার চাইতে আরও বেশি অধস্তন, সে হয়ে দাঁড়ায় যৌনতার প্রতিক।[৩৯]

ইদানিং আবার পুরুষের রং ফর্সাকারী ক্রিমের বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। আবার বিজ্ঞাপনে বিশেষ পেস্টে দাঁত পরিস্কার করার কারণে দলে দলে যুবতী মেয়েরা একটি পুরুষকে চারিদিক থেকে যেভাবে বেষ্টিত করে রাখে তা সমাজের কাছে রীতিমত ভয়াবহরূপে প্রস্ফুটিত হয়। সুন্দর হাসি আর সজীব বিশ্বাসের বরকতে গতকালের অবহেলিত পুরুষ আজ রীতিমত মোস্ট ওয়ানটেড হিরো, হয়ে উঠে নারীদের বেষ্টনে চলাফেরা রীতিমত কষ্ট সাধ্য হয়ে ওঠে। বাস্তবতার ঘোর বিরোধী ও বিজ্ঞাপন তাহলে কি এই বুঝাতে চায় যে ওই বিশেষ টুথপেস্টে দাঁত মাজেন না যারা বা এর আওতার বাইরের পুরুষ সমাজ দুগর্ন্ধ ময় অস্বাস্থ্যকর দাঁত ও মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের সবাই নারী সঙ্গ বঞ্চিত অথবা চিরকুমার। আর গোটা ছাত্রীসমাজ যেন পড়ালেখার চেয়ে পুরুষ শিকারী হিসেবে বিবেচিত। এসব বিজ্ঞাপন সমাজকে অগ্রগামী করার চেয়ে পিছনের দিকে হাটতে উৎসাহিত করছে।

গীতি আরা নাসরীন (২০০৩: ১১-১৩) বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়নের মধ্যে যে নেতিবাচক বিষয়গুলো রয়েছে তা কয়েকটি ভাগে বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত, বিজ্ঞাপন নারী কী এবং নারীর কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কিছু সংকীর্ণ রোল মডেল প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। (আজকের মেয়েদের মডেল কন্যাদের মতোই স্মার্ট,

---

[৩৯] McLuna. Marshall (1964): Understanding Media: Routledge & Keagan Paul, London. p-226.

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক, আকর্ষণীয় সুন্দরী অথচ পুরুষনির্ভর হতে বলে, সবার পক্ষে যা হওয়া একেবারেই অসম্ভব।)

দ্বিতীয়ত: বিজ্ঞাপন আমাদের মধ্যে এক অসম্পূর্ণতার বোধ তৈরি করে। (আমাদের রং যথেষ্ট ফর্সা নয়, আমাদের চুল যথেষ্ট ঘন ও কালো নয়, আমাদের ত্বক যথেষ্ট মসৃন নয় ইত্যাদি।)

তৃতীয়ত : বিক্রয়মুখী বিজ্ঞাপন পশ্চাৎপদ ধারণা ও ক্ষতিকর পণ্যের প্রসার ঘটাতেও পিছপা হয় না। (ত্বক ফর্সকারী ক্রিম ত্বকের জন্য ক্ষতিকর একথা বিশেষজ্ঞরা বার বার বলে চলেছেন।)

চতুর্থত: বিজ্ঞাপনের কাজ হচ্ছে কোনো সমস্যার ইতিবাচক এবং যুক্তিসঙ্গত সমাধান না দিয়ে, পণ্যভিত্তিক সমাধানের কথা বলা। (কর্মজীবী নারীর ঘরের কাজগুলোর ভাগ পুরুষের নেবার দরকার নেই, গুড়ো মশলা বা অন্য কিছু নিয়ে নেবে)

পঞ্চমত: কিছু বিজ্ঞাপন নারীকে নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে দেখানো হয়। (নারী ঈর্ষাকাতর, চিন্তাশক্তিহীন ও বোকা হিসেবে তুলে ধরা।)

ষষ্ঠত: নারীকে নির্যাতন করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন রোমান্টিকতার আবরণ দেবার মাধ্যমে ব্যাপরটি গ্রহণযোগ্য করে তোলে। (কাপড় পরিস্কার না হলে স্ত্রীকে গঞ্জনা দেয়া।)[৪০]

বিজ্ঞাপনের সার্বক্ষণিক প্রচারের ফলে আমাদের মনে ও চেতনায় সর্বক্ষনিক কি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা সর্বদা সজাগ থাকিনা। আমাদের অবচেতনেই মনের উপর অনেক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। যদিও আমরা জানি না কিছু প্রচার হচ্ছে তার মধ্যে সত্য-মিথ্যা দুইয়েই সম্পৃক্তি রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা ভাষণের পরিমান বেশি থাকে যেহেতু যে কোন উপায়ে পণ্য বিক্রিই এর মূল উদ্দেশ্য।

It is frequently suggested that our mental life can be represented by an iceberg. The tip of the iceberg that we see above the water is what we are conscions of. The reminder of the iceberg and by far the greater part of it lies buried beneath the water".[৪১] এদিক থেকে বিচার করলে পন্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্য টুকু সত্য এবং বাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীকে সচেতন বা অসচেতন ভাবে

---

[৪০] গীতি আরা নাসরীন (২০০৩), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

[৪১] Berger, Arthur Asa (1991): Media Analysis Techniques, USA: Sage Publicatins.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার অতিরঞ্জিত, ক্ষেত্র বিশেষে মিথ্যা। আর এর দ্বারা সমাজ প্রভাবিত হয় বলে নারীর প্রতি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়।

গীতি আরা নাসরীনের বিশ্লেষণে বিজ্ঞাপনে নারীর যে রূপায়ন এর কথা বলা হয়েছে এছাড়াও আমরা নারীকে যেভাবে উপস্থাপিত হতে দেখি তা হল ঃ

“প্রায়ই পণ্যের সমার্থক করে বিজ্ঞাপনে নারীকে উপস্থাপন করা হয়। বিজ্ঞাপনের পণ্যের মতো এখানে নারীও পন্য। সিঙ্গেল কোলার বিজ্ঞাপনে মডেল কন্যার উদ্দেশ্যে পুরুষ মডেল বলে ‘তোমায় ছাড়া বলো বাঁচি কেমনে ---- ইউরো লেমন’ আর ‘ডাবল কোলা’ র বিজ্ঞাপনে দেখা যায় ‘ডাবল’ মডেল কন্যাকে এবং এজন্যই পুরুষ মডেলটির ‘প্রাণের লাগে দোলা’।

- বিজ্ঞাপনে নারীকে উদারতার দৃষ্টিতে যথেষ্ট আধুনিকাভাবে উপস্থাপন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে নারী যথেষ্টই সংরক্ষণশীল এবং সিদ্ধান্ত নিতে পুরুষের ওপরে নির্ভরশীল।
- বিজ্ঞাপনে নারীর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী হলেও তার ভূমিকা কিন্তু প্রধান নয়। বিজ্ঞাপনের গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলা না বিশেষজ্ঞের ভূমিকা নেওয়ার বিষয়টি আবার পুরুষ প্রধান।[৪২]

বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে নারীকে অবহেলিত ও অধস্তন পর্যায়ে রাখতে গিয়ে পুরুষ হয়ে ওঠে অত্যাচারী, অবিবেচক, মানবিক ও বিবেবোধ হীন, ভোগবাদী, নারী সঙ্গে আকাঙ্খী এক কথায় মানবিক বোধশুন্য 'চলমান বা জীবন্ত বস্তু' বিশেষ, এর কারণ নারীর, তাদের কাছে যদি নারীর মানবিক মূল্যবোধ, বিদ্যা, বুদ্ধি জ্ঞান, সমৃদ্ধি, দক্ষতা সব কিছুর বদলে তার যৌনতা ও রূপটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় (যে ক্ষেত্রে মানুষের কোন হাত থাকে না) তাহলে পুরুষের বিবেক বোধ, মানবিকতা ও বিচক্ষনতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। নারীকে অবমূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রচার মাধ্যমগুলি যে প্রতিনিয়ত পুরুষের অবমাননা করে চলেছে সে কথা তাদের চোখেই পড়ে না। যেমন-আমার স্ত্রী, আমি তাকে পছন্দ করেছিলাম তার দীঘল কালো চুল দেখে ------------- আর আমার পছন্দ -------------- নারকেল তেল।’ আরেক টি বিজ্ঞাপনে তরুণী বধুটি স্বামীর মন পাওয়ার জন্য নিজেকে সাজাতে সদা ব্যস্ত, কিন্তু পুরুষটির কিছুতেই মন পাওয়া যায় না। যখন হঠাৎ তার দীঘল কালো চুল তার চোখে

[৪২] ফাহমিদুল হক (২০০৬), নারী ও বিজ্ঞাপন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

পড়ল তখন বধুটির প্রতি তার আকর্ষণ হঠাৎ করে অতিমাত্রায় বেড়ে গেল- আর অভিমানী বধুটি অনুযোগের সুরে তাকে হিসাব নিয়ে থাকতে বলল।' ---------------------- তারপর চুলে তেল মাখিয়ে দেয়া- ইত্যাদি ইত্যাদি।' আবার 'পাত্র-পাত্রী' চাই বিজ্ঞাপনের দিকে দেখলে আমরা দেখি পাত্রীর যোগ্যতা হিসেবে ফর্সা, লম্বা, বিনয়ী, শিক্ষিতা, সুদর্শনা, ধাঁমিক, আকর্ষণীয় নামাজী, সংসারী ও গৃহকর্মে পটু ইত্যাদি। আর পাত্রের ক্ষেত্রে চাহিদা প্রতিষ্ঠিত, ব্যবসায়ী, সরকারী চাকরীজীবী, ঢাকায় বাড়ি, গাড়ি, বিত্তবান, উদার-মানসিকতা সম্পন্ন ইত্যাদি। এ বিজ্ঞাপনগুলি বিশ্লেষন করলে-

প্রথমোক্তটি প্রমান করে পুরুষটি নারীর গুণে নয় চুলে মুগ্ধ হয়ে তাকে পছন্দ করেছে। আর এই পছন্দের ব্যাপারটি নারীর ক্ষেত্রে উহ্য (কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ অধিকারকে স্বীকার করা হয় না)। আর নারীটির পছন্দ-- নারিকেলের তেল। এটি পুরুষের জন্য অপমান জনক যে মেয়েটি তার চেয়ে তেলকে প্রাধান্য দেয় কারণ এই তেল বেয়েই পুরুষের প্রেম তার চুলের দিকে প্রবাহিত করে।

দ্বিতীয়টিতে ও দেখি মেয়েটি তার স্বামীল 'মন' পাওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত, আর স্বামীর 'মন' তার চুলের দিকে আবদ্ধ। এখানেও পুরুষের মনের চেয়ে চোখের ক্ষুধাকে বড় করে তোলে, মানবিকতার চেয়ে পুরুষের মোহকে বড় করে ফুটিয়ে তোলে।

আবার তৃতীয় ক্ষেত্রে পাত্রী বাছাই করতে যেয়ে পুরুষেরা নারীর রূপ-যৌবন, অর্থ-বিত্ত, দাস-মনোভাবও বিনয় কে প্রাধান্য দেয় যা নারীকে তার হাতের পুতুলে পরিণত করতে পারে। এক্ষেত্রে পুরুষের অন্তর্নিহিত মানবিক স্বত্তা বলে আসলেই কিছু আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে আছে বা সমাজের অগোচরে প্রতিনিয়ত বেড়ে উঠেছে।

আর পত্র খোজার ক্ষেত্রে যে শর্ত থাকে সেখানে আর যাই হোক পুরুষের রূপকে প্রাধান্য দেয়া হয় না; তার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ গুণাগুণ বিচার করা হয়। তাহলে নারী খোঁজে গুণ, আর পুরুষ খোঁজে রূপ? কোনটি বেশী, মানবিক? কোনটি বেশি বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে? নিশ্চয়ই দ্বিতীয়টি নয়। তাহলে বিজ্ঞাপন দাতাগন সমাজে যে মিথ্যা মতার্দশ প্রচার করে চলেছেন তা কি সংগত? বিজ্ঞাপন দাতাগণ পণ্য বিক্রি করতে যেয়ে নারীকে পন্য করে নিজেদের মানবিকতাকে নিলামে তুলেছেন সে কথা বেমালুম ভুলে যান। তারা নারীকে

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষতান্ত্রিকতার (আদি) চোখে দেখে উন্নয়নকে বিপরীতমুখী করে তুলেছেন। এতে শুধু নারীর অবমূল্যায়ন হয় না গোটা সমাজের উন্নয়ন বাঁধা গ্রস্থ হয়।

৭.৭.১ বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনের নারীর রূপায়ন ঃ গবেষণার আলোকে

সৌরভ সিকদার (২০০৭) 'টিভি বিজ্ঞাপনে নারী প্রতিচিত্র' শীর্ষক গবেষণামূলক রচনায় উল্লেখ করেন জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে নারীর সামাজিক এবং মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করাটা জুরুরি। শুধু সমাজেই নয়, আমাদের শিশুদের মানস জগতে নারী বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। ---------- এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। --------------------------------- তিনটি টিভি চ্যানেলে প্রচারিত ১৩১টি বিজ্ঞাপন বিশ্লেষন করে দেখা গেছে, বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে মাত্র ৪টি বিজ্ঞাপন জেন্ডার সংবেদনশীল (Sensitive) এর শতকরা ৩.০৫ শতাংশ পণ্যের ধরন ও কণ্ঠের প্রাধান্য, ত্রস টেবিল থেকে দেখা গেছে, খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধন, ব্যবহার্য দ্রব্য, রন্ধন সামগ্রী প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীদের প্রাধান্য রয়েছে। বিজ্ঞাপনের আধেয় বিশ্লেষন করে দেখা গড় ব্যাপ্তিকাল অনুসারে নারীদের কণ্ঠের প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু তুলনামূলক গত প্রচারকালে দিক থেকে পুরুষ কণ্ঠের প্রাধান্য পেয়েছে অর্থাৎ বিজ্ঞাপনে নারী কণ্ঠের প্রাধান্য থাকলেও প্রচারের দিক থেকে পুরুষ কণ্ঠেরই আধিপত্য দৃশ্যমান।[৪৩]

মুসতাক আহমেদ (২০০২) 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রাইম-টাইম বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ন- শীর্ষক গবেষণাটি ২০০০ সালে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিটিভির প্রাইম টাইমে প্রচারিত ৪৩২টি বিজ্ঞাপনকে নিয়ে পরিচালনা করেন। গবেষক বিজ্ঞাপনের আধেয়র গুনগত বিশ্লেষণের জন্য বিজ্ঞাপনগুলোতে নারীর রূপায়নসংক্রান্ত কিছু মূলভাব শনাক্ত করেছেন। (সারনি দৃষ্টব্য)

[৪৩] সৌরভ সিকদার 'টিভি বিজ্ঞাপনে নারী প্রতিচিত্র' জেন্ডার ইন মিডিয়া বুলেটিন-৮, আগষ্ট অক্টোবর ২০০৭, পৃঃ ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

সারনি : ৭.২

'বিজ্ঞাপনের শনাক্তকৃত মূলভাব ঃ উৎস (আহমেদ, ২০০২: ১৬৮)[৪৪]			
মুলভাব	বিজ্ঞাপনের সংখ্যা	মূলভাব	বিজ্ঞাপনের সংখ্যা
নারী গৃহকর্মী	১০৯	নারী গৃহিনী/ স্ত্রী	১৪৫
নারী মমতাময়ী মা	৭৬	নারী অনুপ্রেরণদাত্রী	২৯
নারী কর্ম বিযুক্ত/ পেশাহীন	৩৯৭	নারী শারীরিক ও মানসিক ভাবে দুর্বল	২৮
নারী পুরুষ নির্ভর সত্তা	৩৮	নারী জন্য শাসনের ভোগ্য	০৭
নারী সৌন্দর্য সামগ্রী	১৩৬	নারী গৌন কার্যের কর্মী	৫৬
নারী পুরুষের সান্নিধ্যপ্রয়াসী	৫৮	নারী অনুগত	৮০
নারী নির্বোধ	১২	নারী লজ্জাবতী	২৫
নারী যৌনবস্তু	৫৮	নারী পুরুষ ও সংসারসেবী	১০৯
নারী প্রসাধনপ্রিয়	১৩৯	নারী প্ররামর্শ গ্রহণকারী পুরুষ	
নারী কলহপ্রিয়	১৩	পরামর্শদাতা	২৬০

চারটি ঢাকা-দৈনিকে প্রকাশিত বিবাহ-বিজ্ঞাপন নিয়ে একটি গবেষণা করেছেন কাবেরী গায়েন (২০০২) 'পাত্র-পাত্রী চাই' সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবাহ বিজ্ঞাপনের নৈঙ্গিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষন' শীর্ষক গবেষণায় চার পত্রিকার নমুনায়িত মোট ৪৪৬টি বিজ্ঞাপন বিশ্লেষন করতে গিয়ে গবেষক পর্যাবেক্ষনের একক হিসেবে কিছু বিশিষ্টক নির্বাচন করেছেন। বিয়ে যেহেতু একটি বৃহত্তর সামাজিক ঘটনা, তাই বিবাহ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে সমাজ কীভাবে নারীকে দেখে। অন্তত বিয়েকে কেন্দ্র করে নারীর প্রতি সামাজের (মূলতঃ পুরুষের) মনোভাব নগ্নভাবে ধরা পড়ে গেছে। গবেষণায় নির্ণীত বিশিষ্টকগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে সমাজে নারীর আবস্থান।[৪৫]

(সারনি দ্রষ্টব্য)

[৪৪] আহমেদ মুসতাক (২০০২), 'বাংলাদেশের টেলিভিশনের প্রাইম-টাইম বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ন, 'গণমাধ্যম ও জনসমাজ; গীতিআরা নাসরীন ও অন্যান্য সম্পা:; শ্রাবন প্রকাশনী; ঢাকা।

[৪৫] গায়েন, কাবেরী (২০০২) 'পাত্র-পাত্রী চাই' সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবাহ বিজ্ঞাপনের লৈঙ্গিক সমাজতাত্ত্রিক বিশ্লেষণ' গণমাধ্যম ও জনসমাজ; গীতি আরা নাসরীন ও অন্যান্য সম্প: শ্রাবন-প্রকাশনী; ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৭.৩

পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের পাত্রীর বিশিষ্টক। (গায়েন, ২০০২)		
পাত্রী বিশিষ্টক	সংখ্যা	শতকরা হার
ত্বকের রঙ (ফর্সা)	২২০	৪৮. ৩৬
সৌন্দর্য (সুশ্রী, আকর্ষণীয়, মিষ্টি চেহারা, লাবন্যময়ী)	২২২	৪৯.৭৬
উচ্চতা (লম্বা, স্লিম, দীর্ঘাঙ্গী)	১৪৩	৩২.০৬
স্বাস্থ্য (স্বাস্থ্যবতী)	২২২	৪৯.৭৬
শিক্ষা (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এম.এ পাস, অর্নাস পাশ ইত্যাদি)	২১১	৪৭.৩৭
সম্পত্তি (ঢাকার নিজেদের বাড়ি, পিতার পদমর্যাদা	১৯৯	৪৪.৬১
ইমিগ্রেশন	৪০	৮.৯৬
আচরণ (ভদ্র, শান্ত, নম্র, মার্জিত, বিনয়ী, নমনীয়)	৪৪	৯.৮৬
মূল্যবোধ (রক্ষনশীলা, ধার্মিক, নামাজী, পর্দাশলীলা, সাংসারিক)	৭৬	১৭.০৮
অন্যান্য (সঙ্গীতজ্ঞা সংস্কৃতিমনা, সামাজিকমনা, বহুবিধ গুণসম্পন্ন, উন্নত নাসিকা, চটপটে ইত্যাদি)	-	-

দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই এই সবগুলো দৈহিক, বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক গুন একই সঙ্গে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। অথচ গবেষকের ভাষায় গবষেণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে 'পাত্রীপক্ষ পাত্রের ত্বকের রঙ, উচ্চতা, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য তথা দৈহিক সৌন্দর্যের কিছুই জানতে চায় না। জরুরি শুধু চাকুরী" বস্তুত সংবাদপত্রে প্রায় অলক্ষে প্রকাশিত এসব বিজ্ঞাপন যেন সমাজেরই জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি, সমাজে নারীর অবস্থানকে বোঝার সবচেয়ে কার্যকর ক্ষেত্র যা আমাদের সমাজের পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করে প্রকট ভাবে। পুরুষতন্ত্রের ধারক হিসেবে নারীও এর প্রতিনিধিত্ব করে।

তবে কিছু কিছু সমাজ সচতেনতা মূলক বিজ্ঞাপন জেন্ডার সংবদেনশীলতার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এব্যাপারে দৈনিক প্রথম আলোর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যেমন নিজেকে বদলাতে হবে আগে- এই বিজ্ঞাপনটি প্রথম আলো প্রায় প্রতিদিনই ছাপিয়ে জনমনে

Dhaka University Institutional Repository

সচেতনতা সৃষ্টি করছে। এরকম দৃশ্য আগে প্রায়ই দেখা যেত, কিন্তু এই বিজ্ঞাপনটি নিয়মিত ছাপানোর ফলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। বাসে মহিলা যাত্রী এখন দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ না কেউ প্রতিবাদ করে পুরুষ যাত্রীকে নারীর জন্য নির্ধারিত সিট ছাড়তে বলে, আবার অনেকে নিজেই দাঁড়িয়ে বয়স্ক বা গর্ভবর্তী নারীকে বসার স্থান করে দেয়। আবার আমরা একটি সন্তান নিয়েই সুখে আছি' যেখানে বাবা-মাকে একটি মেয়ে শিশুকে নিয়ে সুন্দর জীবন যাপন করার দৃশ্যে দেখা যায়, এটি মেয়ে শিশুর গ্রহণ যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দেয়। আবার এইডস বিরোধী সচেনতামূলক বিজ্ঞাপন, ডেঙ্গু মশার বংশ বিস্তার রোধ কল্পে বাড়ি ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও বাড়ির আশে পাশের জায়গা পরিস্কার রাখা, ইত্যাদি জেন্ডার নিরপেক্ষ বিজ্ঞাপন গুলি সার্বিকভাবে একটি সমাজের উন্নয়ন কল্পে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

৭.৮ বাংলাদেশের চিত্রকলায় নারী ঃ

মানুষের অর্ন্তনিহিত বিমূর্ত ভাবনাগুলোকে রং তুলির ছোঁয়ায় মূর্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলে চিত্রকলা। তাই চিত্রকলার মাধ্যমে একটি সমাজের অর্ন্তনিহিত রূপ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

"বাংলাদেশের চিত্রকলার ইতিহাস বেশী দিনের নয়, ------------। তার উপর চিত্রকলায় ফিগারেটিভ চিত্র চর্চা অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। কারণ পঞ্চাশ দশকের পর থেকে আমাদের শিল্পীরা পাশ্চাত্যের শিল্প আন্দোলন সমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, বির্মূত আধা বিমূর্ত ইত্যাদি শিল্পীরীতি পরীক্ষা নিরীক্ষায় অধিক উৎসাহিত হয়ে পড়েন। ফলে দেখা যায় ফিগারেটিভ চিত্রের যা হয়েছে তা প্রধানত প্রথম পর্যায়ের শিল্পীদের দ্বারা। পরবর্তী শিল্পীরাও বিচ্ছিন্নভাবে যা চর্চা করেছেন তা সংখ্যার দিক থেকে খুবই অল্প। বর্তমানে অপেক্ষাকৃত তরুণ কিছু শিল্পীদের, ফিগারেটিভি কাজের উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।"[৪৬]

বাংলাদেশের শিল্প কলায় ও নারীর রূপায়ণ ঘটেছে কন্যা, জায়া, জননী, রূপসী, প্রেয়সী, প্রেমময়ী, লাবণ্য ময়ী, দুঃখিনী, সজ্জারত, কৃষানী, পরাজিতা, নগ্নিকা, রহস্যময়ী ইত্যাদি পুরুষ তান্ত্রিকতার প্রতিভূ হিসেবে। রংতুলির আঁচড়ে একজন পুরুষ শিল্পী নারীকে ফুটিয়ে তুলেন- এবং ছবির মাঝে শিল্পী মনের অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গিও ফুটে উঠে।

---

[৪৬] দিলারা বেগম জলি, "বাংলাদেশের চিত্রকলায় নারী" গণমাধ্যম ও নারী, নারী সংহতি, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম ও অন্যান্য সম্পাদিত, পৃঃ ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

এদেশের শিল্পকলার ইতিহাস হেযেতু খুব বেশি পুরান নয় এবং ফিগারেটিভ চিত্রের চর্চাও তাই খুব বেশি নয়। তুলনামূলকভাবে এই ফিগারেটিভ চিত্রের চর্চা স্বল্প হলেও এখানে পুরুষ ফিগার অপেক্ষা নারী ফিগারের চর্চা বেশি হয়; যা এ গবেষণার আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে নারী ফিগারের নান্দনিকতা কতটুকু উৎকর্ষতা লাভ করেছে বা করেনি, রংতুলির ব্যবহার কতটুকু সার্থক বা সার্থক নয় এক্ষেত্রে তা আলোচনায় স্থান পাবে না বরং সীমিত থাকবে আমাদের চিত্রকলায় কিভাবে নারী ফিগারের রূপায়ণ নারীর সামাজিক জীবনের বাস্তব অবস্থা ও অবস্থান, জীবনের গভীরতর সত্যের সাথে তার সঙ্গতি ও সম্পর্ক কি ইত্যাদি সম্পর্কে। সামাজিক ভাবে নারীর প্রতি প্রচলিত গৎবাঁধা ধারা মূল্যায়ন ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শের প্রতিচ্ছবি আমাদের চিত্রকলায় নারী-দেহ চর্চার মূল ভিত্তি। ব্যক্তি, বিষয় ও আংগিকের কারণে রূপভেদে আপাততঃ কিছু পরিবর্তন ও বৈচিত্র এসেছে মাত্র। নারী জীবনের বিভিন্ন চড়াই উৎরাই, সংকট-সম্ভাবনা, উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে আমাদের চিত্র কলার বাস্তব সম্পর্ক প্রশ্ন সাপেক্ষ। প্রথমে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এ আলোচনার জন্য যে পরিমাণ চিত্র নিদর্শন দেখা প্রয়োজন তা সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সংগ্রহ, বিভিন্ন প্রদর্শনী ঘুরে দেখার (এক্ষেত্রে জাতীয় ভাবে সংরক্ষণের সুব্যবস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়) ফলে বিচ্ছিন্নভাবে সামান্য ছবি প্রত্যক্ষ করা এবং বিভিন্ন রিপ্রোডাকশনের উপর নির্ভর করে আমাকে এ প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করতে হয়েছে। এটি একটি জটিল মাধ্যম এবং সাহিত্য, নাটক কিংবা চলচ্চিত্রের নারীর সাথে কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকায় গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে সে কথা স্বীকার করেই আলোচনার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। চিত্র শিল্পের মাধ্যম যেহেতু রংতুলি, রেখা এবং ফর্ম তাই এই উপাদানগুলো কখন কিভাবে অবস্থান করলে তার মধ্য দিয়ে এর মূল অর্থটি কি দাঁড়াবে, তা আবিস্কার করা অত্যন্ত জটিল- যা কোন চিত্রশিল্পী, বোদ্ধা ও চিত্র সমালোচকের পক্ষেই কেবল সম্ভব। সে ক্ষেত্রে এখানে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবু আলোচনার এ প্রয়াসের মূলে রয়েছে চিত্রকলা যেহেতু গণমাধ্যমের একটি বিশেষ শাখা এবং নারী জীবনের বহুমাত্রিক দিক এর মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে বিভিন্ন রঙে ও রূপে। তাই এ অনুসন্ধান।

সভ্যতার অগ্রগতির বর্তমান পর্যায়ে পুরুষ ও নারীর যে রূপ দেখি তা রূপায়িত হয়েছে সমাজ বিবর্তনের হাত ধরে। আর পুরুষের প্রয়োজনের অনুসঙ্গ হিসেবে নারীর বিবর্তন হয়েছে। তাই পুরুষের দৃষ্টিতে বিভিন্ন সময় নারীর বিভিন্ন রূপায়ণ ঘটেছে। কখনো সে সখি, কখনো রূপবতী, কখনো গৃহিনী, কখনো যৌনবস্ত, কখনো আকর্ষণীয়া, কখনো মঙ্গলকামী, কখনো

Dhaka University Institutional Repository

অমঙ্গলের মূলে, কখনো স্নেহময়ী, কখনো করুনাময়ী ইত্যাদি পুরুষের চোখে সে যখন যেভাবে ধরা দিয়েছে সেভাবেই রূপায়িত হয়েছে। তবে এর সবগুলিই বিভিন্ন সময়ে নারীর খন্ডিত রূপ।

সৌন্দর্যবোধ শিল্প কলার এক অনিবার্য সত্য। আর বিশ্ব চিত্রকলায় ন্যূড (Nude) নামে বিরাট যে অধ্যায়ে নারীর রূপ ও লাবন্যের চর্চা রয়েছে, নারী সেখানে নিরেট সৌন্দর্যের প্রতীক। কিন্তু নারীর সৌন্দর্য যখন ইঞ্চি পরিমাপের দ্বারা নির্ধাতির, তখন প্রশ্ন সাপেক্ষ। যেমন মসৃন গ্রীবা, উন্নত বক্ষ, সরু কোমর, স্ফীত নিতম্ব, পটল চেরা আখি, দীঘল কালো চুল ইত্যাদি। তবে নারীর এ ধরণের সৌন্দর্যসাধনা বা চর্চা কিংবা নারীর নগ্ন সৌন্দর্যের চর্চা আমাদের দেশে বিছিন্ন ভাবে হলেও একে সামান্য বলতে হবে। তবে একথাও সত্য আমাদের দেশের চিত্র কলায় নারী দেহ যেভাবে রূপায়িত হয়ে তাও সেই একই আদর্শিক সৌন্দর্যবোধ বোধ থেকে বিচ্ছুরিত যা পুরুষ মানসের কাঙ্খিত রূপায়ন। তবে এ ধরণের সৌন্দর্য চর্চায় আপত্তির দিকটি হল, এ ধরণের চর্চায় নারীর মানুষরূপী স্বত্ত্বাটিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুপ্ত করা হয়। এ ধরণের রূপায়ণ নারীর অধস্তনতা, আত্মসমর্পন, পরনির্ভরতা ও প্রয়োজনের যোগানদাতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

আমাদের দেশের চিত্র কলায় নারীর যে বিভিন্ন খন্ডিত রূপের চিত্রায়ন হয়েছে এগুলোর মধ্যে কলসী কাঁখে নারী, মাও ছেলে, প্রসাধনরতা, স্নানরতা, কেশ বিন্যাসে ব্যস্ত, মালা গাঁথা, ধান ঝারা ও ভানা, প্রতীক্ষমান, ক্রন্দনরতা, লাবন্যময়ী, নৃত্যরতা, ভাবনায় নিমগ্ন, হতাশা গ্রস্থ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। একে একজন পরিব্রাজকের একটি নির্দিষ্ট সময়ের দৃশ্যগত অভিজ্ঞতা বললেও ভুল হবে না। এসব চিত্রের মধ্যদিয়ে নারীর যে আচরণ ও অবস্থান প্রস্ফুটিত হয়েছে তাতে আমরা বিমোহিত হয়েছি, অবাক হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি কিংবা আকৃষ্ট হয়েছি কিন্তু খুব কদাচিৎই নারীর বাস্তব জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছি। এ জিজ্ঞাসার কারণ হলো শুধু বিস্ময়, সৌন্দর্য আর মুগ্ধতার মধ্যে একটি মানব জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখলে সেটি হবে প্রত্যাশার ভুল বা ব্যর্থতা।

এ পর্যায়ে চিত্রকলার ব্যক্তিপর্যায়ে নারীদেহ কিভাবে নির্মিত হয়েছে তার কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। বাংলাদেশে চিত্রকলা আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই জয়নুল আবেদীন ও কামরুল হাসানের নাম চলে আসে সংগত কারণেই। তাঁদের দু'জনের চিত্রকলায়ই নারীর উপস্থিতি প্রধান হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি পরবর্তী শিল্পীদের মধ্যে মর্তুজা

Dhaka University Institutional Repository

বশীর চৌধুরী সহ আরো কয়েকজন চিত্রশিল্পীর নারী ভাবনা ও চিত্রায়ন সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা রয়েছে।

বাংলাদেশের চিত্রকলায় প্রবাদ পুরুষ, প্রধান পুরুষ বা প্রবক্তা হচ্ছেন জয়নুল আবেদীন, যিনি কোলকাতা আর্ট স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন। বৃটিশ পদ্ধতির নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসলেও পশ্চিমাভাবধারা দ্বারা তিনি নিজেকে আবিষ্ট রাখনেনি। তিনি এদেশীয় সামাজিক বাস্তবত বাস্তবতাকে ভুলে বসেনি। তিনি যেমন গ্রামীণ সরল সাধারণ জীবন যাপনের নারীকে তার ছবিতে তুলে এনেছেন, তুলে এনেছেন শহরের রাস্তায় নিরন্ন ছিন্নবস্ত্র মায়ের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামের শেষ সাথী ভিক্ষার থালা ঠিক তেমনি দিয়েছেন মর্মান্তিক রূঢ় সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের ভিড়ে বিপন্ন নারীর সংগ্রামী রূপ। জয়নুলের ছবিতে শিল্পের নান্দনিকতার সাথে সাথে বাস্তবতার এক অপূর্ব যোগসূত্র আমরা লক্ষ্য করি তাঁর নারী চিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে। কখনো কখনো তিনি প্রথা সিদ্ধ বিষয়ে ছবি এঁকেছেন, যেমন- মা ও ছেলে, স্নানরতা রমনী, প্রসাধনতা রমনী ইত্যাদি। তবে তাঁর এই ছবি গুলি প্রথা সিদ্ধ হলেও এর মধ্য থেকে জটিল বাস্তবতার কঠোর রূপটি বের হয়ে এসেছে অতি সহজ ভঙ্গিতে। তাঁর তুলি কল্পনা বিলাসী সৌন্দর্য লালসায় নিয়োজিত ছিল না। তাইতো নারীর লাবন্যের চেয়ে তাঁর জীবনের স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি তাঁর চিত্রে ফুটে উঠেছে। যেমন স্নান রতা নারীর ছবি আঁকতে যেয়ে তিনি একক দৈহিক সৌন্দর্যকে প্রাধান্য না দিয়ে, দলগত দৃশ্য বাস্তবতাকেই প্রস্ফুটন ঘটিয়েছেন। আবার প্রসাধনরত নারীর ছবি আঁকতে যেয়ে দুই রমনীকে সরল জ্যামিতিক আকারে ফুটিয়ে তুলেছেন যারা একে অন্যের কেশ বিন্যাস করে দিচ্ছে যেটি গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ দৃশ্য। তিনি নারীর মুখ আঁকতে যেয়ে 'প্যাইন্যার মা'-এ স্বাভাবিকের চেয়ে নারীর যে লম্বা গ্রীবা অংকন করেছেন তা একজন সংগ্রামী নারীর প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, নিস্পোষনের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধিত্ব করে। একটি সমাজের যে কোন দু:সময় ও দুর্দশা দুরবস্থা যে নারীকে বেশী আক্রান্ত করে জয়নুলের দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত মা ও ছেলের ছবিটি তার একটি মহামূল্যবান দলিল। এখানে চিরাচরিত মাতৃত্ববোধের বিষয়টিকে জয়নুল নিয়ে গেছেন নির্মম বাস্তবতায় যার সাথে গভীর মাতৃত্ববোধের সমন্বয় ঘটেছে। যে ছবিতে তিনি কোন রং ব্যবহার করেননি। যেখানে জীবনের সব রং হারিয়ে গেছে সে ছবিতো পান্ডুর কাগুজে বর্ণের ওপর কালো কালিতেই বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে। যেখানে মায়ের শীর্ণ দেহে না আছে লাবন্য না আছে অনুভূতি। রুগ্ন, ক্ষুধার্ত শিশুটি তার আজন্মচেনা মাকে খুঁজছে বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে। আবার মায়ের এক কোলে রুগ্ন শিশু, আর এক হাতে আরেকটি শিশু, দুটি শিশুর মধ্যমনি মাকে তারা আকড়ে ধরেছে পরম নির্ভরতায়, যেখানে মায়ের যাত্রা সম্মুখদিকে হতাশাগ্রস্থ মা জানেননা তার গন্তব্য কোথায় অজানা আশঙ্কা বুকে চেপে উদ্বিগ্ন মাতা সম্মুখ পানে ছুটে চলেছেন। এ যেন আমাদের দারিদ্র ক্লিষ্ট অসংখ্য মায়ের অজানা ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী এক প্রতীকী ছবি, যেখানে জীবনের নির্মম বাস্তবতা ফুটে উঠেছে তুলির আঁচড়ে। এখানেও তিনি কোন রং-এর ব্যবহার করেননি ঠিক ঐ মাও শিশুদের জীবনের মত।

জয়নুলের ছবিতে আমরা দেখি নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। ফলে তাঁর ছবিতে নারী কখনোই কেবল যৌনতার প্রকাশ কিংবা নিরেট সৌন্দর্যের বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়নি। বরঞ্চ তাদের জীবনের সরল স্বাভাবিক বাস্তবায়তা রূপ, বয়স, দারিদ্র এবং যন্ত্রণার সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন- অপেক্ষারত রমনী, পল্লীবধু, যেখানে সৌন্দর্য, রূপ, লজ্জা, আশংকা সমভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আরও রয়েছে সংকল্পবদ্ধ কৃষানী, সংখ্যালঘু উপজাতি, বেদেনী, চাকমা, সাঁওতাল রমনী। জয়নুল অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর ছবিতে নারীর অবস্থান তুলে ধরেছেন পুরুষতান্ত্রিকতার চোখে নয় মানবিক দৃষ্টি কোন থেকে। তাই তাঁর ছবি জেন্ডার সংবেদনবিহীন নয়-যেখানে সততা ও শ্রদ্ধাবোধের কোন কমতি ছিল না। স্বতঃ স্ফুর্ততাই তাঁর ছবি নির্মাণের অন্যতম উপকরণ। তাঁর ছবিতে বার বার মানুষই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং প্রকৃতি কেবল হয়েছে তার অনুসঙ্গ। আর জয়নুলের নারীরা আদর্শিক এবং পুরুষতান্ত্রিকতার আরোপিত সৌন্দর্য প্রতিমাকে ছাড়িয়ে প্রাত্যাহিক বাস্তব জীবনের রূপ নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

আবার আরেক প্রখ্যাত চিত্র শিল্পী কামরুল হাসান, যিনি জয়নুলের সমসমায়িক এবং কোলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনিই একমাত্র শিল্পী যাঁর ছবির প্রধান বিষয় হলো নারী, এবং নারীদেহ নিয়ে যত ছবি তিনি এঁকেছেন সে তুলনার তার বৈচিত্র ততটা বিকশিত হয়নি। আংশিক ও কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে খানিকটা বৈচিত্র ঘটলেও বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত ভাবধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন। যেমন- কলসী কাঁখে, প্রসাধনরতা, জননী, তিনকন্যা, জলকে চলে, ইত্যাদি। এর সাথে বাড়তি সংযোজন হচ্ছে নগ্নিকা।

জয়নুলের নারীর সঙ্গে কামরুলের নারীর তফাৎ হলো এই যে- যেখানে জয়নুলের নারী বাস্ত বতার প্রতিভূ - সেখানে কামরুলের নারীরা কল্পলোকের বাসিন্দা, স্বপ্নচারিনী। তাই কামরুলের নারীরা বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে হয়ে উঠে রূপসী, লাবণ্যময়ী, সুঠামদৈহিক

Dhaka University Institutional Repository

গড়নই যাদের একমাত্র সম্বল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা পরিচ্ছন্ন পরিপাটি পরিবেশে গড়ে উঠেছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দে আন্দোলিত, বাস্তবতার কঠিন ছোঁয়া তাদের লাবণ্যের ঘাটতি এনে দেয়নি। দু:খ বেদনা কিংবা আশংকার লেশমাত্র তাঁর নারীদের স্পর্শ্ব করে না। রূপ, লাবন্য ও দেহই যেন তার নারীদের অস্তিত্ব ও স্বত্ত্বা। তাদের চোখে বাড়িত কোন অভিব্যক্তি নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার নারীরা একটি নির্দিষ্ট চরিত্রে পরিস্ফুট। যেমন- 'তিন কন্যা' ছবির নারীদের হাত থেকে কলসী সরিয়ে নিয়ে হয়তো ছবির নান্দিনকতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে-তবে বিষয়গত দিকে কোন ক্ষতি হবে না। তারা সবাই যেন কলসী কাঁখে মডেলের ভংগীতে দাঁড়িয়ে আছে কলসী সমূহ এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি এবং অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এদের উদ্দেশ্য অন্যত্র। তদ্রুপ প্রসাধনরতা, জলকে চল ইত্যাদি ছবি গুলি। কামরুল হাসান নিজে তিন রমনীকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে এদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে পারিবারিক সম্পর্ক ঃ কন্যা, জায়া, জননী। তবে তাঁর ছবিতে উপস্থিত নারীদের সম্পর্ক নির্ণয় করা খুবই কঠিন এই কারণে যে রূপ, লাবন্য ও অভিব্যক্তিতে তারা একই চরিত্রের।

কামরুলের আর একটি বিষয় হচ্ছে নগ্নিকা; যেখান নারীর প্রতি তার দৃষ্টি ভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে নারী দেহের চর্চাই তাকে উজ্জীবিত করেছে। তার নারী চর্চায় নারীর সামাজিক ও মানবিক অন্যান্য স্বত্ত্বার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে কেবলই রূপ লাবন্যের উচ্ছলতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চাশের দশকের শিল্পীদের মধ্যে মুর্তজা বশীরের নাম উল্লেখযোগ্য- যাঁর ক্যানভাসে নারী উঠে এসেছে জীবনের বিভিন্ন অবস্থান থেকে। কখনো পারিবারিক জীবনের অংশ হিসেবে, কখনো এককভাবে, একেবারে সাদামাটা সামাজিক অবস্থান থেকে, তেমনি নারী দেহ ও লাবন্যকে তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর চিত্রে।

শিল্পীর নিজস্ব মত থেকে নারীর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি কি তা দেখা যাক। বিচিত্রা সাক্ষাৎকার থেকে "চিত্রে ভ্যারিয়েশন বা বৈচিত্রতা আনার জন্য নারীকে বার বার এঁকেছি। অবচেতন মনে সব সময় জৈবিক আকাঙ্খা কাজ করে, মেয়েদের সৌন্দর্য যে আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলে এটি এক ধরণের জৈবিক তৃপ্তি" তিনি আরো বলেন "মেয়েদের ফর্মের চেয়ে তাদের রমনীয়তা আমাকে বেশী অনুপ্রাণিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রচলিত যে ধারণা রয়েছে সেক্ষেত্রে মর্তুজা বশীরের মতামত ভিন্ন, তিনি বলেন- বত্তিচেল্লীর ভিনাসের চেয়ে মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিড কোন অংশে কম সুন্দর নয়। আসলে শিল্পীদের কাছে নারীর আকর্ষণ জৈবিক কারণে, দৃষ্টিভঙ্গি ফর্ম এসব বাজে কথা।"

শিল্পীর নিজস্ব মতামত থেকে নারী সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে। নারী সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক মতাদর্শের বাইরে তিনি নিজেকে আনতে পারেননি। অর্থাৎ তিনি পুরোদস্তুর একজন পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিভু।

মর্তুজা বশীরের সমসাময়িক শিল্পী রশিদ চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, মোঃ কিবরীয়া, বাসেত প্রমূখের কাজে বিভিন্ন সময়ে নারীর উপস্থিতি ঘটেছে বিচ্ছিন্নভাবে। আবার শিল্পী সুলতানের ছবিতে সুঠাম কর্মী নারীর রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে নারী শিল্পীদের সংখ্যা পুরুষ শিল্পীদের চেয়ে অনেক কম। স্বাধীনতার আগে ভাস্কর নভেরা আহম্মেদ (যিনি দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করছেন) এর নাম উল্লেখ যোগ্য। পরবর্তীতে শামীম শিকদার সহ নারী শিল্পীর সংখ্যা বর্তমানে অনেক বেড়ে চলেছে। ইতোমধ্যে যারা সুধিমহলে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হচ্ছেন ফরিদা জামান তবে তার বিষয় বস্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তাঁর বিষয় হল মাছ এবং জাল। তার বিষয় কাজের সাথে নারীর সম্পৃক্তি কম হলেও এ ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। একই ধরণের আরো কয়েকজন শিল্পী হলেন নুরুন্নাহার পাপা, জাকিয়া জলিল লাভলি, নাইমা প্রমুখ এছাড়া ও রয়েছেন সমসাময়িক কালের কনক চাকমা, রঙের খেলা যার ছবিতে বেশী প্রাধান্য পায়। শিল্পী হিসেবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা না পেলেও রওশন আরা দীপা বিশেষ ভাবে নারীকে নিয়ে কাজ করেছেন। মূলতঃ নাগরিক নারীর মনোজগৎ, যেখানে কখনো একজন নারীকে ঘিরে বেশ কয়েকজন পুরুষ, কখনো নারী তার অস্তিত্বের সন্ধান করছে এককভাবে, আবার কখনো কয়েকজন নারী যৌথভাবে তাদের নিঃসঙ্গতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত তরুণ ও শিক্ষানবিশ শিল্পীদের কাজে নারী দেহ বেশ লক্ষ্যনীয়। "তবে এদের বিষয়বস্তু নগরকেন্দ্রিক। নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতাই তাদের কাজে স্থান পেয়েছে, কিংবা নিপীড়িত বা প্রতারিত হচ্ছে। বিষয়ের মধ্যে দেখা যায় বিজ্ঞাপনের নারী, ক্যালেন্ডারে নারী, বর্তমান নারী অবস্থান ইত্যাদি ছাড়াও ধর্মীয় কুসংস্কারের অবস্থানটিই অনেক ক্ষেত্রে স্থান পেয়েছে। হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই তাদের চিন্তায় ও কাজে

Dhaka University Institutional Repository

পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি। তথাপি তাদের সচেতনতা বা উপলব্ধি আমাদের মধ্যে আশা সঞ্চার করে।"[৪৭]

চিত্র কলায় যখন ভরদুপুরে ছেঁড়া ছাতার নিচে ইটভাঙ্গায় ব্যস্ত ছিন্নবস্ত্র নারীকে দেখা যায়- সন্তানকে স্তন্যপান করানোর মত অতিরিক্ত সময় যার নাই, শিশুর ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটানোর জন্য একদিকে সন্তানকে বিশেষ ভঙ্গিতে বক্ষলগ্ন রেখে স্তন্যপান করাচেছন আবার শীর্ন হাতে ইট পাথর ভাঙ্গার মত কঠিন কাজও করে যাচ্ছেন- সাথে রয়েছে একটি জগ, গ্লাস ও শিশুর জন্য থালা। এক্ষেত্রে দারিদ্রের বিরুদ্ধে নারীর তীব্র লড়াই, সুকঠিন জীবন যাপন প্রনালী, একই অঙ্গে নারীর স্নেহময়ী, কল্যানময়ী ও লড়াকু রূপ প্রতিফলিত হয়। এ ধরণের চিত্র সমাজের প্রতি ভ্রুকুটি, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণ, নারীর দায়িত্ববোধ সর্বোপরি সামাজিক অব্যবস্থাকে আমাদের চোখের সমানে তুলে ধরে। চিত্রকলার এ ধরণের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার মাধ্যমে সমাজকে সচেতন করা সম্ভব, যেখানে নারীর লাবন্য, দেহ ও রূপই শুধু প্রাধান্য পায় না। উন্নয়নের পথের পথিক হতে হলে প্রথমেই নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করতে হবে সামাজের সর্বস্তর থেকে। এ ক্ষেত্রে একজন নারী শিল্পীই পারে নারীর প্রকৃত রূপ, অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরতে। একজন নারীকে বুঝতে হলে আর একজন নারীর পক্ষে তা যত সহজে সম্ভব, একজন পুরুষ শিল্পীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাইতো চিত্রকলায় নারীর ছবিতে একজন পুরুষ তার প্রচলিত ও অন্তর্নির্হিত বাসনার সমন্বয় ঘটিয়ে রং তুলিতে যৌনতার ছোঁয়া বুলিয়ে দেন। আর শিল্পকলা বা চিত্রকলায় নারীর যথার্থ স্বরূপটি নির্ভর করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। তাই এক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা আনতে হলে সমাজের বুকে নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করতে হবে। নারী যদি এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের গুণাবলী অর্জন করতে পারে, প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করে স্বীয় স্থানটি পাকা পোক্ত করতে পারে তবেই চিত্রকলা সহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর সঠিক অবস্থানটি ন্যায় সঙ্গত ভাবে উপস্থাপিত হবে। এজন্য উন্নয়নের বন্ধুর পথে নারীকে আরও বহুদূর হাঁটতে হবে।

---

[৪৭] দিলারা বেগম জলি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

৮.১ গবেষণালব্ধ ফলাফল
৮.২ সুপারিশমালা
উপসংহার
পরিশিষ্ট
তথ্যপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

ইতোপূর্বে আলোচিত সাতটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রয়াস ছিল। আলোচ্য অধ্যায়টি মূলতঃ গবেষণার পরিসমাপ্তিমূলক অংশ। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। এক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিশেষ করে গণমাধ্যমের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে যে মতামত পাওয়া গিয়েছে এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বই-পুস্তক, লেখনী, জার্নাল, গবেষণা পত্র ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্বীয় অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধনের এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ছিল এ কার্জটি। নির্দিষ্ট অধ্যায় ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা গবেষণা কর্মটি সমাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। গবেষণা লব্ধ ফলাফলের একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হল।

৮.১ গবেষণা লব্ধ ফলাফল ঃ

- সুসম ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত যৌক্তিক।
- সৃষ্টির প্রথম থেকেই সভ্যতার অগ্রযাত্রায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অবদান থাকলেও পুরুষ- তান্ত্রিকতার প্রভাবে তা বিভিন্নভাবে অস্বীকার কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।
- উন্নয়নে নারী পুরুষের সমান অংশীদারীত্ব থাকলেও নারীর অবদানকে খাটো করে দেখানোর প্রবণতা এবং পুরুষের অবদানকে মহীয়ান রূপে প্রকাশ করার এক নেতিবাচক প্রবণতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে বর্তমান।
- নারীর কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ইত্যাদির বদলে তার কমনীয়, মোহনীয় রূপ ও পুরুষ তোষন ক্ষমতাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।
- নারী পেশাজীবীদের ঘরের বাইরের কাজে নিরাপত্তার অভাব ও অনুকূল পরিবেশের অভাব রয়েছে।
- উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রম বাজারে নারীর অবদান পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী হওয়া সত্যেও তার আর্থিক মূল্যায়ন হয় না এবং নারীকে মজুরী বৈষম্যের স্বীকার হতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- পরিবারে, সমাজে, কার্যক্ষেত্রে সর্বত্র নারী বৈষম্যের স্বীকার ।
- পুঁজিবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল-মৌলবাদীদের (স্বার্থরক্ষার) মূল 'টার্গেট' হল নারী ।
- উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী অবদান রাখা সত্ত্বেও ভূমি কিংবা সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে নারীকে প্রান্তবর্তী করে রাখা হয়েছে এবং পৃথিবীর মোট সম্পদের মাত্র ১% এর মালিক তারা ।
- পিতৃতান্ত্রিক সমাজিক মতাদর্শ বা মূল্যবোধ নারীকে পুরুষের অধীনস্ত হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত বলে নারীর শ্রেষ্ঠত্বকে নেতিবাচকভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী ।
- গণমাধ্যম গুলি নারীর গৎবাঁধা ইমেজ তুলে ধরতে বেশী আগ্রহী । সাংবাদিক ও গণমাধ্যম নীতিনির্ধারকদের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টি ভঙ্গির অভাব পরিলক্ষিত হয় ।
- গণমাধ্যম গুলিতে পুরুষের একচেটিয়া মালিকানা এবং সর্বব্যাপী কর্পোরেট বা ব্যবসায়িক স্বার্থ গণমাধ্যমের বিষয় বস্তু (Media Content) এবং নীতিমালাকে প্রভাবিত করে ।
- ধনতন্ত্রের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন দেশীয় সংস্কৃতিকে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ করে। নারীর অবমূল্যায়ন ঘটায় এবং নারীকে পুঁজি করে পণ্যে রূপান্তর ঘটায় ।
- আকাশ পথে উড়ে আসা স্যাটেলাইট সংস্কৃতি নারীর অগ্রযাত্রাকে চিহ্নিত করার সাথে সাথে ভিন্ন আঙ্গিকে তার অবমূল্যায়ন ঘটাচ্ছে এবং মানুষের মনোজগতে ভোগবাদের বিস্তারের মাধ্যমে বাজার দখলের পথ সুগম করে, নারী হয় যার 'টার্গেট' ।
- গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়ায় নারীর অভিগম্যতা (Access) এবং বিকশিত হওয়ার সুযোগের অভাব রয়েছে ।
- বর্তমানে অবশ্য গণমাধ্যমে নারীর অংশ গ্রহণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এখন ও সম্পূর্ণ রূপে জেন্ডার সংবেদনশীলতা আসেনি ।
- সকল স্তরে নারী পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণতন্ত্র এবং এক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া সমাজে এখনও প্রকটভাবে সক্রিয় ।
- বর্তমানে নারী যথেষ্ট উন্নত অবস্থানে উঠে এসেছে এবং নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকাই সর্বাগ্রে ।

Dhaka University Institutional Repository

- বর্তমান সময়ে নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে গণমাধ্যম বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
- গণমাধ্যম আজকাল জেন্ডার সংবেদনশীলও নারী বান্ধব প্রচার প্রচারণা শুরু করেছে যা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যা আমাদের নারী পুরুষ সমতায়িত একটি উন্নত ও আলোকিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রদান করে।

৮.২. সুপারিশ মালাঃ

- জাতিসংঘের সুপারিশ অনুযায়ীঃ যোগ্যতা, জ্ঞান এবং আগ্রহ অনুসারে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতিনির্ধারনী যে কোন কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের সমান সুযোগ দেয়া। তাদেরকে পুরুষের সমান বেতন ও প্রশিক্ষন প্রদান এবং পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি করা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন নারী ইস্যুতে সংবাদ পরিবেশনার হার আরো বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে নারী বিষয়ক ইস্যুর উপর সংবাদ পরিবেশিত হয় মোট সংবাদের মাত্র ১০%। গণমাধ্যমে নারীর কর্মকান্ড এবং উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ পরিবেশনার জন্য এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি রূপায়ণের জন্য এটি অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে।
- নারীর শারীরিক সৌন্দর্যকে বাণিজ্য এবং ব্যবসায়িক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে অবমাননাকর এবং অশোভন ভাবে ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে।
- গণমাধ্যমকে জেন্ডার সংবেদনশীল ভাষা ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে। যেমন-'ফায়ার ম্যান', 'মেইলম্যান,' 'বিজনেসম্যান' ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে ফায়ারফাইটার, লেটার কেরিয়ার বিজনেস এক্সিকিউটিভ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা যায়।

এ ছাড়া গণমাধনের প্রচার-প্রচারনায় নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সব ক্ষেত্র বিশেষ দিক নির্দেশনা থাকা উচিত সেগুলো হলো ঃ

- আমাদের সংবিধান, সিডও সনদ ও বেইজিং পি এফ এর আলোকে বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংশোধন প্রয়োজন এবং এ সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা;

Dhaka University Institutional Repository

- জেন্ডার সমতার ধারণাটিকে রাজনৈতিক দল সমূহের কর্মসূচীতে বিবেচনা ও যুক্ত করার আবশ্যকতা তুলে ধরা;
- জাতীয় সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৩৩% করা এবং পর্যায়ক্রমে তা ৫০% এ রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও এ ব্যাপারে প্রচারণা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করা;
- বেইজিং পি এফ এ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি মেশিনারীকে আরও আন্তরিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- চাকুরিতে নারী কোটা বৃদ্ধি ও মজুরী বৈষম্য হ্রাসের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দান;
- সামাজিক সচেতনায়নে, জেন্ডার সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রমে পুরুষদের আরো বেশি জড়িত করা ।
- নারী সংগঠনগুলোর সাথে বিশেষ সংযোগ স্থাপনসহ সরকার ও সুশীল সমাজের মধ্যে সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রচারণ;
- নারী বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা;
- ভূমি সংস্কার বা পুনঃবন্দোবস্ত কর্মসূচির অধীনে সরকারি জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে নারী প্রধান পরিবার বা পরিবারে অর্থনৈতিক ভাবে সক্রিয় সদস্য হিসাবে জমিতে নারীর পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করণ সংক্রান্ত প্রচারন;
- নারীদের দারিদ্র বিমোচনে আরো বেশি সংখ্যক আন্তঃখাত কর্মসূচি গ্রহণ;
- পাঠ্য পুস্তকে জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয় সমূহ ব্যাপক ভাবে সংযোজণ;
- বেকার নারীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সমূহ তুলে ধরা;
- কার্যক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্যের সার্বিক দিক-গুলো চিহ্নিত করা;
- পারিবারিক পর্যায়ে নারী যে সব বাঁধা বা বৈষম্যের স্বীকার হয় সেগুলিকে চিহ্নিত করণ;
- যোগাযোগ বা গণসংযোগের ক্ষেত্রে নারীরা যে সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় সে গুলো উপস্থাপন;
- স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নারী যে সব বৈষম্য ও জটিলতার সম্মুখীন হয় তার অনুপুঙ্খ উপস্থাপন ও সামাজিক সচেতনায়ন;

Dhaka University Institutional Repository

- নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও আইনগত ব্যাপক পরিসরে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে প্রচার-প্রচারনা চলাতে হবে;
- বিদ্যমান বৈষম্য মূলক কাঠামোকে পরিবর্তন করার জন্য যে সব নীতিমালা রয়েছে সেগুলো গণমাধ্যমে তুলে ধারার মধ্যদিয়ে সাধারণ জনগনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া (কারণ অনেক ক্ষেত্রেই সাধারন মানুষ বৈষম্যের বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হলেও বৈষম্য দূর করতে যে সকল নীতিমালা আছে সেগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ)।
- সংবাদ পত্রে নারীকে অধস্তন, দুর্বল, পুরুষনির্ভর, পশ্চাৎপদ ইত্যাদি ইমেজে উপস্থাপন করার রীতি পরিহার করতে হবে। সংবাদ, ফিচার এমনকি বিজ্ঞাপনে তা প্রবলভাবে প্রকাশিত হয় কিনা সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দিতে হবে।
- নারী বিষয়ক প্রতিটি আইটেমের জন্য আরও অধিক স্পেস দেয়া প্রয়োজন।
- কেবল নির্যাতনের শিকার নয়, তার অর্জন, সক্রিয় সংবাদ-উপাদান হিসেবে নারীকে স্থান দিতে হবে। আর নারীর বিশেষ কৃতিত্বের বা অর্জনের খবর শুধুমাত্র নারী পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে প্রথম পাতায় বা সাধারণ পাতায় গুরুত্বের সাথে স্থান দিতে হবে।
- মূল সংবাদে নারীর উপস্থিতি কম থাকলেও সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবিতে নারীকে ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহার করা এবং সৌন্দর্য সামগ্রী হিসেবে নারীর ছবির অপ্রাসঙ্গিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
- ধর্ষণ বা অন্যান্য নির্যাতনের খবরে নির্যাতন প্রক্রিয়ার সবিস্তার ও সচিত্র বর্ননা পরিহার করে নির্যাতনকারীর বিস্তারিত পরিচয় ও বর্ণনা প্রদান করতে হবে, যাতে সমাজে এ ধরনের মানুষের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয় এবং এ ধরনের কুপ্রবৃত্তি থেকে মানুষ নিজেকে দূরে রাখে।
- প্রেম, পরকীয়া প্রেম, হত্যা ইত্যাদি ঘটনার নারীকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বা হোতা বানিয়ে বা ইঙ্গিত পূর্ণ খবর পরিবেশন করে কাটতি বা চঞ্চল্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নারীকে ব্যবহার করার বিদ্যমান রীতি পরিহার করতে হবে।
- সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর সাফল্য ইতিবাচক ভাবমূর্তি ও আত্ম নির্ভরশীল নারীর চিত্র অধিক হারে তুলে ধরা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

- চলচ্চিত্রে কেবল মুনাফা লাভের আশায় নারীর সৌন্দর্য, কৌমার্য, যৌনতা ইত্যাদি ব্যবহারের প্রবনতা দূর করে গঠন মূলক বাস্তব ধর্মী, জীবন মুখী, পরিচ্ছন্ন এবং শ্লীল ছবি প্রদর্শনের প্রতি জোর দিতে হবে ।
- সেন্সর বোর্ডের হাত ঘুরে যে ছবি বাজারে আসে সেগুলিও নারীর অপরূপায়ণে যথেষ্ট কাজ করছে। তাই সেন্সর বিধিকে আরও বাস্তব ধর্মী, গবেষনা প্রসূত, জেন্ডার সংবেদনশীল বোদ্ধা জনগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত ও কার্যকর হতে হবে ।
- সিনেমায়, নাটকে, কিংবা বিজ্ঞাপনে নারী পুরুষের বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের বেলায় পরস্পরকে ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-যোগ্যতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী দর্শনে জুটিবদ্ধ হওয়ার ওপর জোর দেয়া উচিত; চুল, রং কিংবা কারুর রূপ মাধুর্য বা টাকাপয়সা ইত্যাদি দ্বারা চরিত্র গুলিকে প্রভাবিত করার প্রবণতা পরিহার করা অত্যন্ত জরুরী ।
- বিজ্ঞাপনের নেপথ্য কন্ঠ (Voice over) ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ মূলক অংশে নারী পুরুষ উভয়কে সমভাবে উপস্থাপন করতে হবে ।
- 'সৌন্দর্যই শক্তি' জাতীয় অপরূপায়িত বিজ্ঞাপনের ভাষা বদলাতে হবে অথবা বন্ধ করতে হবে। আর কোন বিশেষ ক্রীম বা পাউডার বা সাবান মানুষের ত্বকের রং বদলাতে পারে না -এ জাতীয় অবৈজ্ঞানিক, অসচেতন এবং জেন্ডার সংবেদনহীন বিজ্ঞাপন প্রদানের উপর প্রচার মাধ্যমগুলোর সেন্সর আরোপ করা প্রয়োজন। (প্রয়োজনে এ ধরনের (মানহানীকর) বিজ্ঞাপন দাতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে ।)
- বিভিন্ন সরকারী-সহযোগী প্রতিষ্ঠান গুলো বিজ্ঞাপন সংস্থায় কর্মরত কর্মী ও কর্মকর্তা পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান সহ সরকারী পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বিজ্ঞাপন প্রচারের নীতিমালা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে ।
- অশৈল্পিক, যৌনাবেদনময় সকল ধরনের সিনেমা, নাটক, বিজ্ঞাপন, কিংবা সিনেমা হলে বিদেশী ছবির কাটঁপিস প্রদর্শনী বন্ধ করতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

- আকাশ মাধ্যমে প্রাপ্ত স্যাটেলাইট চ্যানেল গুলির ওপর মনিটরিং সেল গঠন করে আপত্তিকর দৃশ্যের উপর সেন্সর আরোপের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ভিডিও সিডি ব্যবসায়ের নামে নিসিদ্ধ অশ্লীল ছবি প্রদর্শন, বিক্রয় ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে এবং এ ধরণের ছবি বাজারজাত করণের দায়ে কঠোর শাস্তির বিধান রাখতে হবে। কারণ অশ্লীল ছবি প্রতিনিয়ত নারীকে অবমূল্যায়িত করে এবং এর দর্শণ বিশেষ করে যুব সমাজের মনে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিলুপ্ত হয় যা সহিংসতা বৃদ্ধি সহ নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক বড় বাঁধা হিসেবে দেখা দিয়েছে।
- ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও নারীর ইমেজ রূপায়ণে খুব বেশি কিছু উন্নতি করতে সক্ষম হয় নাই। এ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সমাজের উচ্চ শিক্ষিত, যোগ্য নারীদেরকে পুরুষের পাশাপাশি সমান হারে নিয়োগ দান করতে হবে।
- সর্বত্র নারীর অংশ গ্রহণকে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়াকে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব মুক্ত রাখতে হবে এ ক্ষেত্রে নারী সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।
- পুরুষের মানসিকতা উন্নয়নের জন্য পাঠ্য সূচী, টেলিভিশন তথা সব ধরনের গণমাধ্যমে সক্রিয় প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। (বিশেষ করে খবর, আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যবর্তী বিজ্ঞাপন গুলি অবশ্যই এ সংক্রান্ত হওয়া উচিত, কারণ এসব ক্ষেত্রে পুরুষ দর্শকের সংখ্যা বেশি)।
- অনেক উচ্চ শিক্ষিত , প্রভাবশালী, বুদ্ধিজীবী, বরেণ্য ব্যক্তির মধ্যেও অনেক সময় নারী সম্পর্কে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সামাজিক মতাদর্শ বা মূল্যবোধের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাপক প্রচারণা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ম্রিয়মান দীপটিকে প্রজ্জলিত করতে পারে খুব সহজে এবং তাঁদের ভাবনা প্রসূত চিন্তা ধারা নারী সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত গৎবাঁধা ধারণাকে পাল্টেদিতে পারে।
- শ্রবণ-দর্শন মাধ্যম, শ্রবণ মাধ্যম, অথবা মুদ্রনমাধ্যম সব ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়োগ দাতাগনের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন সাধন করতে হবে এসব ক্ষেত্রে নিয়োজিত যোগ্য নারীদের বদলে দিতে হবে মিডিয়া

Dhaka University Institutional Repository

কালচার, পুরুষতান্ত্রিক ধারনা, পাল্টে দিতে হবে সমাজকে, এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে পৃথিবীকে।

উপসংহার ঃ

দীর্ঘ আলোচনা, যুক্তিতর্ক, সাক্ষাৎকার, বিদ্যমানতার মাঝে লুকিয়ে থাকা প্রাচীনতা, কিংবা আধুনিকতার ধরণ, সবকিছু বিচার বিশ্লেষণের পর আমরা একটি বিষয়ে একমত হতে পারি যে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমকে পাশ কাটিয়ে কোন পথেই নারী উন্নয়নকে গতিশীল করা সম্ভব নয়। সেই গুহাযুগ থেকে আজ পর্যন্ত সভ্যতার প্রতিটি স্তরে মানুষের আন্তর্নিহিত ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করেছে গণমাধ্যম। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগকে কাটিয়ে নারীকে আলোর পথে-আধুনিক যুগে প্রবেশ করতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে গণমাধ্যম। বিজ্ঞজনের লেখনী, নাটক , কবিতা, গল্প, সিনেমা, রেডিও টেলিভিশন সর্বত্র প্রচার-প্রচারণার ফলে মানুষের মনোজগতে সত্যাগ্রহের জন্ম নিয়েছে, তারা নারীর অপরূপায়ণ ও নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে মানসিক ভাবে প্রভাবিত হয়েছে যুগে যুগে। তাইতো জাতিসংঘ সহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র গুলো নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়ে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। নারী জননী; তাই তার মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনের প্রবাহ, সৃষ্টিও গতিশীলতার বীজ। মানুষকে আগুন জ্বালাতে শিখিয়েছে যে নারী, কৃষি উৎপাদনের পথ আবিষ্কার করেছে যে নারী, সন্তানকে মানুষ হতে সাহায্য করেছে যে নারী, মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়েছে যে নারী - তাকে যারা হেয় প্রতিপন্ন করে গৃহবন্দী করেছে, শিক্ষাবঞ্চিত করেছে, অধিকার বঞ্চিত করেছে, অপরূপায়ণ কিংবা অশ্রদ্ধা করেছে, তারা অবশ্যই মিথ্যাচারী, মানবিকতা বিরোধী, বিবেকহীন। প্রকৃত জ্ঞান তাদের স্পর্শ করে না, বুদ্ধি তাদের সহায় হয় না, সৃষ্টির বৈচিত্রকে তারা অস্বীকার করে। নারীর প্রতি যারা এতকাল অন্যায়, অত্যাচার, অমর্যাদা করেছে একদিন মানব সমাজ তাদের অপকর্মের ঐতিহাসিক রূপ দেখে লজ্জা ও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না, যেমন করেনি সতিদাহ (প্রথাকে মহান রূপদানকারী) প্রচলনকারীদের। কল্যাণীয়া নারীর মঙ্গলময় পরশে সভ্যতার যে উন্নয়ন ঘটেছে আজ সমাজের বোদ্ধা জনগোষ্ঠী তা উপলব্ধি করেছে বলেই নারী-উন্নয়নের পক্ষে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবু আজও নারী উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে (সর্বক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার, সম্পত্তির সমঅধিকার ইত্যাদির বিরুদ্ধে) প্রতিক্রিয়াশীলদের মিটিং হয়।

আজও এ সমাজ পুরুষতান্ত্রিকতার অশুভ বোঝা বহন করে চলছে। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করতে হলে সিডও সনদের বাস্তবায়নের পক্ষে পদক্ষেপ সমূহ কার্যকর করতে হবে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভিসি, সিনেট সদস্য, জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় চীফ হুইপসহ সকল পর্যায়ে নারীর নিয়োগ দানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সেদিন দূরে নয় -যখন একটি সমতায়িত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সেই লক্ষে বিদ্যমানতার অচলায়তন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে গণমাধ্যমকে। নারী উন্নয়নের পথকে মসৃণ করার লক্ষে জেন্ডার নিরপেক্ষ প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যেতে হবে। সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে নারী-পুরুষ সমতায়িত একটি উন্নত ও আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে!!

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালা ঃ পরিশিষ্ট ঃ ১

সাক্ষাৎকারের তারিখ সময় স্থান

গ্রুপ - ক

১. (ক) নাম :

(খ) পিতার নাম :

(গ) মাতার নাম :

(ঘ) বয়স :

(ঙ) পেশা ও পদ মর্যাদা :

২. (ক) আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা :

(খ) আপনার স্বামী/স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা :

(গ) আপনার স্বামী/স্ত্রীর পেশা :

(ঘ) আপনার পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা :

(ঙ) আপনার মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা :

৩. (ক) আপনার মাসিক আয় কত?

(খ) আপনার স্বামী/স্ত্রীর মাসিক আয় কত?

(গ) আপনার পিতার মাসিক আয় কত?

(ঘ) আপনার মাতার মাসিক আয় কত?

৪. আপনি নিজেকে কোন শ্রেণীর লোক মনে করেন?

গ্রুপ - খ

১. (ক) নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে আপনি কতটুকু জরুরী মনে করেন?

(খ) গণমাধ্যমের মধ্যে কোনটি নারী উন্নয়নে বেশি সহায়তা করছে বলে আপনি মনে করেন?

(গ) প্রচলিত গণমাধ্যমগুলির মধ্যে কোনটি আপনাকে বেশি আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে?

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) গণমাধ্যম গুলির মধ্যে কোনটি মানুষকে বেশি প্রভাবিত করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

২. (ক) আপনি কি নিয়মিত সংবাদ পত্র পড়েন? দিনের কোন সময়টা এক্ষেত্রে আপনি বেছে নেন?

(খ) (অনিয়মিত বা মাঝে মাঝে পড়েন এমন পাঠকের ক্ষেত্রে) আপনি সাধারনত কবে ও কখন সংবাদপত্র পড়েন?

(গ) সংবাদপত্রে কোন কোন দিকগুলি নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপযোগী -কোন গুলি নয়?

(ঘ) সংবাদপত্রগুলি সংবাদ পরিবেশনে কি যথেষ্ট জেন্ডার সংবেদনশীলতার রক্ষা করে? করলে সে গুলি কি কি? না করলে কি কি? কী করলে এ সব ত্রুটি দূর করা যায়?

(ঙ) সংবাদপত্রের নারী পাতা নারী উন্নয়নে কতটা সহায়তা করছে? এ ক্ষেত্রে এর কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে কি?

(চ) আপনি কি কোন সাময়িকী বা গবেষণা পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক বা পাঠক? হলে এটি কি এবং কোন ধরনের?

৩. (ক) আপনি কি নিয়মিত বই পড়েন ? সঠিক ঘরে টিক দিন।

হ্যাঁ	না	মাঝে মাঝে	সময় হয় না
কাজের চাপে কোন বই পড়া শুরু করলে শেষ করতে পারি না			

(খ) কোন ধরনের বই বেশি পড়েন?

(গ) কোন ধরনের বই নারী উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে?

(ঘ) আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী কি যথেষ্ট জেন্ডার সহায়ক?

(ঙ) যদি হয় তবে কোন দিক থেকে? না হলে এক্ষেত্রে কী করণীয়?

(চ) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী কতটুকু অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশ পাচ্ছে? আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞাতা কি?

(ছ) এক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিগত মতামত বা করণীয় কী?

Dhaka University Institutional Repository

৪. (ক) আপনি কি একজন নিয়মিত টেলিভিশন দর্শক?

সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন দিন ।

হ্যাঁ	না	মাঝে মাঝে দেখি	ছুটির দিন গুলিতে
অবসর পেলে দেখি	দেখার সময় হয় না		

(খ) আপনি কি স্যাটেলাইট বা বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান গুলি নিয়মিত দেখেন? সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন দিন ।

হ্যাঁ	না	দেখার ব্যবস্থা বা সুযোগ নেই	মাঝে মাঝে দেখি

(গ) টিভি চ্যানেল গুলির প্রচারিত অনুষ্ঠান মালার মধ্যে কোন অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠান সমূহ আপনাকে আকর্ষণ করে এবং কেন?

(ঘ) আপনি কোন চ্যানেল বেশি দেখেন? কেন?

(ঙ) এই অনুষ্ঠান নারী উন্নয়নে কি কোন সহায়তা করছে?

৫. (ক) বিটিভির অনুষ্ঠানমালা নারী উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখছে? কোন অনুষ্ঠানটি এক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য?

(খ) আপনি ব্যক্তিগত ভাবে বিটিভির কোন অনুষ্ঠান এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন বা হচ্ছেন কি?

(গ) টেলিভিশনে প্রচারিত বিজ্ঞাপন গুলি কি জেন্ডার সচেতন? হলে কি কি? না হলে কোন কোন দিক থেকে? এ ক্ষেত্রে কী করণীয় হওয়া উচিত?

(ঘ) নারী উন্নয়নে কী ধরনের বিজ্ঞাপন বেশি প্রচার হওয়া উচিত?

(ঙ) বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ণ কীরূপ হওয়া উচিত?

৬. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন ঃ

(ক) আপনি কি সিনেমা দেখেন?

হ্যাঁ	না	মাঝে মাঝে দেখি	ভাল ছবি হলে দেখি

Dhaka University Institutional Repository

(খ) কোন ধরনের সিনেমা বেশি দেখেন?

বাংলা	হিন্দি	ইংলিশ	সামাজিক
মুক্তিযুদ্ধ	পুরান দিনের	আধুনিক	
ডকুমেন্টারি	আর্টফিল্ম	শর্ট ফিল্ম	টেলিফিল্ম ও অন্যান্য

(গ) সিনেমার সংলাপ ও সাজ সজ্জা কতটুকু নারী বান্ধব এবং কতটুকু বাস্তবধর্মী বলে আপনি মনে করেন?

(ঘ) নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সিনেমা গুলির আরও কতটুকু এবং কোন দিক থেকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন?

৭. (ক) সংগীত, নৃত্যকলা বা চিত্র কলা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি কোন ভূমিকা রাখতে পারে?

(খ) এগুলি কোন দিক থেকে নারী উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে কিংবা রাখেনি?

পরিশিষ্ট ঃ ২

প্রশ্নমালা (গণমাধ্যমের সাথে যারা জড়িত তাদের জন্য)

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ   ধরন ঃ

১। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম কবে থেকে শুরু হয়েছে?

২। আপনাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের সংখ্যা কত? তাদের সামাজিক অবস্থান কি রকম?

৩। প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক উৎস কি?

৪। নারীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও কর্মসূচী কি কি রয়েছে?

৫। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কি কি পদক্ষেপ গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে? (প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত বর্ণনা)

Dhaka University Institutional Repository

৬। নারী বিষয়ক কি কি অনুষ্ঠান মালা, সেমিনার কিংবা গবেষণার কাজ করেছেন?

৭। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে কি?

৮। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে নারী অবমূল্যায়নকৃত অংশ গুলি বাদ দিয়ে প্রচার কিংবা সংশোধন করে প্রচার করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কি?

৯। প্রচারের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল আধেয় সন্নিবেশ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

১০। নারী বিষয়ক সরকারী কর্মকান্ড, নীতির সাথে আপনাদের কি রকম সংযোগ রয়েছে?

১১। সরকারের কাছে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রচারনায় ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে আপনারা কি কি দাবী পেশ করেছেন? এ বিষয়ে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে কি?

১২। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনাদের প্রচার-প্রচারনা কতটুকু সহায়তা করেছে বা করছে?

১৩। সিডও ঘোষনা বাস্তবায়নের জন্য কোন আলাদা কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন কি?

১৪। নারী নীতি ২০০৮ এর সমর্থনে আপনাদের প্রতিষ্ঠান কতটুকু ক্রিয়াশীল?

১৫। নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রচারের ক্ষেত্রে আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে কখনও বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি?

১৬। বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করবেন কি?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

১। নারী ও গণমাধ্যম বিষয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে যা বলা হয়েছে।

- গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার, প্রবেশধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশ গ্রহণে বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে-শিশুর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটানো।
- নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী ধারণার প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ রাখা।
- প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার-পরিপ্রেক্ষিত সমন্বিত করা।
- উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে আইন প্রচারনীতি নিয়ন্ত্রণবিধি ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা।

উৎস ঃ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি; মহিলা ও শিশু বিষয়মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়- এর পলিসি লিডারশিপ অ্যাডভোকেসি ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি (প্লাজ) প্রকল্প; ১৯৯৯;ঢাকা।

২। প্রথম আলোতে নারী ইস্যুভিত্তিক লেখা প্রকাশের নীতিমালা।

নারীত্বের সম্মান ঃ

১. কোনো লেখায় কোনো ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে নিন্দার্থে অহেতুক নারীত্বের প্রসঙ্গ টেনে আনা যাবে না। কোনো কলাম লেখক বা প্রদায়কের রচনায় এমন প্রসঙ্গ থাকলে তা ছাপানো হবে না।

২. নারীদের হেয় প্রতিপন্ন করে কোনো প্রতিবেদন, ফিচার, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় বা কার্টুন পত্রিকায় প্রকাশ করা যাবে না। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি নারীদের নিয়ে বিদ্বিষ্ট মন্তব্য করলে বিশেষ বিবেচনায় তা ছাপানো যেতে পারে। তবে বিষয়টি সম্পর্কে নারী-বিশেষজ্ঞদের মতামত ও একই সঙ্গে প্রকাশ করতে হবে।

৩. প্রতিটি রচনায় মহিলা শব্দটির বদলে যথাসম্ভব নারী নির্যাতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলে অভিযুক্ত আসামির ছবি ছাপা যেতে পারে। তবে তাকে 'অপরাধী' না লিখে 'অভিযুক্ত' লিখতে হবে।

৪. কোনো নারী অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হলে তা না ছাপার কারণ নেই। তবে অপরাধে কোনো যৌন ইঙ্গিত থাকলে পরিবেশিত খবরে তাদের পরিচয় দেওয়া যাবে না।

পীড়ন ও লাঞ্ছনা ঃ

১. কোনো নারী শারীরিক ভাবে লাঞ্ছনার শিকার হলে এবং সে সংক্রান্ত খবর ও ছবি ছাপা হলে তার সামাজিক সম্মান বা সম্ভ্রম আহত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে খবর পরিবেশনের সময় তার নাম, পরিচয়, ও ছবি ছাপা যাবে না। হরতালে বা রাজনৈতিক মিছিলে কোনো নারীর বস্ত্র খুলে ফেলার ছবি ছাপাতে হলেও তার চেহারা ঢেকে দিতে হবে। তবে লাঞ্ছনার শিকার কোনো নারী নিজেই প্রকাশ্যেই ঘটনাটি বয়ান করলে তার নাম, পরিচয় ও ছবি ছাপা যেতে পারে।

২. এসিডদগ্ধ মেয়েদের বীভৎস চেহারার ছবি ছাপানো হলে পাঠকদের জন্য তা পীড়াদায়ক হয় বলে এ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে বর্তরতার মাত্রা বোঝানোর জন্য এসিডদগ্ধ মেয়ের ছবি এবং তার পাশাপাশি মূল চেহারার ছবি ছাপানো যেতে পারে তবে কোনো এসিডদগ্ধ মেয়ের নাম পরিচয় ও ছবি প্রকাশ্য করতে হলে তার ও তার অভিভাবকের অনুমোদন নিতে হবে।

৩. এসিডদগ্ধ বা নির্যাতনের শিকার কোনো মেয়েকে নিয়ে প্রতিবেদন পাঠালে মফস্বল প্রতিনিধিরা একই সঙ্গে মেয়েটির নাম, পরিচয় ও ছবি প্রকাশের অনুমতি ও পাঠাবেন অথবা অনুমতির বিষয়টি নিজ দায়িত্বে অফিসকে জানাবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ষণ বিষয়ক খবর ঃ

১. সাধারণভাবে ধর্ষিতার নাম ছাপা যাবে না বা তাকে শনাক্ত করা যায় এমন কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না। একইভাবে তার ছবি ও ছাপা যাবে না।

২. রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্য ধর্ষিতার ছবি ছাপাতে হলে তা এমনভাবে ছাপতে হবে যেন তার চেহারা কোনো ভাবেই বোঝা না যায়।

৩. তবে ধর্ষণের পর ধর্ষণের শিকার কোনো নারী কোনো কারণে মৃত্যু বরণ করে থাকলে তার ছবি ছাপা যাবে।

৪. ধর্ষণের প্রতিবেদন সাবধানতা ও অতিরিক্ত সচেতনতার সঙ্গে লিখতে হবে। কোনো শব্দ বা বাক্য প্রয়োগ কিংবা বর্ণনায় কোনো ভাবেই হলুদ সাংবাদিকতার প্রকাশ ঘটানো যাবে না। মনে রাখতে হবে, বহু পাঠক ধর্ষণের খবরগুলো থেকে বিকৃত আনন্দ লাভ করে থাকেন।

৫. ধর্ষিতা শব্দটির বদলে যথাসম্ভব 'ধর্ষণের শিকার' কথাটি ব্যবহার করতে হবে।

নাম- পরিচয় ছাপাতে হলে ঃ

১. ধর্ষণ-সংক্রান্ত কোনো ঘটনার মামলা হলে ধর্ষিতার লিখিত অনুমতিসাপেক্ষ তার নাম পরিচয় ছাপানো যেতে পারে।

২. প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরক্ষর কোনো মেয়ে ধর্ষণের শিকার হলে মামলা দায়েরের পর ধর্ষিতার অনুমতি নিয়ে এবং তার পরিবার বা নিকট জনের সঙ্গে প্রথম আলোর স্থানীয় প্রতিনিধির বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষই কেবল তার নাম-পরিচয় প্রকাশ করা যাবে।

৩. তবে কোনো নারী ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির শিকার হওয়ার পর অনুমতি দেওয়ার মতো মানসিক ভারসাম্য হারালে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তার নাম-পরিচয় গোপন রেখেই প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।

৪. ১৮ বছরের নিচে কোনো মেয়ে ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির শিকার হলে কোনো ক্রমেই তার নাম, পরিচয় ও ছবি প্রকাশ করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসবকালীন ছুটি ঃ

১. নিয়োগ প্রাপ্তির পর ন্যূনতম ৯(নয়)মাস অতিক্রান্ত হলে একজন নারী কর্মী মোট ১৬ (ষোল) সপ্তাহ সচেতন প্রসবকালীন ছুটি প্রাপ্য হবেন ।

২. প্রথম আলোতে যোগদানের আগে নারী কর্মীর কোনো সন্তান না থেকে এখানে চাকরি কালীন সময়ে তিনি ২(দুই) বার প্রসবকালীন ছুটি প্রাপ্য হবেন । তবে ১৮(আঠারো) মাসের মধ্যে দুবার এ ছুটি ভোগ পাবেন এবং কারো আগেই ২(দুই) সন্তান থেকে থাকলে তিনি এ ছুটি পাবেন না ।

৩. প্রসবকালীন ছুটির জন্য অন্তত ১৬ সপ্তাহ আগে ছুটির আবেদন করতে হবে ।

উৎস ঃ নীতিমালা ও নিয়মাবলি , প্রথম আলো, ঢাকা । (মূল পুস্তিকায় প্রকাশের তারিখ নেই, তবে অনুসন্ধানে জানা গেছে এটি ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয় ।

৩ । জেন্ডার রূপায়ণ আচরণবিধি, কানাডা ।

কানাডীয় রেডিও টেলিভিশন টেলিযোগাযোগ কমিশন টাস্ক ফোর্স সম্প্রচার-মাধ্যমে লৈঙ্গিক ভূমিকা সম্পর্কিত একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করে ১৯৮১ সালে । আচরণ বিধিটি ১৯৮৭ সালে প্রথমবার ও ১৯৯৩ সালে পুনরায় আচরণবিধিটি পর্যালোচনা করা হয় । এবং এর নামকরণ করা হয় জেন্ডার পোর্ট্রেয়াল গাইড লাইনস্ । নিচে আচরণবিধি বর্ণনা করা হলো ঃ

১. লৈঙ্গিক সমাতার উপলব্ধি ক্ষতিগ্রস্ত যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে, যদি ও বিজ্ঞাপনটির পৃথক উপাদানগুলো কোনো বিশেষ আচরণবিধিকে ক্ষতিগ্রস্ত নাও করে থাকে ।

২. যদিও আচরণবিধিটি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য তবুও কিছু ধারা আছে সে গুলো নারীর রূপায়ণ বিষয়ক । নারী ও পুরুষ উভয়েরই নেতিবাচক রূপায়ণের ব্যাপারে সমান ভাবে ঝুঁকির মধ্যে নেই এবং এই গাইড লাইন সেই সত্যকে স্বীকার করে ।

৩. রসবোধ, শৈল্পিক কর্ম ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সবই বিজ্ঞাপনে ইতিবাচক উপাদান হিসেবে থাকতে পারে । তবুও এই টেকনিক গুলো- যা আজকের যুগে

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রহণযোগ্য-নারী ও পুরুষের ছাঁচীকৃত উপস্থাপনের জন্য অথবা আচরণ রূপায়ণের জন্য কোনো সাফাই হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না ।

৪. পরীক্ষণের সময় কনজিউমার রেসপন্স কাউন্সিল মিডিয়ার ধরণকে বিবেচনায় আনতে পারে। ঘনিষ্ঠ বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের পণ্যের মতো নির্দিষ্ট কোনো ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে কোন ধরনে মিডিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে তার সংবেদনশীলতাকে বিবেচনায় আনা হবে ।

কর্তৃত্ব ঃ

কর্তৃত্বের বিবেচনায় বিজ্ঞাপন গুলো নারী ও পুরুষকে সমভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এটা করতে হবে প্রকৃত বিজ্ঞাপন- দৃশ্যে এবং যখন ঘোষক, নেপথ্য-কণ্ঠ, বিশেষজ্ঞ ও অন-ক্যামেরা কর্তৃত্বের ব্যবহার হচ্ছে, তখনও ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

বড়ো টিকেট আইটেম সহ যেকোনো ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে একক সিদ্ধান্তগ্রহীতা হিসেবে সমভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যেক্ষেত্রে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার রয়েছে সেখানেও, গৃহ বা কর্মস্থল হোক, নারী ও পুরুষ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমভাবে অংশ নেয়া দেখাতে হবে ।

সহিংসতা ঃ

যৌনতার মতো প্রকাশ্যে বা গোপন হুমকি, অথবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কর্তৃত্ব আরোপের ব্যাপার গুলো চিত্রিত করা যাবে না ।

স্বাতন্ত্র্য ঃ

বিজ্ঞাপনে নারী ও পুরুষ উভয়েরই পূর্ণরূপে বিদ্যমান স্বাতন্ত্র্যের চিত্র এবং ঘর ও ঘরের বাইরে তাদের কর্মকান্ডের চিত্র সমভাবে উপস্থাপন করতে হবে ।

ভাষা ঃ

বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে, আক্রমণাত্মক এবং নারী বা পুরুষকে বাতিল করে এরকম কোনো ভাষার ব্যবহার বিজ্ঞাপনে এড়িয়ে চলতে হবে ।

সূত্রঃ http://www.adstandards.com/en/standrads/gender_PFV.html

Dhaka University Institutional Repository

কিছু কিছু সমাজ সচেতনতা মূলক বিজ্ঞাপন জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে-

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

Publications (English)

Ahmed, Mohiuddin, Working women in rural Bangladesh, A case study community development library, Dhaka, 1983.

Ahsan, R, M. et al. Role of women in Agriculture, Centre for Urban Studies, Dhaka, 1986.

Akanda, Latifa and Shamim, Ishrat, Women and Violence, A comparative study of Domestic Violence against women and girls, unicef, No-6.

Bangladesh, NGO committee on beijing plus five, Bd, Feb-2000.

Boserup Easter, Women's Role in Economic Development, London, George Allen & Unwin LTD, 1970.

Bhasin, Kamla, Understanding Gender, Kali for Women, K-92, Haur Khas Enclave, New Delhi-110016, 2000.

Chowdhury Dilara, "Women's Participation in the Formal Structure and Decision-Making Bodies in Bangladesh" in Jahan Roushan et al. Empowerment of Women-Nairobi to Beijing (1985-1995), Dhaka, Women for Women, 1995.

Devasia, Leelamma, V. V. Devasia, 'Empowering Women for Sustainable Development', Ashish Publishing House, New Delhi-110026, 1994.

Easton David, A Framework for Political Analysis, Englewood Cliff: N. J: Prentice Hall, 1965.

Jeanee Vickers, Programme for women and Girls, Women and the world Economic Crisis, Zed books Ltd., London and New Jersy.

Jahan Rownaq & Papanek Hanna eds., Women and Development-Perspective from South and South East Asia, Dhaka, Bangladesh Institute of Law & International Affairs.

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Pratima Paul-Majumder, Reflection of Women's Voice and National Gender Objectives In The National Budget of Bangladesh, Bangladesh Nari Progati Sangha (BNPS), Sep. 2003.

Khanam Johora et al, Women and Politics in Bangladesh, Chittagong, Shah Amanat Computer & Printing, Bangladesh.

Khan Salma, "Women's Development and Public Policy in Bangladesh" in Integration of Women in Development, Dhaka, United Nations Information Center, 1985.

Moser O. N. Caroline, "Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training, Routledge, 1993.

Nelson Barbara J. and Chowdhury Najma eds., "Women and Politics Worldwide, New Haven & London, Yale University Press, 1994.

Pietila Hikka and Vickers Jeanne, Making "Women Matter the Role of the United Nation", United Nations.

Review Report, Beijing plus 5, National Committee for Beijing plue five review Bangladesh, AOAB.

Sobhan Rehman, "Planning and Public Action for Asian Women", University Press Ltd., 1992.

Zerina, Begum, "Women's Career Training Institute Report, 1972-76", Dhaka: New Baily Road.

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশনা (বাংলা)

আইন ও শালিশ কেন্দ্র, "পারিবারিক আইনে বাংলাদেশের নারী", আইন ও শালিশ কেন্দ্র, ১৯৯৫।

আখতার ইমাম, "বাছাই রচনাঃ প্রসঙ্গ নারী", পরিবেশনা জাতক, ঢাকা, ১৯৯২।

আখতার তাহমিনা, "মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা-বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট", ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৯৫।

আখতার, ফরিদ, সম্পাদিত, "শত বছরে বাংলাদেশের নারী", নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৯।

আখতার, মুনীর শাহীন, "নারী ও মানবাধিকার ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষিত", (নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইন শিক্ষা পুস্তিকা-২), ইনস্টিটিউট ফর এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, "বেগম রোকেয়া", ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

আমিন, সোনিয়া, নিশাত, "বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন (১৮৭৬-১৯৩৯)", অনুবাদ-নাহার পারভীন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর, ২০০২।

আহমেদ ফারুক হাসান, "বাংলাদেশের গণমাধ্যম", আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬।

আহমেদ হাসিনা (অনূদিত), "বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ", সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৯।

ইসলাম, একে এম সিরাজুল "ইসলামে নারীর মানবাধিকার", মা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।

ওদুদ, কাজী আব্দুল, "বাংলার নবজাগরণ", কলকাতা, ১৩৬৩।

কবির মাহমুদ, "বাংলাদেশের নারী", সূত্রীপত্র, ফেব্রুয়ারী, ২০০৩।

খাতুন আয়েশা অনূদিত, "বেইজিং কর্মপরিকল্পনা", বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

খাতুন খাদিজা ও অন্যান্য সম্পর্কিত, "নারী-উন্নয়ন-প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান", ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

"ঘোষ বিনয়, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ", ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪ ।

চৌধুরী নাজমা এবং অন্যান্য, "নারীর ক্ষমতায়ন' উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা", টাস্কফোর্স প্রতিবেদন-দ্বিতীয় খন্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২ ।

জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দীন খান, "বাংলাদেশ এবং সিভিল সমাজ; বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ এবং মৌলবাদ", আগামী প্রকাশনী, ঢাক ।

জাহাঙ্গীর বোরহান উদ্দীন খান, "আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতার অভিজ্ঞতা" আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ ।

ঠাকুরতা মেঘনা গুহ, বেগম সুরাইয়া ও অন্যান্য সম্পাদিত, "গণমাধ্যম ও নারী", নারী সংহতি, ঢাকা, ১৯৮৭ ।

ঠাকুরতা মেঘনা গুহ ও সুরাইয়া বেগম "নারী ঃ রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ", সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা নভেম্বর ১৯৯০ ।

ঠাকুরতা মেঘনা "বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ঃ রাষ্ট্রের ভূমিকা"জাহাঙ্গীর বোরহান উদ্দীন খান এবং খান জরিনা রহমান (সম্পাদিত) বাংলাদেশ নারী নির্যাতন, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ১৯৯৩ ।

ঠাকুরতা মেঘনা গুহ ও বেগম সুরাইয়া, "রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, ঠাকুরতা মেঘনা গুহ, বেগম সুরাইয়া ও আহমেদ হাসিনা সম্পাদিত, নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৭ ।

ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, "বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা বাজেট ও নারীর ক্ষমতায়ন", বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলমেন্ট, জুন ২০০৫ ।

ড. প্রতিমা পাল, মজুমদার, "বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জাতীয় বাজেটের ভূমিকা", প্রাগুক্ত, জুন ২০০৬ ।

নারী ও পরিবার, "বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ) সংকলন ও সম্পাদনা-ভারতীয় রায়", আনন্দ, জানুয়ারী ২০০২ ।

ফাহমিদুল হক, "মিডিয়া ও নারী", স্টেপস্ টুয়ার্ডস, ডেভেলপমেন্ট, ২০০৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

বন্দোপাধ্যায় রনজিৎ, "উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৮৫০-১৯০০), প্রকাশক" অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যয়, বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৯ ।

বেইজিং প্লাস ফাইভ রিভিউ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, বেইজিং প্লাস ফাইভ পর্যালোচনা প্রতিবেদন, বাংলাদেশ, জুন ২০০০ ।

বেবী মওদুদ "বাংলাদেশের নারী", আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪ ।

মালেকা বেগম, "বাংলার নারী আন্দোলন", বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

মালেকা বেগম (অনুদিত), "জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন", বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা অনুবাদ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মদ সামাদ, প্রকাশিত- রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, মে ১৯৯৭ ।

মাহমুদ কবীর, বাংলাদেশের নারী, সূচীপত্র, ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ । মোহান্ত দীপংকর, লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯ ।

রিটা, কেলি "মে ও মেরী বুটিলিয়ার "রাজনৈতিক নারীর অভ্যন্তর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও ভূমিকা দ্বন্দ্বের সমীক্ষা" খান নুরুল ইসলাম (অনুদিত), বাংলা একাডেমী, সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ ।

রীয়াজ আলী, "গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম", প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা, ১৯৮৯ ।

হক মোজাম্মেল, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামে নারীঃ অতীত ও বর্তমান", সম্পাদনা রোকেয়া কবীর, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ।

হাসীন, শাকিনা "নারী ও মৌলবাদ" প্রকাশক মোতাহার হোসেন, প্যাপিরাস, ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ।

হোসেন সাখাওয়াত, রোকেয়া, 'স্ত্রী জাতির অবনতি', নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ ।

হোসেন শওকত আরা, মুক্তিযুদ্ধ ও নারী আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ ।

বাংলাদেশ সরকারের দলিল ও প্রকাশনাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় (১৯৯১সালের ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত সংশোধিত ।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা মন্ত্রনালয় (২০০৩) পরিপত্র, স্মারক নং- শিম / শাঃ ১০/ পরীক্ষা এস, এস সি (বাউবি)-১/'

Bangladesh Bureau of statistics, Report on Labour force Survey in Bangladesh-1995-96, Dhaka December, 1996

BANBEIS REPORT (2003) Bangladesh Educational Statistics.

Bangladesh Bureau of Statistics (2004). Statistical Yearbook of Bangladesh, December, 2005

United Nations Reports/ Publications

United Nations , CEDAW, New York
UNDP , Human Development Report, 1999.
UNDP HRD Report, 2004
UNDP Report 2003

A world Report, New York, 1999

'Women and Ecomomic decision-making', women: Looking beyond 2000, United Nations, New York.

জার্নাল, সাময়িকী ও দৈনিক পত্রিকা ঃ

আক্তার রাশিদা লিঙ্গীয় সম্পর্কের দেনদরবার :একটি সমীক্ষা সমাজ নিরীক্ষণ/ ৯৭, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা ।

খাতুন সায়েমা, নারী বাদী ইতিহাস রচনার সংকট, সমাজ নিরীক্ষণ/৭৫, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা ।

খানম, রাজিয়া, পরিবেশ নারী ও পিতৃতন্ত্র ঃ একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ, ক্ষমতায়ন ২০০৪, সংখ্যা-৬ ।

গীতি আরা নাসরীন, গোঁফ দিয়ে যায় চেনাঃ অলিখিত জেন্ডার ব্যাকরণ নিয়ে পূর্ণভাবনা, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, এয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চ ২০০৭ ।

চিররঞ্জন সরকার, নারীর ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব, উন্নয়ন পদক্ষেপ, এয়োদশ বর্ষ,দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চ ২০০৭

চৌধুরী এজাজুল হক, স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা ১৯৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ সিকদার সৌরভ, টিভিবিজ্ঞাপনে নারী প্রতিচিত্র, উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস, ডেভেলপমেন্ট ।

নবী বেলা, "এক নারীবাদী পুরুষঃ জন স্টুয়ার্ট মিল" উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, চতুর্থ বর্ষ, ১৩তম সংখ্যা ১৯৯৮ ।

নাসরীন গীতি আরা, বিজ্ঞাপনে নারীর (অপ) রূপায়ণ, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট বর্ষ-৯, সংখ্যা ২৯, ২০০৩ ।

নাহার নাজনীন মোছা, গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন ও গ্রামীণ ব্যাংক প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ক্ষমতায়ন, ২০০৪ সংখ্যা-৬ ।

পারভীন শামীমা, "নারীর ক্ষমতায়ন" উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, চতুর্থ বর্ব, সংখ্যা ১৯৯৮ ।

ফরাস উদ্দিন মোহাম্মদ, "নারীর ক্ষমতায়ন একটি সামগ্রিক প্রেক্ষাপট", নিবন্ধ উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট ।

ফেরদৌসী শাহেদা মুন্নী, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ । প্রয়োগও বাস্তবায়নের সমস্যা উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট ।

ফেরদৌসী, শাহেদা মুন্নী, উন্নয়নে জেন্ডার সংবেদনশীল এবং কার্যকর যোগাযোগ উপকরণ, উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট মার্চ-২০০৭ ।

বন্দররাগে অশোকা, উদার নাতিবাদ, মার্ক্সবাদ ও মার্ক্সবাদী নারীবাদ, সমাজ নিরীক্ষণ সংখ্যা-২২ ।

বিখ্যাত পুরুষদের দৃষ্টিতে মেয়েরা , সৌজন্যে – বেলা বন্দোপাধ্যায় , কালান্তর , উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট , আটত্রিশ তম সংখ্যা ।

ভাসিন কমলা, "প্রচলিত উন্নয়ন বনাম টেকসই উন্নয়ন" উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা ১৯৯৮ ।

মারিয়া শান্তা, "পারিবারিক নির্যাতন রুখতেই হবে", উন্নয়ন পদক্ষেপ ত্রয়োদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চ ২০০৭ ।

মিনু নাসিমুন আরা হক, সংবাদ মাধ্যমে নারীর অধিকার (নিবন্ধ), উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট এপ্রিল ২০০৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ সফিকুল ইসলাম, উন্নয়ন যোগাযোগ সাম্প্রতিক ভাবনা সমাজ নিরীক্ষণ/৬০, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা ।

মোঃ ইসমাইল হোসেন, "পারিবারিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নও এনজিও উদ্দ্যোগ ঃ একটি পর্যালোচনা", ক্ষমতায়ন, ২০০৪, সংখ্যা -৬ ।

শামীম আখতার, "৮ মার্চ নারী দিবসের ভাবনা", উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট ১৩ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, মার্চ ২০০৭ ।

সুমী, শাহীনা সুলতান জেন্ডার সমতা আনার ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট মার্চ ২০০৭ ।

সরকার বিভুরঞ্জন,রাজনৈতিক দলের ঘোষনা পত্র ও নির্বাচনী ইশতেহারের বিবেচনার জন্য প্রস্তাবনা (খসড়া) ২০০৮,উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সুলতানা আবেদা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারীর উন্নয়নের ভিত্তিঃ একটি বিশ্লেষণ, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা উইমেন ফর উইমেন ১৯৯৮ ।

সুলতানা ফারজানা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারীবাদী দর্শন, সমাজ নিরীক্ষণ/ ৭৭, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা ।

সোবহান রেহমান, অবাধ বাজার অর্থনীতিমুখী সংস্কার ধারণার পূর্ণবিবেচনা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা ১০ খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৯৯ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ।

স্টেপস্ বিশেষ নিবন্ধ 'গণমাধ্যমে নারী', উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট বর্ষ ১০, পঁয়ত্রিশতম সংখ্যা ২০০৪ ।

স্টেপস্ বিশেষ নিবন্ধ,জেন্ডার এবং উন্নয়ন যোগাযোগ মেলাঃ সমাজ পরিবর্তনে সামাজিক যোগাযোগ উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট এপ্রিল ২০০৭ ।

স্টেপস্ বিশেষ নিবন্ধ, সিডও এবং গণমাধ্যম, উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৩ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৭ ।

স্টেপস্ বিশেষ নিবন্ধ,জাতীয় উন্নয়নে নারীরা সমান অংশীদার (৮মার্চ) আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০৫ উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সাঁইত্রিশতম, এপ্রিল ২০০৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

রহমান শাহীন, ২৪ আগষ্ট জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসঃ পারিবারিক নির্যাতন বিরোধী আইন, বিশেষ রচনা উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট ।

হক লীমা, বাংলাদেশের সমাজে ফাতোয়ার রূপ একটি সমাজতান্ত্রিক পর্যালোচনা, ক্ষমতায়ন ২০০৬, সংখ্যা -৮ ।

হাফিজা শীপা "চাইলে জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া যায়", উন্নয়ন পদক্ষেপ, এয়োদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চ ২০০৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া সাময়িকীর মধ্যে সাপ্তাহিক বিচিত্রা, সাপ্তাহিক ২০০০ এর বিভিন্ন লেখনী বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। পত্রিকার মধ্যে দৈনিক প্রথম আলো দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক জনগকণ্ঠ, দৈনিক আমার দেশ, আজকের কাগজ, বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

এছাড়া গবেষণা কাজে বিভিন্ন Website এরও সহায়তা নেওয়া হয়েছে। আর সার্বক্ষনিক সহায়তায় এসেছে আহমেদ শরীফ সম্পাদিত বাংলা একাডেমীর সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান এবং Oxford (English to English) Dictionary, Samsad (English-Bengali and Bengli-English) Dictionary Sahitya Samsad, Calcutta.